প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৬০

প্রকাশক এইচ্. এল. সাহা
পুঁথিপত্র। ৯ এ্যান্টনি বাগান লেন। কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক এস. সাহা
ক্যালকাটা প্রিন্টার্স। ৯ এ্যান্টনি বাগান লেন। কলিকাতা-৭০০ ০০৯

স্বর্গতা মাতৃদেবী চম্পকলতা দেবীর
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

এই গ্রন্থের লেখাগুলি অনেক জায়গায় ছড়ানো ছিল। 'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা', 'প্রজ্ঞা', 'অমৃত', 'সমকালীন', 'কালি ও কলম', 'সাহিত্যতীর্থ' প্রভৃতি সাময়িক পত্রাদিতে বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত প্রবন্ধাবলী এবং বেতারভাষণ থেকে নির্বাচিত সাতাশটি রচনার এটি সমষ্টি। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ এখন দুষ্প্রাপ্য। প্রথম প্রকাশের সময় সেগুলি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তাঁরা এগুলির গ্রন্থাকারে মুদ্রণ বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। নানা কারণে এতদিন সেটা সম্ভব হয় নি। হরেস তাঁর 'আর্স্ পোয়েটিকা'তে লেখককে কোনো রচনা প্রকাশের আগে নয় বছর অপেক্ষা করতে পরামর্শ দিয়েছেন। এই গ্রন্থের অনেক প্রবন্ধই নয় বছরের বেশি পুরানো। গ্রন্থাকারে তাদের প্রকাশের অর্থ, লেখকের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল।

এ ঝুঁকি না নিয়ে লেখকের উপায়ান্তর নেই। রমণ মহর্ষি তাঁর উপদেশে বলেছেন, 'অহং-কে মুছে ফেলো'। এ উপদেশ কোনো লেখকের পক্ষে পালন করা কঠিন। লেখার বাতিক যাঁদের আছে তাঁরা জানেন, লেখার মধ্য দিয়ে কিভাবে লেখকের স্বরূপ প্রকাশিত হয় ও আত্মতৃপ্তি আসে। নিজের রচনার মূল্য আছে এমন ধারণা থাকে বলেই লেখকের মনে হয়, পাঠকেরা সে-রচনা পড়ে আনন্দ পাবেন, হয়তো উপকৃত-ও হবেন, আর সেইজন্যই আজও বই লেখার কোনো শেষ নেই।

সংকলিত প্রবন্ধগুলি প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে হলেও, তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী এনে ও অন্যান্যভাবে সেগুলিকে একটি ঐক্যসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা করেছি। প্রেম ও অধ্যাত্মচেতনার সাহিত্যিক রূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ই. এম্. ফর্স্টারের ভাষায় বলতে পারি, **'Only connect'**। প্রবন্ধগুলি যতটা সমালোচনাত্মক তার চেয়ে বেশি সাহিত্যধর্মী ; সেইজন্য এর অনেকগুলিতে (যেমন, 'রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ধর্ম' এবং 'প্রেম ও আধুনিক কবি') পূর্ণাঙ্গ আলোচনার কোনো চেষ্টাই করা হয় নি। এটা রচনার গুণ না দোষ, সে-বিচারের ভার সহৃদয় পাঠকবর্গের উপর। তবে এই প্রসঙ্গে আমি নামপত্রে মুদ্রিত উদ্ধৃতিটির কথা তাঁদের সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দেব।

দুই-একটি বিশেষ উল্লিখিত ক্ষেত্র ছাড়া অন্য ভাষা থেকে গদ্যে বা কবিতায় সব অনুবাদ বর্তমান লেখকের স্বকৃত।

বিদেশী নাম বা শব্দের বেলায় রোমক লিপিতে স্বরন্যাস-চিহ্নিত অক্ষর ব্যবহার সম্ভব হয় নি। মুদ্রণালয়ে এই অক্ষরের ব্যবস্থা নেই। লিপ্যন্তর করার সময় যতটা সম্ভব প্রচলিত বানান অনুসরণ করেছি।

গ্রন্থটির রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে ঘরে বাইরে অনেকের কাছে আমি ঋণী। আমার অগ্রজপ্রতিম ডক্টর সুরেশচন্দ্র মৈত্রের নাম সর্বাগ্রে করা প্রয়োজন। শেক্‌স্‌পিয়রের সনেটগুচ্ছের প্রকাশকের ভাষায় বলা যায়, সুরেশদা-ই এই গ্রন্থের 'একমাত্র জনক'। আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকদ্বয় ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র ও ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য নানাভাবে সস্নেহ সাহায্য করেছেন। আমার সুহৃদ্‌ অধ্যাপক অপূর্বকুমার সান্যাল গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি-সংস্কারে সযত্ন সহায়তা করেছেন। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন অধ্যাপক অরবিন্দ ভট্টাচার্য ও শ্রীগগন দে। এঁদের ও অন্য যাঁদের কাছ থেকে নানাধরনের সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ পেয়েছি তাঁদের সকলকে, বিশেষ করে আমার শুভার্থী ডক্টর বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, ডক্টর শিশিরকুমার ঘোষ, ডক্টর শীতাংশু মৈত্র, ডক্টর সুনীলকান্তি সেন, ডক্টর দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রীজিতেন্দ্রভূষণ পালিত ('শুক্রাচার্য'), বন্ধু অধ্যাপক অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক তারাপ্রসন্ন ঘটক, শ্রীরমেন্দ্র-নাথ মল্লিক, শ্রীমানিক মিত্র ও শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী ; ছাত্র অধ্যাপক ভূপেন্দ্রনাথ শীল, অধ্যাপক অশোক চৌধুরী ও অধ্যাপক বিপুল বসু, এবং পুথিপত্রের বিদ্যোৎসাহী কর্ণধার শ্রীঅচ্যুতানন্দ সাহা, তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীতাপস সাহা ও এই প্রতিষ্ঠানের সুদক্ষ কর্মীদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

সাহিত্য : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য

সাহিত্যের সহজ অর্থ যদি হয় 'নৈকট্য, অর্থাৎ সম্মিলন', তা হলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আর কোথাও যদি মিলতে না পারে, সাহিত্যে এসে মিলবে। এ মিলন বারংবার ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। ধর্ম ও দর্শনেও এ মিলন সাধিত হয়েছে। খ্রীস্টের অনেক উক্তিতে কৃষ্ণের প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। শোপেন্‌হাওয়ার উপনিষদের ভাবধারায় তাঁর শেষ জীবনের সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন। পতঞ্জলির 'যোগসূত্রে' অবচেতন মনকে যে-গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ফ্রয়েড তা থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কোনো দিনই মিলতে পারবে না, শোনা যায় রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং নাকি এমন কথা বলেছেন। কিপ্‌লিং মনেপ্রাণে যত 'সাম্রাজ্যবাদী'ই থাকুন না কেন, তিনি ছিলেন কবি ও কথাসাহিত্যিক। তাঁর মতো কোনো বড় শিল্পীর পক্ষে এ ধরনের উক্তি স্বাভাবিক কিংবা প্রত্যাশিত নয়। এ মনোভাব প্রকাশ করার তাঁর কোনো অভিপ্রায়ও ছিল না। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'ব্যালাড অফ ঈস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট'-এর প্রথম পঙ্‌ক্তিটি সাধারণত বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত করা হয়—'Oh East is East, and West is West, and never the twain shall meet।' কিপ্‌লিঙের প্রতি এই অবিচারের ফলে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা হয়। কিপ্‌লিঙের কবিতার প্রথম স্তবকের সব কয়টি পঙ্‌ক্তি একত্রে বিচার করলে সম্পূর্ণ অন্য মনোভাবের প্রতিফলন পাওয়া যাবে—

Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet,
Till Earth and Sky stand presently at God's great Judgment Seat ;
But there is neither East nor West, Border, nor Breed, nor Birth,
When two strong men stand face to face, tho' they come from the ends of the earth !

একটি পঙ্‌ক্তি বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত করলে যে অর্থের কত বিকৃতি হয় তার আর-একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত বায়রনের 'চাইল্ড হ্যারল্ড'-এ রয়েছে—

Then farewell, Horace ; whom I hated so,
Not for thy faults, but mine ; it is a curse
To understand, not feel, thy lyric flow ;
To comprehend, but never love, the verse.

এই অংশের বিচ্ছিন্ন প্রথম পঙ্‌ক্তিটিতে অনেক সময় মাঝখানের যতিচিহ্নগুলি তুলে দেওয়া হয় (Then farewell Horace whom I hated so)। ফলে হরেস-এর প্রতি বায়রনের বিরাগ প্রকৃতপক্ষে যতটা তার চেয়ে অনেক তীব্রতররূপে সেটা প্রকাশ করা হয়, এবং তাতে দুই কবির কারও উপরেই সুবিচার করা হয় না।

হরেস-এর সঙ্গে বায়রন কিংবা কিপ্‌লিঙের তুলনা সহজেই করা চলে। যদিও হরেস ভিন্ন যুগের ও ভিন্ন ভাষার লেখক, তাঁর সঙ্গে বায়রন ও কিপ্‌লিঙের যে মানসিক সাযুজ্য আছে সেটা তাঁদের রচনাতে প্রতিবিম্বিত। তাঁদের ঐতিহ্যও মোটামুটি এক— পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির যে-ধারা প্রাচীন এথেন্স নগরী থেকে প্রবাহিত হয়েছে সেই ধারায় এঁরা অভিষিক্ত। টি. এস্. এলিঅট তাঁর 'ট্র্যাডিশন অ্যাণ্ড ইন্‌ডিভিডুয়াল ট্যালেন্ট' নামক প্রবন্ধ লেখার সময় এই ধারার কথাই ভেবেছিলেন, যে এলিঅট বলেছেন 'comparison and analysis are the chief tools of the critic'। পাশ্চাত্ত্য জগতের বিভিন্ন সাহিত্যিকদের রচনার বিচারে তাই তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী অপ্রাসঙ্গিক নয়। এলিঅট যখন সাহিত্য-সমালোচনা লিখেছেন, ততদিনে পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে 'কম্প্যারেটিভ লিটারেচার' বা তুলনামূলক সাহিত্য প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। ফ্রান্স, জার্মানী ও আমেরিকায় (ইংলণ্ডে অবশ্য বিশেষ কিছু নয়) সমালোচকেরা তুলনা-মূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বহু গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু আধুনিক যুগে সৃষ্ট হয় নি। এর প্রথম প্রবর্তক রূপে হরেস-এর নাম করা যেতে পারে। তিনি তাঁর 'আর্স্ পয়েটিকা'তে রোমক সাহিত্যের বিচারে গ্রীক সাহিত্যকে আদর্শরূপে স্বীকার তো করেছেনই, রোমক সাহিত্যিককে দিবারাত্র গ্রীক সাহিত্য অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছেন—Vos exemplaria Graeca

Nocturna versate manu, versate diurna.

১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে একারমান্-এর সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে গোটে বলেছিলেন, 'জাতীয় সাহিত্য এই কথা আজ অর্থহীন ; বিশ্ব-সাহিত্যের যুগ আগতপ্রায়, এবং এই আগমন যাতে দ্রুততর হয় সেজন্য প্রয়াসী হওয়া প্রত্যেকেরই কর্তব্য।' প্রবীণ গোটের এই সুচিন্তিত উক্তিকে তুলনামূলক সাহিত্য-চর্চায় আধুনিক যুগের সূত্রপাতরূপে গণ্য করা যেতে পারে। এর কাছাকাছি কোনো সময়ে ফরাসী সংস্কৃতজ্ঞ শেজি-কে একটি চিঠিতে গোটে কালিদাসের 'শকুন্তলা' সম্পর্কে লেখেন—'যখন প্রথম এই অতলস্পর্শী গভীর গ্রন্থের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, তখন আমার হৃদয় তীব্র উদ্দীপনায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।··· সুন্দরতম জীবনচর্যার স্বাভাবিক ক্রমের, বিশুদ্ধতম নীতি ও প্রচেষ্টার, মহত্তম নৃপতির এবং শান্ততম দিব্য ভাবনার প্রকাশে কবি তাঁর প্রতিভার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন, এই প্রতীয়মান হয়। তবু এই শৈলীতে তিনি তাঁর সৃষ্টির জগতে সার্বভৌম প্রভু।' এ যেন গোটে নিজেই তাঁর 'শকুন্তলা'-

সম্পর্কিত সেই সুন্দর শ্লোকটির ব্যাখ্যা করলেন, যেটি তিনি ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে লিখেছিলেন ('Willst du die Bluete des fruhen,' ইত্যাদি), এবং যেটির সারাংশ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্রে দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।' শেজি 'শকুন্তলা'র সংস্করণ সম্পাদন করেছিলেন ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে। এর অনেক আগেই সার্ উইলিয়াম জোন্স্ (১৭৪৬-৯৪)-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে (১৭৮৯)। এই অনুবাদ পড়েই গ্যেটে মুগ্ধ হন এবং তাঁর ভাবোচ্ছ্বাস ঐ শ্লোকে ব্যক্ত করেন, যেটি একটি দীপশিখার স্নিগ্ধ অচপল আলোকে কালিদাসের সমগ্র নাটকটিকে উদ্‌ভাসিত করেছে।

জোন্স্-এর মতো বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত ইংলণ্ডে খুব বেশি জন্মগ্রহণ করেন নি। তিনি গ্রীক ভাষা থেকে তো অনুবাদ করেছিলেনই, কিন্তু তাঁর সব চাইতে বড় কাজ প্রাচ্য-সাহিত্যের অনুবাদ। সাহিত্যের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনে যাঁদের ভূমিকা সর্বাধিক জোন্স্ তাঁদের অন্যতম। তাঁর 'শকুন্তলা'র অনুবাদ শুধু গ্যেটেকেই প্রভাবিত করে নি, সমগ্র পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করার সময় জোন্স্ একজন সিরীয়ের কাছে ফার্সী ও আরবী শেখেন। ইতিপূর্বেই তিনি হিব্রু, ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা আয়ত্ত করেছেন এবং চীনা, স্পেনীয় ও পর্তুগীজ ভাষা শিখতে আরম্ভ করেছেন। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি ফার্সী পুঁথি থেকে নাদির শাহের জীবনচরিত ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। এর পর প্রকাশিত হয় তাঁর প্রাচ্য কাব্য-সম্পর্কিত ফরাসী গ্রন্থ ('Traite sur la poesie orientale') এবং চতুর্দশ শতকের ফার্সী কবি হাফিজ-এর রচনার ছন্দোবদ্ধ ফরাসী অনুবাদ। ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে জোন্স্-এর ফার্সী ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় এবং ১৭৭২ ও ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রাচ্য কাব্য সম্বন্ধে সন্দর্ভ রচনা করেন। ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা-স্থিত সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারক নিযুক্ত হওয়ার অল্পদিন পরেই তিনি এই নগরীতে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন (জানুয়ারি ১৭৮৪) এবং আমৃত্যু এই সমিতির সভাপতি-পদে আসীন ছিলেন। জোন্স্-এর দান তুলনামূলক সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রে যেমন অসামান্য, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও সেই রকম। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যদের কাছে তিনি সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য ভাষাগুলির নৈকট্য প্রমাণ করায় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের উদ্ভবের পথ সুগম হয়। বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহ দেন সংস্কৃত ভাষা চর্চা করার ব্যাপারে। তাঁর 'মনুসংহিতা'র অনুবাদের প্রকাশ-কাল ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দ (এর দু'বছর আগে তিনি মুসলমানদের আইন সম্পর্কে ইংরেজিতে লিখেছিলেন)। তাঁর অন্যান্য অনুবাদের মধ্যে 'হিতোপদেশ' ও 'বেদ'-এর বেশ কিছু অংশ রয়েছে।

তাঁর 'ঈস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট ইন রিলিজিয়ন' গ্রন্থে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন মন্তব্য করেছেন, মানব-সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এশিয়া ও য়ুরোপ যে-দু'টি দিক প্রকাশ করে তারা পরিপূরক। এশিয়া প্রকাশ করে আধ্যাত্মিক দিক, আর মননশীলতার দিক প্রকাশ করে য়ুরোপ। কখনো কখনো দেখা যায়, পরস্পরের সুবিধার জন্য এই দু'টি ধারার মিলন ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ রাধাকৃষ্ণন উল্লেখ করেছেন কিভাবে মিশরীয়, ক্যালডীয় ও ভারতীয় চিন্তাধারা পিথাগোরাস ও প্লেটোর মতো পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের প্রভাবিত করেছে। দ্বিতীয়বার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে সংযোগ ঘটল যখন খ্রীস্টজন্মের শ-তিনেক বছর আগে আলেকজাণ্ডার পশ্চিম এশিয়া আক্রমণ করলেন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারকেরা সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন অভিমুখে অগ্রসর হলেন। অশোকের শিলালিপি থেকে আমরা জানতে পারি, তৃতীয় খ্রীস্টপূর্বাব্দের প্রথম দিকে বৌদ্ধ প্রচারকদের এণ্টিয়কের সিলিউসাইড-এর রাজদরবারে এবং আলেকজান্দ্রিয়ার টলেমির রাজদরবারে পাঠানো হয়েছিল। তৃতীয়বার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে সংযোগ দেখা যায় স্পেনের আক্রমণে এবং মুসলমানদের দ্বারা ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীর আক্রমণে।

এই তিনবারের সংযোগের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের পারস্পরিক প্রভাব কতটা গভীর হয় তা নিরূপণ করা কঠিন হলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছুটা বৈপ্লবিক রূপান্তর অনুমান করা হয়তো অসঙ্গত হবে না। এমন-কি এও বলা হয়েছে, আমাদের মহাকাব্য বাল্মীকি-রামায়ণের যে বর্তমান রূপ আমরা পাই তাতে গ্রীক প্রভাব বিদ্যমান; হোমার-এর 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের অন্তর্গত হেলেন-হরণের কাহিনীই সীতা-হরণের কাহিনীর মূল প্রেরণা। এতে অবশ্য যথেষ্ট কষ্টকল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। 'প্রক্ষিপ্ত' আখ্যা দিয়ে সব কিছুকে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিপন্ন করাতে ব্যাখ্যাকৃৎদের চাতুরী সীমাহীন। সীতা-হরণের ঘটনা কিন্তু রামায়ণের কেন্দ্রবিন্দু, একে প্রক্ষিপ্ত বললে সমস্ত 'রামায়ণ'কেই প্রক্ষিপ্ত বলতে হয়। আমাদের যেটা সর্বাগ্রে মনে রাখা প্রয়োজন সেটা এই যে, সীতা ও হেলেন সমগোত্রীয়া নয়। পাশ্চাত্ত্য পুরাণের হেলেন সৌন্দর্য ও চিত্তচাঞ্চল্যের (হ্যাম্‌লেটের ভাষায় 'ফ্রেল্‌টি') প্রতীক, আর আমাদের সীতা সাধ্বী ও পতিব্রতা নারীর আদর্শ, ভবভূতি যাঁকে তাঁর 'উত্তররাম-চরিত' নাটকে করুণার মূর্তি ও মূর্তিমতী বিরহ-ব্যথা রূপে বর্ণনা করেছেন। হোমার-এর 'ইলিয়াড্' কাব্যে মানবী হেলেন সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হলেও তার দুর্বলতার দিক্ পাশ্চাত্ত্য মহাকবি গোপন করেন নি। নায়িকার অনুশোচনাও তিনি দেখিয়েছেন। প্রাচ্যের মহাকবি বাল্মীকি তাঁর নায়িকাকে মানবীরূপে ততটা অঙ্কন করেন নি যতটা উপস্থাপিত করেছেন দেবীরূপে। সীতার ও হেলেনের চরিত্রের এই মৌলিক পার্থক্য মনে না রাখলে সমালোচকের চোখে সীতা-হরণের সঙ্গে হেলেন-হরণের গোলমাল হয়ে যেতে পারে, বিশেষত সেই সমালোচক যদি তুলনামূলক সাহিত্য-চর্চার চশমা দিয়ে সব কিছু দেখেন।

মেনেলাউস-পত্নী হেলেন প্যারিসের প্রতি স্বেচ্ছায় আকৃষ্ট হয়েছিল, এ অপরাধ গুরুতর। এই জন্যই দান্তের 'ইন্‌ফার্নো'র পঞ্চম সর্গে দেখা যায়, নরকের দ্বিতীয় চক্রব্যূহে যেখানে কামুকদের স্থান, সেখানে হেলেন আসছে 'বিলাসিনী' ('lussuriosa') ক্লিওপেট্রার পরেই—

Elena vedi, per cui tanto reo
Tempo si volse···
'হেলেনকে দেখো, যার হতে দীর্ঘ
দুঃসময়ের আবর্তন···'

মার্লোর কাছেও হেলেনের এই একই রূপ। তাই হেলেনের ছায়ামূর্তি যখন ডক্টর ফাউস্টাসের সামনে উপস্থিত হল তখন ফাউস্টাস তার রূপের দ্যুতিতে বিহ্বল। এই কি সেই মুখ যা হাজার জাহাজ সাগরে ভাসিয়েছিল, আর অগ্নিসাৎ করেছিল ট্রয় শহরের গগনচুম্বী সৌধগুলি? তাই মাধুর্যময়ী হেলেনের কাছে ফাউস্টাসের ব্যাকুল প্রার্থনা একটি চুম্বনের অমরত্বের জন্য।

গ্যেটে অবশ্য হেলেনকে অন্য দৃষ্টিতে দেখেছেন। 'রামায়ণে'র নায়িকার দেবীত্ব কিছুটা গ্যেটের হেলেনে আরোপিত হয়েছে, কারণ হেলেন গ্যেটের কাছে 'চিরন্তনী নারীশক্তি'র (Das Ewig-Weibliche) প্রতীক। যে-গ্রীক সংস্কৃতি গ্যেটের অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিল, হেলেনকে গ্যেটে সেই সংস্কৃতির মর্মমূর্তি রূপে দেখেছিলেন। গ্যেটে তাঁর কাব্যে গ্রীক আদর্শের সঙ্গে জার্মান রোম্যাণ্টিকতার সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং পরে হ্যেল্ডার্লিন তাঁর 'হাইপীরিয়ন' উপন্যাসে গ্যেটের অনুসরণ করেন। গ্যেটের 'ফাউস্ট' নাটকে এই গ্রীক আদর্শের সৌন্দর্যসারের রূপক হেলেন।* তৃতীয় অঙ্কের সে নায়িকা এবং এই অঙ্কে ইউরিপিডীজ-রচিত 'হেলেন' নাটকের ছায়াপাত ঘটেছে। অঙ্কের শেষাংশের স্থান আর্কেডিয়া, যেখানে ফাউস্ট ও হেলেনের বিবাহোত্তর জীবন দেখানো হয়েছে। ফাউস্ট ও হেলেনের মিলনের মধ্য দিয়ে যেন গ্রীসের সংস্কৃতির সঙ্গে জার্মানীর রোম্যাণ্টিকতাকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের স্বল্পায়ু সন্তান ইউফরিয়ন, সে যেন বায়রনীয় নায়ক, কিংবা বায়রন স্বয়ং যিনি তাঁর কবিতাতে ক্ল্যাসিসিজ্‌ম্ ও রোম্যাণ্টিসিজ্‌ম্ মেলাতে পেরেছিলেন। এই দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে বায়রনের অনুরূপ দৃষ্টান্ত আমরা মাইকেল মধুসূদনের রচনাতে পাই। ক্ল্যাসিসিজ্‌ম্ ও রোম্যাণ্টিসিজ্‌মের মিলন কাব্যে কি রূপ পরিগ্রহ করে তার দৃষ্টান্ত মধুসূদন বায়রনের কবিতাতে পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সামনে যে-দৃষ্টান্ত উজ্জ্বলতর রূপে প্রতিভাত হয়েছিল সেটা মিল্‌টনের কাব্য।

মধুসূদনকে মিল্‌টন কিংবা বায়রনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মধুসূদনের কাব্যের সৌন্দর্য ও তাৎপর্য আমাদের কাছে অধিকতর পরিস্ফুট হওয়া স্বাভাবিক, বিশেষত

যখন তাঁর কাব্যের নানা স্থানে মধুসূদন এঁদের দ্বারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রভাবিত হয়েছেন। তবে প্রভাব খুঁজতে গিয়ে সমালোচকের অপথে গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। টোমাস্ মান্ কোনো এক সময় তাঁর এক গল্পের জন্য একটি প্রাচ্যকাহিনী নির্বাচন করেন—'মস্তক-বিনিময়'। সুতরাং তাঁর অন্যান্য লেখায়ও প্রাচ্য প্রভাব পাওয়া যাবে, অনেকে এই সিদ্ধান্ত ক'রে নেন, এবং গবেষণা আরম্ভ ক'রে দেন। গবেষক-সমালোচকদের দৃষ্টি সাধারণত মুক্তদৃষ্টি হয় না, কারণ 'critics, like travellers, find what they seek'। কিংবা মান্-এর সমকক্ষ এবং স্বজাতীয় গদ্যশিল্পী, যিনি সমকালীনও, সেই হের্মান্ হেস্-এর কথা ধরা যেতে পারে। তাঁর পিতা ও মাতামহ ভারতবর্ষে মিশনারি রূপে ছিলেন কিংবা যৌবনে তিনি একবার ভারতবর্ষে বেড়াতে এসেছিলেন, এই থেকে অনেকে মনে ক'রে নেন যে তাঁর রচনায় ভারতীয় প্রভাব হবে গভীর। যেহেতু হেস্ 'সিদ্ধার্থ' নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন (চলচ্চিত্রের দৌলতে এটি এখন সুপরিচিত নাম) এবং সেই উপন্যাসে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য মনঃসমীক্ষণের সঙ্গে প্রাচীন প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতা মিশিয়েছেন, সে কারণে তাঁদের ভুল ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। টি. এস্. এলিঅট তাঁর 'ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড' কাব্যের শেষে 'শান্তির বাণী' উচ্চারণ করেছেন, 'ফোর কোয়ার্টেট্স্' কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ কি বলতে চেয়েছেন তাই নিয়ে ভেবেছেন, বুদ্ধকে একাধিকবার স্মরণ করেছেন বিভিন্ন রচনায়, এবং 'সুইনি অ্যাগনিস্টিস'-এর আঙ্গিকে জাপানের নো-নাটককে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখলে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের তুলনায় তাঁর উপর প্রাচ্য প্রভাব খুব বেশি নয়। জাপানী নাটকে আরও বেশি উৎসাহ দেখিয়েছেন ডব্লু. বি. ইয়েট্স্। পুরোহিত স্বামীর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছে, যদিও সে বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় নি। ইয়েট্স্-এর রচনাতেও প্রাচ্য প্রভাব ব্যাপক নয়। এ সবের তুলনায় আধুনিক ভারতীয় লেখকদের উপর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব অনেক গভীর ও ব্যাপক। এর কারণ নির্ণয় করা কঠিন নয়।

সাহিত্য-সমালোচনায় তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী যে কখনও কখনও বিপজ্জনক হ'য়ে উঠতে পারে সে কথা বলা বাহুল্য। তুলনামূলক সাহিত্য-চর্চা যে সাহিত্য-সমালোচনার অনেকগুলি শাখার মধ্যে একটি তা ভুলে গেলে চলবে না। যেহেতু প্রাচীর শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস (অনেকে অন্তত তাই মনে করেন) এবং প্রতীচীর শ্রেষ্ঠ কবি শেক্স্পিয়র, তাঁদের রচনার তুলনামূলক আলোচনা, অনেক সমালোচকের কাছে, যাঁদের একটা বড় অংশ ভারতীয়, 'বাধ্যতামূলক'। এই আলোচনা অনেক সময় নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হয় যখন আমরা তুলনার উৎসাহে ভুলে যাই যে, কালিদাসের কাল অনেক শত বছর আগে কেটে গেছে এবং শেক্স্পিয়রের আবির্ভাব কালিদাসের প্রায় দু'হাজার বছর পরে। কালিদাস সেই প্রাচীন কালের মহান্ আদর্শবাদী কবি যে-যুগে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গ যোগ ছিল। শেক্স্পিয়র যে-সময়ে এলেন তখন নবজাগৃতির কল্যাণে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছে, মানুষের জীবন একাধিক

অর্থে 'যান্ত্রিক' হতে আরম্ভ করেছে এবং মানুষের মনের গহনে সহস্র জটিলতার ঘূর্ণাবর্ত শুরু হয়ে গেছে। সৌন্দর্যের অনুভূতিতে মগ্ন হয়ে থাকার মতো মানসিকতা ও পরিবেশ কালিদাসের ছিল, নিসর্গের নীলাভ নিবিড়তায় তিনি তন্ময় হয়ে যেতে পারতেন।

আজ মনে হয়,
ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্দময়
অলকার অধিবাসী।

আর শেক্‌স্‌পিয়র ? তিনি একেবারে স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তিনি জীবনের রূপকার। তাঁর শ্রেষ্ঠ নায়কের মুখ দিয়ে তিনি অভিনয়ের লক্ষ্য সম্পর্কে যা বলিয়েছেন তা তাঁর নিজের নাট্যকলার আদর্শ সম্পর্কেও প্রযোজ্য—

The purpose of playing, whose end, both at the first and now, was and is, to hold, as 'twere, the mirror up to nature.

শেক্‌স্‌পিয়রের নাটকে জীবনের যে-ছবি ফুটে উঠেছে তার পরিধি ও বিস্তার অনেক বড়। তিনি কালিদাসের মতো আদর্শনিষ্ঠ হতে চান নি, বাস্তবনিষ্ঠাই তাঁর কাছে আদর্শ। অবশ্য তাঁর বাস্তবতা কবিকল্পনার সংমিশ্রণে শিল্পকর্মে উন্নীত হয়েছে, নিছক সাংবাদিকের বিবরণী হয় নি। তিনি চিত্রশিল্পী, আলোকচিত্রকর নন। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তাঁর তুলনা কোথায় ? যথার্থই বলা যেতে পারে যে, তিনি রোম-নগরী টাইবার-নদের তীরে খুঁজে পান নি, আবিষ্কার করেছেন মানব-মনের অন্তঃপুরে। অলোকসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন শেক্‌স্‌পিয়র, কিন্তু প্রথম এলিজাবেথের 'spacious age'-এর মানুষ ছিলেন বলেই তিনি তাঁর মতো লেখক হ'তে পেরেছিলেন, এটাও একই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে। যুগকে তিনি অতিক্রমণ করেছেন, অস্বীকার করেন নি। এই কথা বাণীর বরপুত্র কালিদাসের সম্বন্ধেও বলা দরকার। যুগপৎ তিনি যুগধর্মী ও যুগাতিক্রমী। সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের (সম্ভবত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) সুবর্ণ যুগেই কালিদাসের তাঁর মতো লেখক হওয়া সম্ভব ছিল।

কালিদাস ও শেক্‌স্‌পিয়র দু'জনেই তাঁদের নিজস্ব ক্ষেত্রে অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। শেক্‌স্‌পিয়র তাঁর নিজের রচনায় আনন্দাভিসারী কালিদাসের মতো 'নির্মল' সৌন্দর্যকমল' ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। আবার 'myriad-minded' শেক্‌স্‌পিয়রের 'magic touch' কালিদাসের রচনায় দুর্লভ। এঁরা দুজনেই সাধারণ অর্থে বিশ্বকবি, যে-অর্থে সব মহান্ কবিই বিশ্বকবি। মহান্ কবি যেমন কোনো বিশেষ যুগে সীমাবদ্ধ নন ('not of an age, but for all time') তেমনই বিশেষ কোনো দেশের গণ্ডির মধ্যে তিনি পড়েন না। (কবিতার অনুবাদ সম্ভব কিনা সে বিতর্কে এখন যাওয়া সম্ভব নয়।) সে দিক থেকে দেখলে তাই কালিদাস ও শেক্‌স্‌পিয়র দু'জনেই বিশ্বকবি। এই কারণেই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যখন শেক্‌স্‌পিয়র সম্বন্ধে লিখলেন, 'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি,' তখন তাঁর উক্তি এক অর্থে বিভ্রান্তিকর। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'কালিদাস ও

শেক্‌স্‌পীয়র' প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাই ঠিকই সিদ্ধান্ত করেছেন, 'শেক্‌স্‌পীয়রও যেমন জগতের, কালিদাসও তেমনি জগতের।'

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উক্ত প্রবন্ধের গোড়াতেই বলে নিয়েছেন, '...ইঁহাদের দুজনের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, কাহার কবিত্বশক্তি অধিক, কাহার অল্প, তাহা নির্ণয় করা বড় শক্ত...।' আমরা অনেকে অবশ্য এই বিচক্ষণতাকে নির্বুদ্ধিতা মনে করি এবং সর্বাগ্রে বিচার করতে বসি কালিদাস ও শেক্‌স্‌পিয়রের মধ্যে কে বড়। কাব্যজগৎ ক্রীড়াজগৎ নয়, সেখানে পরিসংখ্যান উৎকর্ষের আপেক্ষিক বিচারে কোনো কাজে আসে না। কোন্ খেলোয়াড় ফুটবল খেলায় কতগুলো 'গোল' করেছে কিংবা ক্রিকেটে কত 'রান্' করেছে সেই সংখ্যার সাহায্যে তার ক্রীড়াশক্তির পরিমাপ করা যেতে পারে। কিন্তু কাব্যপ্রতিভা পরিমাপের এরকম কোনো সহজ পন্থা নেই। তা ছাড়া কোনো লেখক অন্য কোনো লেখকের থেকে কতটা বড় কিংবা কতটা ছোট এ জানবার যদি কোনো উপায়ও থাকত, তা জেনেই বা আমরা লাভবান হ'তাম কি ভাবে? শেক্‌স্‌পিয়রের সনেট বা নাটক আমি কারও চেয়ে কম ভালোবাসি না, দেশপ্রেমও আমার এত সংকীর্ণ নয় যে 'দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'। তবু আমি কিছুতেই অবলীলাক্রমে বলতে পারি না, আমার অনেক প্রবীণ ও নবীন বন্ধুরা অম্লানবদনে যেমন বলেন, 'কালিদাস শেক্‌স্‌পিয়রের ধারে কাছে আসতে পারেন না'। চাঁপা ফুল রজনীগন্ধার ধারে কাছে আসে কিনা, কিংবা স্কাইলার্ক পাখি নাইটিংগেলের ধারে কাছে আসে কিনা, সেটাও তাঁরা অত সহজে নিরূপণ করেন কিনা আমার জানা নাই।

যাঁরা শেক্‌স্‌পিয়র-রূপী Colossus-এর পাশে কালিদাসকে 'উদ্বাহুরিব বামনঃ' মনে করেন, তাঁদের একটা যুক্তি (যেটাকে তাঁরা অকাট্য মনে করেন) এই—কালিদাস কোনো ট্র্যাজেডি লেখেন নি। ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে নিষেধ না হয় রইলই, কালিদাসের মতো শক্তিধর লেখক নিষেধের নাগপাশে নিজেকে জড়াবেন কেন? এঁদের মতে ট্র্যাজেডিই হ'ল সাহিত্যের সবকটি শাখার মধ্যে সর্বোত্তম। এটা ঠিক, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের শিল্পোৎকর্ষ চরম রূপ পেয়েছে ট্র্যাজেডির মধ্যে। ঈস্‌কিলাস, সফোক্লীজ, ইউরিপিডীজকেই ধরি, কিংবা কর্নেই-রাসীন্‌কেই ধরি, তাঁদের বিয়োগান্ত নাটকের তুলনা কোথায়? আর শেক্‌স্‌পিয়র যে-সব ট্র্যাজেডি লিখেছেন সেগুলিই বা এদের থেকে কিসে কম? (ডক্টর জন্‌সন অবশ্য শেক্‌স্‌পিয়রের কমেডিগুলিকে তাঁর ট্র্যাজেডিগুলির চেয়ে বেশি চিত্তাকর্ষক মনে করতেন, কিন্তু এটা একেবারেই তাঁর ব্যক্তিগত মত।)

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ইতিহাসে যা-ই দেখি না কেন, ট্র্যাজেডিকে সাহিত্যকর্মরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ বলার আগে আমাদের আর একবার ভেবে দেখতে হবে। ট্র্যাজেডি

জীবনের সর্বাঙ্গীণ রূপের কোনো পরিচয় দেয় না, একটা অংশকে বিবৃত করে মাত্র। অলড্যাস হাক্‌স্‌লি তাঁর 'ট্র্যাজেডি অ্যাণ্ড দ্য হোল্‌ ট্রুথ্‌' প্রবন্ধে লিখেছেন—'Tragedy is an arbitrarily isolated eddy on the surface of a vast river that flows on majestically, irresistibly, around, beneath, and to either side of it।' সমগ্র নদীর আভাস যদি দেওয়া যায়, তা হলে সাহিত্যিক শুধু ঘূর্ণীজল নিয়ে বিরত থাকবেন কেন? অবগাহন-স্নানের সুযোগ ছেড়ে দিয়ে কি শুধু জলস্পর্শেই সন্তুষ্ট থাকবেন?

ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে কেন বিয়োগান্ত নাটক নিষিদ্ধ হয়েছে, তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করা হয়েছে। হাক্‌স্‌লির প্রবন্ধ পড়ার পর তার সঙ্গে আমরা নতুন একটি কারণ যোগ করতে পারি। বিয়োগান্ত নাটকে জীবনের খণ্ডিত রূপের প্রকাশ; খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত জীবন কি প্রকৃতই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সামগ্রী হতে পারে? এ প্রশ্ন হয়তো প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকের মনেও জেগেছিল। জীবনের অখণ্ড রূপ প্রকাশ করার দিকেই লেখকের প্রযত্ন থাকবে, এটা স্বাভাবিক মনে করা হয়েছিল।

তবে ভারতীয়েরা কর্মফলে বিশ্বাসী এবং কর্মফলে বিশ্বাস করলে ট্র্যাজেডি রচনা করা যায় না, এই কথাটাই বোধ হয় এখানে বেশি প্রাসঙ্গিক। প্রাক্তন ও প্রারব্ধে যদি আমরা বাঁধা থাকি, যা কিছু আমাদের জীবনে ঘটে তা যদি আমাদের কর্মফল হয়, তা হলে আমাদের দুঃখভোগও আমাদের কৃতকর্মের ফল, তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমরা নিজেরা। এখানে সেই 'pity of it' কোথায়? যেখানে আমরা যা প্রাপ্য তার চেয়ে বেশি দুঃখ ভোগ করি, সেখানেই ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়। সেটা যদি না ঘটে তা হলে ট্র্যাজেডিও ঘটবে না। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে নিয়তি সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করলেও, শেক্‌স্‌পিয়রের ট্র্যাজেডিতে মানুষের চরিত্রই প্রায় তার নিয়তি হয়ে উঠলেও, ভাগ্যবিড়ম্বিত নায়ক বা নায়িকা আর্তস্বরে বলে উঠছে, 'এ তো আমার প্রাপ্য নয়, I have not deserved this!' কিংবা—

> I am a man
> More sinned against than sinning.

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন, ভারতীয় সমাজে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়; একদলের মত পাশ্চাত্ত্যের সব কিছু ভালো ও আমাদের সব কিছু খারাপ। আর-এক দল বিশ্বাস করে, ভারতীয়দের কোনো দোষ থাকতেই পারে না, সব কিছু দোষ-ত্রুটি সাহেবদের। প্রথম দল পাশ্চাত্ত্যের সব কিছু অন্ধ অনুকরণের দিকে ঝোঁকে, দ্বিতীয় দল পাশ্চাত্ত্যের প্রকৃত উৎকর্ষকেও অবহেলা ও অবজ্ঞা করে। এই ঘাত-প্রতিঘাতের স্রোতে আমরা আত্মহারা হয়ে পড়েছি। স্বামীজী এই শতকের গোড়ার দিকে যে-মন্তব্য করেছিলেন এত বছর পরেও তার প্রাসঙ্গিকতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আমরা এখনও, এত দিনের ব্যবধানেও,

সেই আত্মহারা ভাব কাটিয়ে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠতে পারি নি (স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরেও)। আর স্বামীজী যেটা ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলতে চেয়েছেন, সেটা আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। পাশ্চাত্ত্য কবিদের নির্বোধের মতো অনুকরণ করতে গিয়ে বাঙালী কবিরা অনেক সময় যে-কবিতা লেখেন তাতে আগাগোড়া বিজাতীয় ছাপ থাকে। এ ঘটনা অবশ্য অনেক দিন আগে থাকতেই ঘটছে। প্রায় একশো বছর আগে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবিতা' প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়—'তাড়িত-সংযোগে মৃত ব্যক্তিও যেমন দৃশ্যতঃ চেতনা প্রাপ্ত হয়, আমাদের আধুনিক কবিতা-সকলও সেইরূপ দৃশ্যতঃ কবিতা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা হইতে যদি বিদেশীয় কবিতার তাড়িত-প্রভাব নির্বাসিত করা যায় ত' দেখিতে পাইবে যে, সে-সকল কবিতা প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনশক্তি নির্জীব সামগ্রী মাত্র।'

আবার পাশ্চাত্ত্য প্রভাব থাকলেই যে ভারতীয় লেখকের পক্ষে সেটা ক্ষতিকর হবে, তা একেবারেই নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে এই প্রভাব যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃষ্ট উদাহরণ তো আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ব'লেই লিখেছেন—'আমাদের··· সাহিত্য, য়ুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাংলাদেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা। শরৎ চাটুজ্জের গল্প বেতালপঞ্চবিংশতি, হাতেম তাই, গোলেবকাওয়ালী, অথবা কাদম্বরী-বাসবদত্তার মতো যে হয় নি, হয়েছে য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যের ছাঁদে, তাতে ক'রে অবাঙালিত্ব বা রজোগুণ প্রমাণিত হয় না; তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাণবত্তা।' ('সাহিত্যবিচার', 'সাহিত্যের পথে') এই রবীন্দ্রনাথই Comparative Literature (যার তিনি নাম দিয়েছেন বিশ্বসাহিত্য) নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন তাঁর 'সাহিত্য' গ্রন্থে।

'আমরা পূর্ব, তোমরা পশ্চিম। আমরা আরম্ভ, তোমরা শেষ।··· আমরা উষা, তোমরা গোধূলি', প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন তাঁর 'আমরা ও তোমরা'তে। প্রাচ্যের উদয় অন্ধকার থেকে, পাশ্চাত্ত্যের বিলয় অন্ধকারের ভিতর, এও তিনি বলেছেন। আমাদের, প্রাচী ও প্রতীচীর সকলের, কিন্তু আজ অন্ধকার নিয়ে এত চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের এ যুগের পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক জাঁ পোল্ সার্ত্র্ আমাদের কোনো আশার আলো দেখাতে পারেন নি বটে, কিংবা স্যান্টায়ানা বলেছেন, 'Life is not a spectacle or a feast; it is a predicament', প্রাচ্যের কবি কিন্তু অন্য সুরে গেয়েছেন—

আকাশতলে উঠল ফুটে আলোর শতদল।
পাপড়িগুলি থরে থরে ছড়ালো দিক্-দিগন্তরে,
ঢেকে গেল অন্ধকারের নিবিড় কালো জল।

এই আলোকের ঝর্ণাধারায় যেদিন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সমভাবে প্লাবিত হবে, সেই দিনই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের পরিপূর্ণ মিলনের দিন।

শকুন্তলা ও ডেস্‌ডেমোনা

'Das Ewig-Weibliche Zieht uns hinan.'—Goethe

১২৮৫ সালের বৈশাখের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছিলেন, পাঠকেরা তুলনায় সমালোচনা বড় ভালোবাসেন। এ কথা বোধ হয় সব যুগের পাঠকের সম্পর্কে খাটে। তুলনার প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কালিদাস ও শেক্‌স্‌পিয়রের তুলনা প্রসঙ্গে শেক্‌স্‌পিয়রকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন—'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।' এখানে শেক্‌স্‌পিয়রের মহত্ত্ব পরিস্ফুট করার চেষ্টা করতে গিয়ে কালিদাসের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। সব বড় কবিই জগতের কবি। যে কবির আকর্ষণ কোনো বিশেষ দেশ বা বিশেষ কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ, সে কবি আর যা-ই হোন না কেন বড় কবি নন।

কালিদাস ও শেক্‌স্‌পিয়র দু'জনেই কালজয়ী কবি, দু'জনেরই অলোকসাধারণ প্রতিভা। ইন্দুমতী, পার্বতী, সীতা প্রভৃতি কালিদাসের নায়িকাদের প্রসঙ্গে Ryder বলেছেন, 'His women appeal more strongly than his men।' পোর্শিয়া, রজালিণ্ড্‌, হেলেনা, ইমোজেন, প্রভৃতি শেক্‌সপিয়রের নায়িকাদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রাস্‌কিন্‌ বলেছেন, 'Shakespeare has no hero, he has only heroines.' কালিদাসের নায়িকাদের মধ্যে শকুন্তলার, ও শেক্‌স্‌পিয়রের নায়িকাদের মধ্যে ডেস্‌ডেমোনার, বিশেষ স্থান রয়েছে। দু'টি চরিত্রের মধ্যে বহু সাদৃশ্য রয়েছে। এর মধ্যে কিছু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র-নির্দেশিত সাদৃশ্য ছাড়াও আরও অনেক দিকে আমরা এই দুই নায়িকার সগোত্রতা দেখতে পাই।

মহাভারতের শকুন্তলা ও কালিদাসের শকুন্তলায় যেরূপ আকাশ-পাতাল পার্থক্য, চিন্‌থিয়োর দিস্‌দেমোনা ও শেক্‌স্‌পিয়রের ডেস্‌ডেমোনাতেও সেইরূপ পার্থক্য। কালিদাস ও শেক্‌স্‌পিয়রের স্পর্শপ্রসাদে দু'টি অতি সাধারণ চরিত্র অসামান্য ও অপরূপ হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোনো কবিই নায়িকার নাম পরিবর্তন করেন নি।

শকুন্তলা-নামেই নায়িকার জন্মরহস্যের আভাস রয়েছে। তা ছাড়া মর্ত্য-জগতের হীন বাদ-বিসংবাদ ও কল-কোলাহল থেকে বহু দূরে, তপোবনের শান্ত পরিবেশে প্রতিপালিতা প্রকৃতি-দুলালী কণ্ব-কন্যার শকুন্তলা-নামটি তাঁর পক্ষে উপযুক্ত হয়েছে। সপ্তম অঙ্কে এই নামটি নিয়ে কালিদাস একটু কৌতুক করেছেন, সর্বদমনের সতর্ক দৃষ্টিক্ষেপে দুষ্মন্তের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

ডেস্‌ডেমোনা নামটিও সুনির্বাচিত। শেক্‌স্‌পিয়র নিজে 'What's in a name?' স্বীকার করতেন না। তাঁর 'small Latin and less Greek'-এর জ্ঞান নিয়েও তিনি ডেস্‌ডেমোনা-নামের সার্থকতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ডেস্‌ডেমোনার মতো 'দুর্ভাগিনী' নারী খুব কমই দেখা যায়। ভাগ্য-বিড়ম্বিত এই নারীর জীবনের পরিণতির কথা ভাবলে সত্যই মনে হয় যে a butterfly has been crushed under wheels। 'So sweet was ne'er so fatal.'

মাতা-কর্তৃক পরিত্যক্তা শকুন্তলা দিনে দিনে পরিবর্ধমানা হয়ে অবশেষে এক দিন যৌবনে পদার্পণ করল। আশ্রম-বৃক্ষগুলির প্রতি তার সোদর-স্নেহ, তাদের জলসেচনে সে কাতর হয় না। জলসেচনের জন্য সেচনঘট নিয়ে সে যখন আসে, তখন তাকে মূর্তিমতী বনদেবী মনে হয়। তারই অভ্যর্থনার জন্য নবোদ্গত কুশে বনভূমি সমাকীর্ণ, কুরুবকগুলি শাখা-প্রশাখায় সমাচ্ছন্ন, বকুল-বৃক্ষের পাতাগুলি মৃদুমন্দ আন্দোলিত হচ্ছে, সহকার নবপল্লবের অর্ঘ্য সাজিয়ে ধরেছে, নবমল্লিকা পুষ্পস্তবকাবনম্রা হয়ে নয়নাভিরাম শোভা ধারণ করেছে, ভ্রমরগুঞ্জনে বন্দনাগীতির সুর ধ্বনিত হচ্ছে। আমরা হৃদয়ঙ্গম করি, শকুন্তলা ও আশ্রম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শকুন্তলা বৃক্ষে জলসেচন না ক'রে জলগ্রহণ করে না। মণ্ডনপ্রিয়া হয়েও স্নেহবশত বৃক্ষপল্লব ছিন্ন করে না। বৃক্ষে প্রথম পুষ্পোদ্‌গমের সময় তার কাছে উৎসব। মাতৃহারা মৃগশিশুকে সে সন্তানের মতো লালন-পালন করে। কণ্বের প্রতি তার অগাধ ভক্তি, গৌতমীর প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা, সখীদের প্রতি অসীম প্রীতি। শকুন্তলা প্রিয়ংবদার মতো চপলা ও মুখরা নয়, অনসূয়ার মতো গম্ভীর ও স্বল্পবাক্‌ও নয়, শকুন্তলায় অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার এক সুন্দর সমন্বয় হয়েছে।

আর ডেস্‌ডেমোনা? শেক্‌স্‌পিয়রের অধিকাংশ বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকার মতো ডেস্‌ডেমোনাও মাতৃহীনা। ধনী ব্রেবান্‌শিওর আদরের দুলালী একমাত্র সন্তান ডেস্‌ডেমোনা। আমরা মানসনেত্রে দেখতে পাই, ব্রেবান্‌শিও কি যত্নে ও আদরে তাকে প্রতিপালন করেছে, বাল্যকাল অতিক্রান্ত হতে না হতেই কি ভাবে ডেস্‌ডেমোনা পিতার সহায়তা করতে আরম্ভ করেছে, কি ভাবে ধীরে ধীরে পিতা-পুত্রীর ক্ষুদ্র সংসারটি প্রণয়রজ্জুর বন্ধনে সম্পূর্ণ বেষ্টিত হয়ে পড়েছে। ডেস্‌ডেমোনার প্রকৃতি?

> A maiden never bold.
> Of spirit so still and quiet, that her motion
> Blushed at herself.

শকুন্তলা ও ডেস্‌ডেমোনা দু'জনেরই অসাধারণ সৌন্দর্যের অধিকারিণী। শকুন্তলা সুলোচনা, তার দৃষ্টিপাত চকিতহরিণী-প্রেক্ষণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শকুন্তলা সঞ্চারিণী, পল্লবিনী লতেব। তার—

'অধর কিশলয়-রাঙিমা-আঁকা,
যুগল বাহু যেন কোমল শাখা,
হৃদয় লোভনীয় কুসুম হেন
তনুতে যৌবন ফুটেছে যেন।'

শকুন্তলার সৌন্দর্যের একটা উন্মাদয়িত্রী শক্তি আছে। এর প্রভাবে বহুপত্নীক দুষ্মন্ত পর্যন্ত মত্ত হয়ে ওঠে। শকুন্তলার সৌন্দর্য প্রভা-তরল জ্যোতির সৌন্দর্য। সৌন্দর্যমুগ্ধ হৃদয় বলে ওঠে—

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥

সৌন্দর্যমাত্রেরই অল্পবিস্তর মোহিনী শক্তি থাকে। তাই ডেস্‌ডেমোনার সৌন্দর্য রডারিগো প্রভৃতি বহু পাণিপ্রার্থীকে মোহিত করেছিল। ডেস্‌ডেমোনার সৌন্দর্যের শান্তকরী শক্তিতে অভিভূত হয়ে প্রবল ঝঞ্ঝা, প্রমত্ত সমীরণ, উত্তাল তরঙ্গ প্রভৃতি জলপথের ভীষণ বিপদ, সব যেন তাদের হিংস্র স্বভাব ভুলে যায়; ডেস্‌ডেমোনাকে তারা নিরাপদে সাইপ্রাসে পৌঁছে দেয়। ক্যাশিওর মুগ্ধ দৃষ্টিতে ডেস্‌ডেমোনা—

...paragons description and wild fame;
One that excels the quirks of blazoning pens,
And in the essential vesture of creation
Does tire the ingener.

আপাতদৃষ্টিতে শকুন্তলা ও ডেস্‌ডেমোনার প্রেম অস্বাভাবিক মনে হওয়া বিচিত্র নয়। শকুন্তলা আশ্রম-জীবনের সঙ্গে যেরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, তাতে শকুন্তলাহীন আশ্রম বা আশ্রমহীনা শকুন্তলার কথা কল্পনার অতীত। কিন্তু আশ্রমের অধিবাসিনী হয়েও শকুন্তলার শুধু তনুই নয়, মনও ছিল কুসুমের মতো কোমল। তাই যদিও অনুরাগের স্থান তপোবনে নয়, উপবনে, শকুন্তলার পরিণত কোমল মন প্রিয়দর্শন দুষ্মন্তের প্রথম দর্শনেই তপোবন-বিরোধী ভাবে চঞ্চল হয়ে উঠল। 'যে হরিণী ব্যাধকে চেনে না, তাহার কি বিদ্ধ হইতে বিলম্ব লাগে?'

ডেস্‌ডেমোনা তার ছোট সংসারের গৃহিণী। ডেস্‌ডেমোনা-হীন ব্রেবানশিওর জীবন যে বিড়ম্বনাময় জীবন, সে কথা কল্পনা করা শক্ত নয়। ডেস্‌ডেমোনার বাবা ছিলেন প্রতিপত্তিশালী senator— ডেস্‌ডেমোনা সুপুরুষ ভিনীসীয় যুবকদের সম্পর্কে যে আসে নি, তা মনে হয় না। কিন্তু তাতে তার মনে কোনো রূপ রেখাপাত হয় নি। হঠাৎ ওথেলো এসে পড়ায় তার স্বাভাবিক জীবনধারা বিপর্যস্ত হয়ে গেল। ওথেলোর 'moving accidents by flood and field'-এর চমকপ্রদ কাহিনী ডেস্‌ডেমোনাকে আকৃষ্ট করল। ডেস্‌ডেমোনার অনুরাগের উৎপত্তি বিস্ময়ে, তাই বলা হয়, 'In the love of Desdemona there is a romantic element।'

শকুন্তলার প্রেম ডেস্‌ডেমোনার প্রেমের বিপরীত। শকুন্তলার প্রেম প্রথম দৃষ্টির প্রেম— ডেস্‌ডেমোনার প্রেমের বিকাশ ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে। শকুন্তলার প্রেম সাদৃশ্যের প্রেম— শকুন্তলা রূপবতী, তাই রূপবান দুষ্মন্তে সহজেই সে আকৃষ্ট হল। ডেস্‌ডেমোনার প্রেম বৈসাদৃশ্যের প্রেম— ডেস্‌ডেমোনা নিজে গৌরাঙ্গী, অসামান্যা সুন্দরী, অথচ ওথেলো কৃষ্ণাঙ্গ এবং আর যাই হোক, রূপবান নয়। বয়সের দিক থেকে দুষ্মন্ত ও ওথেলো কেউই তরুণ নয় ; ওথেলো নিজে এ বিষয়ে সচেতন ছিল—

Haply for I am black
And have not those soft parts of conversation
That chamberers have, or, for I am declin'd
Into the vale of years…

ডেস্‌ডেমোনার প্রেমকে তাই elective affinity-র নিদর্শন রূপে গ্রহণ করা যায়, গ্যেটে যে-সম্বন্ধে বলেছেন, Not like to like, but like to unlike draws। শকুন্তলার কাছে দুষ্মন্তের প্রধান আকর্ষণ তার রূপ (ভারতীয় ভঙ্গীতে—'কন্যা বরয়তে রূপম্') ; ডেস্‌ডেমোনার কাছে ওথেলোর প্রধান আকর্ষণ তার শৌর্য (পাশ্চাত্ত্য ভঙ্গীতে—'None but the brave deserves the fair')।

প্রথম প্রেম শকুন্তলাকে ব্রীড়াবনতা করে দেয়। সে সখীদের কাছ থেকে নিজের মনোভাব গোপন করবার জন্য ছল-বল-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করার চেষ্টা করে। দুষ্মন্তকে একটু দেখবার জন্য সে একান্ত উৎসুক, এই জন্য সামান্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে সে কুণ্ঠিত হয় না। 'ছল করে শাখে আঁচল লাগায়ে, ফিরে চায় পিছু পানে।' শকুন্তলার মতো, ডেস্‌ডেমোনার প্রথম প্রেমও fears the light —তার প্রেম, প্রথম দিকে, ভীত ও হীনবল। তাই সেও সামান্য ছলের আশ্রয় নিতে কুণ্ঠিত হয় না। 'Desdemona had not only disguised her sentiments from her father but had idly sought to do the same from Cassio, who was in the secret.'

রোমিওর প্রতি জুলিয়েটের ভালোবাসা এত গভীর ছিল যে, প্রিয়তমের সঙ্গে কথোপকথনের সময় জুলিয়েট বলেছিল,—

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep.

শকুন্তলা ও ডেস্‌ডেমোনা দু'জনেরই ভালোবাসা প্রগাঢ় ভালোবাসা, সাগরতুল্য গভীর। উভয়েরই প্রেম একনিষ্ঠ। বঙ্কিমচন্দ্র তাই লিখেছেন, 'স্নেহশালিনী এবং সতী ত যে সে। আজকাল রাম, শ্যাম, যদু, মধু, নিধু, বিধু, যে সকল নাটক, উপন্যাস, প্রেতন্যাস লিখিতেছেন, তাহার নায়িকামাত্রেই স্নেহশালিনী সতী। এই সকল সতীদিগের নিকট একটা পোষা বিড়াল আসিলে তাঁহারা স্বামীকে ভুলিয়া যান। আর পতিচিন্তামগ্না শকুন্তলা দুর্বাসার ভয়ঙ্কর 'অয়মহম্ভোঃ' শুনিতে পান নাই। সকলেই সতী, কিন্তু জগৎ সংসারে অসতী নাই বলিয়া, স্ত্রীলোকে অসতী

হইতে পারে না বলিয়া ডেস্‌ডিমোনার যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মর্মের ভিতর কে প্রবেশ করিবে ?'

শকুন্তলা ও ডেস্‌ডেমোনা উভয়েরই প্রেম প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে, মিলনের প্রতীক্ষা করে। তাই যিনি নীতিনিষ্ঠ তাঁর কাছে জুলিয়েটের প্রেমে যে সংযমের অভাব পরিলক্ষিত হয়, শকুন্তলার ও ডেস্‌ডেমোনার প্রেমেও সেই সংযমের অভাব দৃষ্ট হয়। এরা দু'জনেই গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করেই আত্মসমর্পণ করেছে। যিনি নীতির পক্ষপাতী, তিনি আরও বলবেন, সংযমহীন প্রেম হীন প্রেম, এ প্রেম জীবনকে দেয় না ঐশ্বর্য, মৃত্যুকে দেয় না মহিমা। রবীন্দ্রনাথ এ মতেরই অনুবর্তী হয়ে লিখেছিলেন—'দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বন্ধনহীন গোপনমিলন চিরকালের অভিশাপে অভিশপ্ত।' 'Romeo and Juliet'-এ Friar Lawrence আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে, Violent delights have violent ends। 'শকুন্তলা' নাটকেও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে— সাধারণত দেখা যায়, অনিয়ন্ত্রিত আত্মকৃত চপলতা মনস্তাপেরই কারণ হয়।

শকুন্তলা ও ডেস্‌ডেমোনা দু'জনেই জুলিয়েটের মতো star-crossed lover। দু'জনকেই শুধু স্বামীর প্রেমই হারাতে হয় নি, তার আগে দু'টি ছোট জিনিস তারা হারিয়েছে, যেটা বড় উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু'জনেই প্রেমের অভিজ্ঞান হারিয়েছে, একজন অঙ্গুরীয় ও আর একজন রুমাল। এবং দু'জনের জীবনেই এই দু'টি সামান্য জিনিসের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এমন কি, সপ্তদশ শতকের শেষভাগে লেখা টমাস রাইমারের সমালোচনায় 'Othello'-কে tragedy of the handkerchief ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌' এবং 'ওথেলো' দু'টি নাটকেই অভিজ্ঞান দু'টির উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শকুন্তলার বিবাহোত্তর জীবন বিধি-বিড়ম্বিত। শকুন্তলাকে রাজা যখন চিনতে পারলেন না, তখন শকুন্তলা মরমে মরে গেল। একি? 'হৃদয়, সাম্প্রতং তে আশঙ্কা!' কিন্তু রাজা যখন কিছুতেই বিবাহের কথা স্বীকার করলেন না, বরং শকুন্তলার চরিত্রের প্রতি ও সমগ্র স্ত্রীজাতির প্রতি কটাক্ষ করলেন, তখন শকুন্তলার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। Susan Winstanley-র মতো সেও নারীত্বের মর্যাদা সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন ছিল। তার চক্ষু রক্তবর্ণ ও ভ্রূ বক্রতর হয়ে উঠল। স্ফুরিতোত্তরাধরা শকুন্তলা সকোপে বলল, 'অনার্য, আত্মনো হৃদয়ানুমানেন প্রেক্ষসে। ক ইদানীম্‌ অন্য ধর্মকঞ্চুকপ্রবেশিনস্তৃণছন্নকূপোপমস্য তবানুকৃতিং প্রতিপৎস্যতে?'

ডেস্‌ডেমোনার বিবাহোত্তর জীবনও বিধি-বিড়ম্বিত। এমিলিয়ার সামনেই যখন ওথেলো তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করল, তখন ডেস্‌ডেমোনার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত ব্যথিত হয়ে উঠেছে। কেন এমন হয়? 'I never gave him cause!' ওথেলো যখন তাকে তার আত্মীয় লডোভিকোর সম্মুখে অকারণ অতর্কিত আঘাত করল, তখন ডেস্‌ডেমোনার একমাত্র উত্তর—'I have not

deserved this.' ডেস্‌ডেমোনা যেন সর্বংসহা ধরিত্রী। যখন ওথেলো 'thou art false as hell', 'public commoner' প্রভৃতি অকথ্য কটুবাক্য বলতে লাগল, তখন ডেস্‌ডেমোনার শান্ত অথচ মর্মভেদী উত্তর, 'By heaven, you do me wrong!' সে এমিলিয়াকে বলল, 'It is my wretched fortune!'[১] পতির স্নেহদীপ্তিতে ডেস্‌ডেমোনার কাছে সমগ্র পৃথিবী ছিল সমুজ্জ্বল। তাই ওথেলো যখন রাহুগ্রস্ত হল, ডেস্‌ডেমোনার জগতে আঁধার নেমে এল। কিন্তু তবু তার মনে ওথেলোর প্রতি কোনোরূপ বিদ্বেষের উন্মেষ হল না। যখন এমিলিয়া বলে ওঠে—'I would you had never seen him!' তখন ডেস্‌ডেমোনার উত্তর—

'So would not I! my love doth so approve him,
That even his stubbornness, his checks, his frowns
have grace and favour in them.'

ডেস্‌ডেমোনার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'Words are with her the vehicle of sentiment, and never of reflection'। এই বিষয়ে ডেস্‌ডেমোনার সঙ্গে শকুন্তলার আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য আছে। ডেস্‌ডেমোনার কথাবার্তার মতো শকুন্তলার কথোপকথনের মধ্যেও একটিও 'general observation' নেই।

শকুন্তলা সরলা। 'স্বৈরিণী' কথাটি সে সহ্য করতে পারে না। সে বলে "আত্মচ্ছন্দচারিণী"। ডেস্‌ডেমোনার স্বর্গীয় সারল্য। সে ওই ধরনের কোনো অপবিত্র শব্দই উচ্চারণ করতে পারে না। সে বলে—

'Am I that name, Iago?'
'What name, fair lady?'
'Such as she says my lord did say I was?'

শকুন্তলা বাঁচতে চায়। তার নবীন যৌবন, তার দেহ ও মনে জীবনের প্রাচুর্য, আর সর্বোপরি সে ভাবী জননী— এই অবস্থায় প্রাণের মায়া কাটান সম্ভব নয়। তাই সে প্রিয়-পরিত্যক্তা হয়েও বাঁচতে চায়। আশাবন্ধে বদ্ধ হৃদয়ে সে হয়তো ভেবেছিল, পূর্বে যে স্বামীর সে দ্বিতীয় হৃদয়, নয়নের কৌমুদী, অঙ্গে অমৃত-স্বরূপ ছিল— যে দুষ্মন্ত একদিন গর্বভরে বলেছিল, 'দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে', হয়তো সে স্বামী, সে দুষ্মন্ত সুমতি ফিরে পাবে। তাই গৌতমী প্রভৃতির উদ্দেশে সে বলেছিল, 'কথমনেন কিতবেন বিপ্রলব্ধাস্মি যূয়মপি মাং পরিত্যজথ?' কিন্তু বৃথাই, তার অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে ভারতীয় নারীর চিরন্তন ক্রন্দন ধ্বনিত হয়ে উঠল—'ভগবতি বসুধে, দেহি মে বিবরম্।'

ডেস্‌ডেমোনাও বাঁচতে চায়, সেও তো শকুন্তলার মতো নবীনা। 'The miserable hath no other medicine but only hope.' ওথেলোর যে মহান্

১। তুলনীয়—কল্যাণবুদ্ধেরথবা তবায়ং ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ
মমৈব জন্মান্তর পাতকানাং বিপাকবিস্ফূর্জথুরপ্রসহ্যঃ। 'রঘুবংশ' ১৪।৬২

হৃদয় এক দিন ডেস্‌ডেমোনার স্বচ্ছ মনোমুকুরে উজ্জ্বলভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল, আজ সে হৃদয়ের ছবি মসীলিপ্ত, কলঙ্কিত হলেও ডেস্‌ডেমোনা হয়তো ক্ষীণ আশা পোষণ করে, ওথেলোর হৃদয়ের পরিবর্তন হবে। তাই তার আন্তরিক অনুনয়—
'O ! banish me, my lord, but kill me not !'

শকুন্তলার দুঃসময় কেটে আসছিল, সে মারীচাশ্রমে আশ্রয় পেল। শকুন্তলার পূর্ববর্তী জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে পার্থক্য অনেক। মারীচাশ্রমে আসার আগে আমরা তাকে দেখেছি লীলাচঞ্চলা, অভিমানিনী। মারীচাশ্রমে আসার পর আমরা শকুন্তলাকে দেখি অনুতপ্তা, ভরত-জননী। শকুন্তলার প্রথম জীবনের প্রেম ছিল চঞ্চল, মোহগ্রস্ত। শকুন্তলার দ্বিতীয় জীবনের প্রেম নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, স্থির—নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অচপল'। প্রথম জীবনের শকুন্তলা মর্ত্যের শকুন্তলা, দ্বিতীয় জীবনের শকুন্তলা স্বর্গের শকুন্তলা। সুদীর্ঘ তপস্যায় মর্ত্যজীবনের সব গ্লানি নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। স্বর্গের শকুন্তলা মলিন-ধূসর-বসনা, নিয়মচর্চায় শুষ্কমুখী, এক-বেণীধরা, বিরহব্রতচারিণী, শুদ্ধশীলা। এ শকুন্তলা পুনর্মিলনের সময় স্বামীর কোনো অপরাধই ধরল না, শুধু অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে সপ্রণাম অভিনন্দন জানাল। অনাবিল, স্বর্গীয় প্রেমে শকুন্তলার জীবন ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠল, তার জীবন মহাজীবনে পরিণত হল।

ডেস্‌ডেমোনার দুঃসময় কাটে নি। ওথেলো যখন তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছিল, যখন হৃদয়ঢালা প্রেমের প্রতিদানে হৃদয়ঢালা প্রেম দিতে পেরেছিল, তখন ডেস্‌ডেমোনার সংযমের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু যখন ওথেলো তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে আরম্ভ করল, যখন সমস্ত সম্বল উজাড় করে দেওয়া প্রেমের পরিবর্তে দিল অপরিমেয় ঘৃণা ও মর্মান্তিক জ্বালা, তখন ডেস্‌ডেমোনা অসামান্য সাহস ও সংযমের পরিচয় দিল। তার প্রেমের ভীরুতা, দুর্বলতা কোথায় মিলিয়ে গেল। সাহসী, সবল প্রেমে সে প্রিয়তমের অত্যাচার ('ভালোবাসা ব্যথা দেয় যারে ভালোবাসে') নীরবে সহ্য করল, মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করে নিল। ডেস্‌ডেমোনা যদি কোনো দিন পাপ করে থাকে, তবে জীবনের শেষ মুহূর্তে তার প্রায়শ্চিত্ত করে গেল,—

'not by acquisition of a confident candour, such courageous dealing with difficulties was impossible for Desdemona, but by one more falsehood, the sacred lie which is murmured by her lips as they grow forever silent :

Emilia. O ! who hath done this deed ?
Desdemona. Nobody ; I myself ; farewell :
Commend me to my kind lord. O ! farewell !'

অমর প্রেমের দীপ্তিতে ডেস্‌ডেমোনার মৃত্যু জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল, তার মরণ মহামরণে পরিণত হল।

রামমোহনের ধর্মচেতনা

রামমোহনকে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 'বিশ্বমানব' আখ্যা দিয়েছেন। এটাই রামমোহনের প্রথম ও প্রধান পরিচয়। মানুষের জন্য, সমগ্র মানবজাতির জন্য, তাঁর ছিল অপরিসীম দরদ। তবে তিনি নিজে ভারতীয় হওয়াতে ও ভারতবর্ষের দুর্দশা সেই সময় প্রকট হয়ে ওঠাতে স্বাভাবিকভাবেই তিনি ভারতের ও ভারতবাসীর কল্যাণের কথা আগে ভেবেছেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যমের প্রবণতা সে দিকে। ভারতপথিক রামমোহনের পক্ষেই বিশ্বপথিক রামমোহন হয়ে ওঠা সম্ভব। গতিহীন নিশ্চল ভারতীয় সমাজে তিনি আবার প্রাণচাঞ্চল্য সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন এবং সেই কারণে সমাজের সর্ববিধ সংস্কার-সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। তাই তাঁর সংস্কারকের ভূমিকা এত গুরুত্বপূর্ণ। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এটা তাঁর কাছে শুধু কথার কথা ছিল না, এটা ছিল তাঁর জীবনের মন্ত্র। মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় সে মানুষ এবং মানুষরূপে তার কতকগুলি স্বাভাবিক জন্মগত অধিকার আছে। এই অধিকারগুলিকে পদদলিত হতে দেখে রামমোহন অবিচলিত থাকতে পারেন নি। একজন মানুষের অপমান তিনি মানবতার অপমান মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, 'মনুষ্যত্বের উপকরণ-বৈচিত্র্যকে তিনি তাঁর সকল শক্তি দিয়েই সম্মান করেছিলেন। মানুষকে তিনি কোনো দিকেই খর্ব করে দেখতে পারতেন না, কারণ তাঁর নিজের মধ্যেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা অসাধারণ ছিল।'

রামমোহনের ধর্মচেতনাকে তাঁর মানবিকতা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। আবার তাঁর আস্তিক্যবোধ, তাঁর ঈশ্বরে আস্থা, তাঁকে মানবকল্যাণের দিকে আরও এগিয়ে দিয়েছে। তাঁর ধর্মচেতনা ও মানবিকতা একটি অপরটির পরিপূরক। কিশোরীচাঁদ মিত্র তাই তাঁকে theophilanthropist নামে অভিহিত করেছেন। পৃথিবীতে ধর্মের নামেই সবচেয়ে বড় অধর্ম করা হয়েছে, নজরুল ইসলাম যাকে চলিত কথায় বলেছেন জাত নিয়ে বজ্জাতি। এই কঠিন সত্য রামমোহনের কাছে ছিল মর্মন্তুদ। তিনি দেখেছিলেন, এই সব অশান্তির মূলে থাকে মানুষের আবেগ-প্রবণতা ও আচারসর্বস্ব কুসংস্কার, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা নয়। তাই তিনি চাইলেন ধর্মকে গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করতে, মানুষকে যুক্তিবাদী করে তুলতে। তথাকথিত ধর্মনেতা ধর্মগুরুরা যে, অলৌকিকতার আড়ালে অনেক সময় অসত্য ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন, এ কথা তিনি জনসাধারণকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন—'অধিকাংশ লোককেই এই সব নেতারা তাঁদের দিকে এমনভাবে আকর্ষণ করেছেন যে, ঐ অসহায়

মানুষগুলি বাধ্যতা ও দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, এবং তাদের দেখবার চোখ ও বুঝবার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে। তাই নেতাদের হুকুম তামিল করবার সময় তারা সত্যিকার মঙ্গল ও সুস্পষ্ট পাপের মধ্যে প্রভেদ করাকেও অপরাধ বলে মনে করে। এবং যদিও মানুষ হিসাবে তারা মূলতঃ একই বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা মাত্র, তবু শুধু তাদের মতবাদের জন্য ও সম্প্রদায়ের খাতিরে অন্যকে বধ করা বা নির্যাতন করা বিশেষ পুণ্যকাজ বলেই মনে করে। মিথ্যাচার, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার প্রভৃতি নিকৃষ্টতম দুষ্কার্য যা আত্মার পক্ষে পারত্রিক অমঙ্গলজনক এবং মানবসাধারণের পক্ষে ঐহিক অনিষ্টকর, এইপ্রকার পাপ হতে তারা শুধু তাদের নেতাদের উপর অবিচলিত বিশ্বাস রাখলেই মুক্তি পাবে বলে মনে করে। মানুষ তাদের অমূল্য সময় এমন সব পুরাণকাহিনী পাঠ করে কাটায় যেগুলো বিশ্বাস করাও কঠিন। অথচ এতেই প্রাচীন ও নবীন নেতাদের উপর বিশ্বাস যেন আরও দৃঢ় হয়।' ('তুহ্ফত্-উল-মুওয়াহিদ্দিন' বা 'একেশ্বর-বিশ্বাসীদিগকে উপহার', বঙ্গানুবাদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস।)

রামমোহন ভারতীয়দের তথা বিশ্ববাসীকে সত্যানুশীলনে প্রবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন। আর প্রকৃত সত্যানুসন্ধানীকে তার বুদ্ধির ব্যবহার করতে হবে, যে-বুদ্ধি ঈশ্বরেরই দান। ব্রাহ্মণের সবচেয়ে বড় মন্ত্র গায়ত্রীতেও প্রার্থনা জানানো হয়েছে যেন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয়। এই মন্ত্র রামমোহনের যুক্তিবাদী মনকে আকৃষ্ট করেছিল এবং তিনি একাধিকবার এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেছেন। যদি আমরা ধর্মকে খোলা মন ও নিরঞ্জন দৃষ্টি নিয়ে দেখি তা হলে আচার ও প্রথা আমাদের কাছে ঈশ্বরের চেয়ে বড় হয়ে উঠবে না। প্রচলিত ধর্মমতগুলির প্রধান অসুবিধা এই যে, যদিও এগুলি আপাতদৃষ্টিতে ঈশ্বরকেন্দ্রিক, এগুলির মধ্যে এমন অনেক জিনিস প্রবেশ করেছে যেগুলি সঙ্কীর্ণ, অন্যায় ও অপবিত্র। এই গ্লানি থেকে মুক্ত হতে হলে ধর্মকে শুধু বাইরে নয়, অন্তরেও ঈশ্বরমুখী হতে হবে। আর বিভিন্নরূপে প্রকাশ পেলেও ঐশী শক্তি অনন্ত ও অখণ্ড। তাই আমাদের উচিত সেই শক্তিকে অখণ্ডভাবেই উপাসনা করা। এই চিন্তা থেকেই রামমোহনের একেশ্বরবাদের সূত্রপাত। বেদান্ত-দর্শনের মধ্যে তিনি তাঁর আদর্শকে খুঁজে পেলেন। খুঁজে পেলেন তাঁর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উত্তর। তাই যে-উপনিষদের উপর বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত সেই উপনিষদের মহিমা তিনি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করলেন। উপনিষদের বাংলা অনুবাদ করলেন (১৮১৬-১৮১৯ খ্রীস্টাব্দ)।

ইতিপূর্বে অবশ্য রামমোহন 'ব্রহ্মসূত্রে'র সঠিক অনুবাদ 'বেদান্ত গ্রন্থ' এবং বেদান্ততত্ত্বের সার-সংকলন 'বেদান্তসার' (১৮১৫) রচনা করেছেন। তিনি তাঁর অভিপ্রায় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন প্রথম গ্রন্থের ভূমিকায়, 'লোকেতে বেদান্তশাস্ত্রের অপ্রাচুর্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিতসকলের বাক্যপ্রবন্ধে এবং পূর্বশিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেক অনেক সুবোধ লোকও এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন এ নিমিত্ত এ অকিঞ্চন বেদান্তশাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে একপ্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ করিলেক ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে

আমাদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতিপূর্ব পরম্পরায়ে এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্তা ইত্যাদি বিশেষগুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন অথবা সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।' ভূমিকায় রামমোহন যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সেগুলির অন্যতম হচ্ছে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা সম্ভব। এটি প্রাচীন মত নয়, তাঁর নিজস্ব মত। যাঁরা অদ্বৈতবাদী ও শঙ্করাচার্যের অনুগামী, তাঁরা বিশ্বাস করেন জগতে ঈশ্বর ব্যতীত আর কোনো কিছুর প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। আর ঈশ্বর অনির্বচনীয়, অবাঙ্‌মনসগোচর, তাঁর কোনো প্রকৃতি, বৃত্তি বা গুণ নেই। জগতের নানাবিধ বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি 'অবিদ্যা' বা অজ্ঞান থেকে। অদ্বৈত-দর্শন অনুসারে, ব্রহ্ম যেহেতু নির্গুণ, তিনি আমাদের উপাস্য হতে পারেন না। রামমোহন নিজে অদ্বৈতবাদী কিন্তু প্রচলিত অদ্বৈতবাদে কিছু পরিবর্তন এনেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন, 'রামমোহন শঙ্কর-শিষ্য ও অদ্বৈতবাদী হয়েও সংসারবিমুখ হলেন না, এইটিই হল নবমতের বৈশিষ্ট্য। রামমোহন জানতেন অদ্বৈতবাদের ব্রহ্ম নির্গুণ। সেই নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিকল্প ব্রহ্ম নেতিধর্মী। অর্থাৎ ব্রহ্মকে নেতি নেতি অসংখ্যবার বলেও তাঁকে ইতিবাচক করা যায় না। সুতরাং তাঁকে সগুণরূপে উপাসনা করতে হবে। তবে সগুণ ও সাকার প্রতিশব্দবাচক নয়।'

এর মধ্যে অসঙ্গতি চোখে পড়া অস্বাভাবিক নয়। রামমোহনের ধর্মচেতনায় কিছু কিছু অন্যান্য অসঙ্গতি এবং বিরোধাভাসও লক্ষ করা যায়। যেমন, অদ্বৈত-দর্শন অনুসারে অবিদ্যা দূর করার ও জ্ঞান লাভ করার প্রধান উপায় হচ্ছে স্বজ্ঞা এবং প্রত্যাদেশ। 'যুক্তিবাদী' রামমোহন অদ্বৈতবাদের প্রয়োজনে সময় সময় বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য অস্বীকার করতে কিন্তু কুণ্ঠিত নন। কুণ্ঠিত নন উপলব্ধিকে বোধের চেয়ে বড় আসনে বসাতে। তবে এটাও ঠিক, ঈশ্বরনিষ্ঠা বোধ থেকে আসে না, অন্তরের উপলব্ধি থেকে আসে ('believing where we cannot prove')। তাই ধর্মের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক হলেও ঈশ্বরের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে রয়েছে তাঁর অনুভূতি। মহান্ যাঁরা তাঁদের চিন্তায় অনেক সময় অসঙ্গতি থাকে যেটা তাঁদের মহত্ত্বের লক্ষণ, যে-জন্য এমার্সন তাঁর 'সেল্‌ফ্‌-রিলায়ান্‌স্‌' প্রবন্ধে বলেছেন, 'A foolish consistency is the hobgoblin of little minds···With consistency a great soul has simply nothing to do.'

'বেদান্তসার' পুস্তিকাটিতে রামমোহন ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। উপনিষদাদি গ্রন্থ থেকে নানা উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেছেন। ব্রহ্মকে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানতে পারি না ; রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের মধ্য দিয়ে তিনি ধরা দেন না। কিন্তু ব্রহ্মের সগুণত্ব তিনি এখানে অস্বীকার করছেন না, তাই তাঁর কাছে ব্রহ্মের উপাসনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই উপাসনার জন্য আবশ্যক চিত্তের স্থিরতা। সুতরাং, রামমোহনের মতে, 'ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠানের

জন্য কোনো তীর্থের, কোনো দেশের অপেক্ষা নাই। যেখানে চিত্তের স্থৈর্য হয়, সেই স্থানে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক ইহাতে দেশের এবং তীর্থাদের নিয়ম নাই যেহেতু বেদে কহিতেছেন। যে স্থানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানে উপাসনা করিবেক।' গ্রন্থের উপসংহারে রামমোহন আরও লিখেছেন, 'বেদের প্রমাণ এবং মহর্ষির বিবরণ আর আচার্য্যের ব্যাখ্যা অধিকন্তু বুদ্ধির বিবেচনা এ সকলেতে যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার নিকট শাস্ত্র এবং যুক্তি এ দুই অক্ষম হয়েন।' এখানে 'শাস্ত্র এবং যুক্তি' ও 'বুদ্ধির বিবেচনা' বাক্যাংশগুলি বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। এই গ্রন্থে আর একটি জিনিস রয়েছে লক্ষ করবার। রামমোহন সংসারকে প্রপঞ্চময় বা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেন নি। সাধারণ অদ্বৈতবাদীর ভঙ্গীতে জগৎকে 'মায়া' ভেবে অস্বীকার করেন নি। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও মুক্তি খুঁজেছেন বৈরাগ্য-সাধনে নয়, সংসারের অসংখ্য বন্ধনের মাঝে।

এই পুস্তিকার স্বরচিত ইংরাজী অনুবাদের জন্য রামমোহন একটি ভূমিকা লেখেন। তাতে তিনি তাঁর পুস্তিকা-প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। প্রচলিত পৌত্তলিকতার পথ পরিহার করে একেশ্বরবাদের নতুন পথে পা বাড়ানোর জন্য ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকল শ্রেণীর হিন্দুর তিনি নিন্দাভাজন হয়েছিলেন কিন্তু এ নিন্দা তাঁর প্রাপ্য ছিল না, যেহেতু প্রাচীন ভারতীয়েরাও তাঁর মতো একেশ্বরবাদী ছিলেন। তাঁর রচনায় এটাই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর নিজের ভাষায়, 'My constant reflections on the inconvenient or rather injurious rites introduced by the peculiar practice of Hindoo idolatry which, more than any other pagan worship, destroys the texture of society, together with compassion for my countrymen, have compelled me to use every possible effort to awaken them from their dream of error: and by making them acquainted with their scriptures, enable them to contemplate with true devotion the unity and omnipresence of Nature's God.' ('The English Works of Raja Rammohun Roy', ed. Nag & Burman, Part II, 1945, p. 60)

'সংস্কৃত ভাষার কৃষ্ণ যবনিকার আবরণে ঢাকা' শাস্ত্রাদিকে লোকচক্ষুর সামনে নিয়ে আসাকে রামমোহন নিজের কর্তব্য মনে করেছিলেন। যে-পাঁচখানি উপনিষদের তিনি বঙ্গানুবাদ করেন সেগুলি হচ্ছে তলবকার বা কেন, ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য। শঙ্করাচার্য উপনিষদ্-কথাটির সংজ্ঞা দিয়েছেন, 'সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যোপনিষচ্ছব্দবাচ্যা, তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্যাত্যন্তাবসাদনাৎ' অর্থাৎ এ সেই ব্রহ্মবিদ্যা যা সহেতুক সংসারের অত্যন্ত অবসাদন করে বা সংসারকারণের সমূলে বিনাশ করে। যেহেতু রামমোহন সংসারবর্জনের পক্ষপাতী নন, তাই তিনি শঙ্করাচার্যের সংজ্ঞার 'ব্রহ্মবিদ্যা' অংশটুকু গ্রহণ করে লিখলেন, 'ব্রহ্মবিষয়ের বিদ্যাকে উপনিষদ শব্দে কহা যায়। অথবা যে বিদ্যা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করান সেই বিদ্যাকে উপনিষদ শব্দে

কহি।' অবশ্য ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা উপনিষদগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ—'ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্ম হয়েন, ইহার কারণ দিতেছেন। ব্রহ্মেতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচ গুণ নাই ; অতএব তাঁহাকে শুনিতে, স্পর্শ করিতে, দেখিতে, আস্বাদন করিতে, আঘ্রাণ করিতে কেহ পারে না।' (কঠোপনিষদ, ১।৩।১৫, রামমোহনের অনুবাদ।) 'যাঁহাকে মন আর বুদ্ধির দ্বারা লোকে সংকল্প এবং নিশ্চয় করিতে পারেন না, আর যিনি মন আর বুদ্ধিকে জানিতেছেন এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানীরা কহেন, তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান। অন্য যে পরিচ্ছিন্ন যাহাকে লোকসকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে।' ('কেন', ১।৫, রামমোহনের অনুবাদ)

এই সব ভাবধারাই রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতের মূল প্রেরণা—

'মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।
সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয়বিষয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ তায়, কিরূপে সম্ভবে।
ইচ্ছামাত্র করিলে যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে
ইচ্ছামতে করে নাশ, সেই সত্য এইমাত্র নিতান্ত জানিবে।'

উপনিষদের যেসব অংশের একাধিক ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে সে-সব স্থানে সাধারণত রামমোহন আচার্য শঙ্করের ব্যাখ্যাকে প্রামাণ্য মনে করেছেন। একটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রেই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় শ্লোকাংশ 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন—'সেই ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত দ্রব্যের দ্বারা ভোগ করিবে।' শঙ্করাচার্য কিন্তু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—'সেই হেতু ত্যাগের দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিবে।' রামমোহন শঙ্করাচার্যকেই অনুসরণ করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ শঙ্করাচার্য ও রামমোহনের এ ব্যাখ্যা সর্বত্র গ্রহণ করেন নি। তিনি 'ধর্ম' গ্রন্থের অন্তর্গত ধর্মপ্রচার-প্রবন্ধে এই অংশের অনুবাদ করেছেন এইভাবে, 'তিনি (ঈশ্বর) যাহা দান করিয়াছেন তাহাই ভোগ করিতে হইবে।'

মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভূমিকার প্রথমাংশে রামমোহন বলেছেন যে, জাগতিক অস্তিত্বের সত্য তখনই যখন জগৎ ঈশ্বরের প্রতিরূপ, 'এইরূপে জগতের কারণ এবং ব্রহ্মাণ্ডের ও তাবৎ শরীরের চেষ্টার কারণ যে পরমেশ্বর, তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিলে সেই ব্যক্তির অবশ্য নিশ্চয় হইবে যে, এই নামরূপময় জগৎ কেবল সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।' ভূমিকার শেষাংশে তিনি এই কথারই পুনরাবৃত্তি কবেছেন, 'ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল বলবান্ হইয়া যাহাতে আপনার ও পরের পীড়া জন্মাইতে না পারে এমৎ যত্ন সর্বদা করিবেন ; কিন্তু অন্তঃকরণে সর্বদা জানিবেন এই প্রপঞ্চময় জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থসকল কেবল সদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে।' ('উপনিষদ', সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১৯৭০, পৃ. ১৫৫, ১৭৫।) দেখা যাচ্ছে, সমন্বয়বাদী রামমোহন শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সমন্বয়ে উদ্যোগী।

(অদ্বৈতবাদ শুধু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে বস্তু, আত্মা এবং ঈশ্বর এই ত্রিবিধ অস্তিত্ব স্বীকৃত।) পাশ্চাত্ত্য জগতের কর্মের আদর্শের সঙ্গে প্রাচ্যের ধ্যান ও মননের আদর্শকে তিনি মেলাতে চেয়েছেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে বুদ্ধিরও রামমোহন সমন্বয় করতে চেয়েছেন, শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে যুক্তির।

ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। ব্রহ্ম যেমন গভীর, সর্বব্যাপী ও অনন্ত, ব্রহ্মজ্ঞানও তেমনই সীমাহীন। এই সম্পর্কে কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দের 'দ্য ক্যাল্‌কাটা রিভিউ' পত্রিকার একটি সংখ্যায় লেখেন, 'He deeply felt that the idea of God, the Great First Cause--the Primitive and Infinite Intelligence—is the most sublime and comprehensive of all ideas.' A. K. Sen-রচিত 'Raja Rammohun Roy : The Representative Man,' 1967, গ্রন্থে উদ্ধৃত।) এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রসারই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বলে রামমোহন মনে করতেন। এই জ্ঞানের কাছে অন্য সব জ্ঞান তুচ্ছ। এই জ্ঞানই মানুষের উন্নতির ভিত্তি। এই জ্ঞানই সুখের সোপান, ইহলোকে ও পরলোকে।

ঈশ্বরের অন্বেষণে রামমোহন ছিলেন অনলস। ধর্ম থেকে ধর্মান্তরে, গ্রন্থ থেকে গ্রন্থান্তরে তিনি পরাবিদ্যার অনুসন্ধান করেছেন। ইসলামের একেশ্বরবাদ তাঁকে বেশ আকৃষ্ট করে এবং তিনি কোরাণের সযত্ন অধ্যয়ন করেন। এ জন্য তিনি 'জবরদস্ত মৌলবী' বলে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ইসলামের কোনো কোনো বিষয় তাঁর কাছে উদ্বেজক মনে হয় এবং তিনি নির্দ্বিধায় সে-সবের সমালোচনা করেন। খ্রীস্টান ধর্মের দিকেও রামমোহন আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর বাইব্‌ল্-প্রীতি তাঁকে শিক্ষাব্রতী মিশনারি ডাফ্‌ সাহেবের সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। খ্রীস্টের উপদেশাবলী একত্রে সংকলিত করে রামমোহন একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন (১৮২০)। গ্রন্থটিকে তিনি 'সুখ ও শান্তির পথনির্দেশক' রূপে নামপত্রে বর্ণনা করেন। সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। বাইব্‌লের বিশ্ববিশ্রুত প্রার্থনা 'দ্য লর্ডস্‌ প্রেয়ার' রামমোহনের বিশেষ প্রিয় ছিল। কিন্তু তিনি যীশুখ্রীস্টকে ভগবানের অবতাররূপে স্বীকার করতে পারেন নি। রামমোহন তুলনামূলক ধর্ম চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ।

সকল ধর্মের মধ্যে রামমোহন একটি ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন সেই ঐক্যসূত্রটি সকলের সামনে তুলে ধরতে। একটি ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের বিরোধই এতদিন বড় করে দেখা হত ; রামমোহনই প্রথম ভারতীয় যিনি একটি ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের সাদৃশ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। তিনি দেখালেন, বিশেষ করে 'তুহ্‌ফৎ-উল্-মুওয়াহিদ্দিন্' নামক ফার্সী রচনায়, যে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ ও নিরাসক্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস সব ধর্মেরই মুখ্য বৈশিষ্ট্য। মানুষের আত্মার অস্তিত্বও মোটামুটি সর্বজনস্বীকৃত। পরলোকের অস্তিত্বের কথাও সব ধর্মে মেনে নেওয়া হয়েছে, যে-পরলোকে ইহলোকের পাপ-পুণ্য অনুসারে মানুষ তার শাস্তি বা পুরস্কার পাবে। এই বিষয়গুলির উপর জোর দিলে দেখা যাবে ধর্মে ধর্মে কোনো

বিসংবাদ থাকবে না, বরং বিভিন্ন ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ফলে মানবসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। তাদের পরস্পরের সংযোগ পরস্পরকে সম্পূর্ণতর করে তুলবে, কিন্তু প্রতিটি ধর্মের বিকাশের ধারা হবে স্বতন্ত্র। তাঁর নিজের জীবনে রামমোহন সব ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শের সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাই লিখেছেন, 'These historic cults and cultures had been fused in one discipline of universal Humanity in his soul.' ('Rammohun : The Universal Man') তবে সব কিছুর উর্ধ্বে রামমোহন স্থান দিয়েছেন ব্রহ্মকে, যে পরমেশ্বর সকল জীবের প্রভু, সকল জীবের পালনকর্তা, যিনি মহাকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে রয়েছেন।

ধর্মপ্রাণ রামমোহন সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন 'above all and beneath all a religious personality'। এ উক্তি অতিরঞ্জিত নয়। ধর্মের জন্যই ধর্মের প্রয়োজন তো আছেই, সমাজের মঙ্গলের জন্যও ধর্মের প্রয়োজন অপরিসীম, এ বিশ্বাস রামমোহনের ছিল। তাই তিনি ভারতবর্ষে এমন এক ধর্মের প্রচলন চেয়েছিলেন যা সমাজকে শতধা বিভক্ত করবে না, সমাজকে নিবিড় ঐক্যের বন্ধনে গ্রথিত করবে। (ধর্ম-শব্দটি ধৃ-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, তাই এর আক্ষরিক অর্থ 'যা ধারণ করে', 'লোকধারক'।) এই উদ্দেশ্য নিয়েই রামমোহন আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মোপাসনার প্রবর্তন করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এর ফলে লোকের চিত্তশুদ্ধি সহজ হবে এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের বোধ জাগ্রত হবে। তাই তিনি চেয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজ কোনো সংকীর্ণতাকে বা গোষ্ঠীগত মনোভাবকে প্রশ্রয় দেবে না। তাই ব্রাহ্মসমাজের দলিলে আমরা দেখতে পাই—'...no sermon preaching discourse prayer or hymn be delivered, made or used in such worship but such as have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the univeise to the promotion of charity, morality, piety, benevolence, virtue and the strengthening the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds.' (ডঃ অজিতকুমার ঘোষ-সম্পাদিত 'রামমোহন রচনাবলী,' ১৯৭৩, ভূমিকা, পৃ. উনিশ।) এটা দুঃখের বিষয় যে, ব্রাহ্মসমাজের বিকাশের ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাব রামমোহনের এই মহান্ আদর্শ পরবর্তী কালে যথাযথ মূল্য পায় নি।

রামমোহনের ধর্মমতে সব ধর্মেরই প্রভাব রয়েছে কিন্তু বেদান্তই এর মূল ভিত্তি। ব্রাহ্মণ্যধর্মের তিনি বিরোধী ছিলেন না কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল পৌত্তলিকতা ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যসম্মত নয়। তিনি চেয়েছিলেন অসার সব কিছু পরিত্যাগ করে সর্বোত্তম ব্রহ্মের উপাসনায় তাঁর দেশবাসী মগ্ন হোক, তিনি নিজে যেমন হয়েছিলেন। গৃহস্থ-ধর্মের সঙ্গে এর কোনো বিরোধ নেই যদি আমরা বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'ব্রহ্মের মধ্যেই আমাদের সংসারের পরিণাম, আমাদের কর্মের গতি।'

তবেই আমরা যা কিছু করব আমাদের সেই সব কর্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করতে পারব ('যদ্ যদ্ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ') এবং কোনো কিছু থেকেই আর আমাদের ভয় থাকবে না কারণ সেই ব্রহ্মের আনন্দ যে জেনেছে তার কিছুতে ভয় নেই ('আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন')।

রামমোহনের ধর্ম এমন এক ধর্ম যা সমস্ত বিশ্বের কাছে গ্রহণীয়, তাই একে বিশ্বধর্ম বা universal religion বলতে কোনো বাধা নেই। বিশ্বমানব রামমোহনের কাছে আমরা এই ধরনের ধর্মই আশা করব। তিনি সাধারণ তীর্থযাত্রী নন, বিশ্ব-কল্যাণের মন্দির অভিমুখে তাঁর পরিক্রমণ। তাই তিনি বিশ্বপথিক। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়, 'বাস্তবিক রাজা অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বিশ্বজনীন বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে তিনি বিশ্বাস করিতেন। এক ঈশ্বরের উপাসনা এবং জীবের কল্যাণসাধনকেই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন।' ('মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়')

মধুসূদনের সনেটে কবি ও কাব্য

শেক্‌স্‌পিয়র তাঁর সনেটগুলিতে নিজেকে কতটা ধরা দিয়েছেন আমরা জানি না, যদিও ওয়ার্ডসোয়ার্থ মনে করেন যে, সনেটের চাবিকাঠি দিয়ে শেক্‌স্‌পিয়র তাঁর হৃদয়দ্বার আমাদের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। শেক্‌স্‌পিয়রের আত্ম-প্রকাশ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ থাকলেও, মধুসূদন যে তাঁর সনেটের মধ্যে নিজের হৃদয় অনাবৃত করে পাঠকের সামনে মেলে ধরেছেন এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। মধুসূদন ছিলেন বাণীর পূজারী, একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধক। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর একাধিক চতুর্দশপদী কবিতায় তাঁর সারস্বত সাধনার ইতিহাস কবির নিজের ভাষায় বিধৃত হয়ে রয়েছে। এর কয়েকটিতে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতের কয়েকজন বিশিষ্ট কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। তাঁর প্রিয় কবিদের থেকে তিনি নিজেই এঁদের নির্বাচন করে নিয়েছেন। এগুলির কাব্যমূল্য অসামান্য না হলেও মধুসূদনের ভাবজীবনের একটি অন্তরঙ্গ দিক এগুলিতে উদ্ঘাটিত হয়েছে। গভীর কাব্যপ্রীতি মধুসূদনের সনেটগুলিকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

এই কাব্যপ্রীতির জন্য মধুসূদন যথেষ্ট মূল্য দিয়েছেন সারা জীবন ধরে। কাব্য-প্রীতি যদি নিবিড় হয় তা হলে সংসারের রীতিনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হওয়া কঠিন, হয়তো অসম্ভব। মধুসূদনের ক্ষেত্রেও সেটা হয়েছে। তিনি নিজেই 'সাংসারিক জ্ঞান' শীর্ষক সনেটে বলেছেন—

> কি কাজ বাজায়ে বীণা, কি কাজ জাগায়ে
> সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?
> কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
> মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে ?[১]

সাংসারিক জ্ঞান এই কথাই বলবে, কারণ সরস্বতীর রাতুল চরণের যে বন্দনা করে 'উদাসীন-দশা তার সদা জীব-পুরে'। ব্যাখ্যাকাররা এখানে উদাসীন-শব্দের অর্থ 'বিষয়বিতৃষ্ণ' বা 'নিস্পৃহ' করেন, কিন্তু এই ব্যাখ্যায় মধুসূদনের অনুভূতির তীব্রতা কিছুই থাকে না। উদাসীন-শব্দের অর্থ এখানে হওয়া উচিত 'নিরাশ্রয় জন, পথ যার

১ রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর 'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে' গানটিতে লিখেছিলেন, 'মেঘের ডাকে তোমার মনের ময়ূরে নাচাও কি', তখন মধুসূদনের এই পঙ্‌ক্তিটি হয়তো তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

গেহ'। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিধ্বনিতে উদাসীন-শব্দের প্রকৃত তাৎপর্যের কিছুটা পরিস্ফুট— 'যে জন সেবিবে ও রাঙা চরণ সেই সে দরিদ্র রবে।'

দারিদ্র্য ও দুঃখকে কবি বরণ করে নেবেন যদি কাব্যের দেবী অমৃতভাষিণী ভারতীর অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন। তাঁর অনুগ্রহ না থাকলে মধুসূদনের মতো 'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী' শুধু উপহাসের পাত্র হবেন। যে-যশের মন্দিরের তিনি স্বপ্ন দেখেছেন সে সুবর্ণ দেউল—

অতি-তুঙ্গ শৃঙ্গ-শিরে! সে শৃঙ্গের তলে,
বড় অপ্রশস্ত সিঁড়ি গড়া মায়া-বলে,
বহুবিধ রোধে রুদ্ধ উর্ধ্বগামী জনে!

ভারতীর কাছ থেকে শক্তি না পেলে ও দেউলে উঠে কার সাধ্য? তাই 'নন্দন-কানন' সনেটে দেবীর নিকট কবির প্রার্থনা—

লও দাসে, হে ভারতি, নন্দন-কাননে,
যথা ফোটে পারিজাত ;···
লও দাসে, আঁখি দিয়া দেখি তব বলে
ভাব-পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে।

এই প্রার্থনা আরও আন্তরিক ও মর্মস্পর্শী হয়েছে 'সরস্বতী' কবিতায়, যেটি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ সনেটগুলির অন্যতম—

তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে ;
তৃষাতুর জন যথা হেরি জলবতী
নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র মনে
পিপাসা-নাশের আশে ; এ দাস তেমতি,
জ্বলে যবে প্রাণ তার দুঃখের জ্বলনে,
ধরে রাঙা পা দুখানি, দেবি সরস্বতি!

এই ব্যাকুল আর্তি রবীন্দ্রনাথের রাগিণীতেও ধ্বনিত হয়েছে—

সন্ধ্যা হল গো— ওমা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো।
অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো।

'কবি' কবিতায় মধুসূদন প্রকৃত কবির স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের যে-যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন সাহিত্যের দুঃসময়। উৎকৃষ্ট কবিতা তখন দুর্লভ। 'যা পদ্য মিলে যা' গোছের কোনোমতে একটা ছন্দ খাড়া করে শব্দে শব্দে মিলিয়ে দিয়ে তখন কবিতা লেখা হচ্ছে। এইসব দেখে-শুনে, পোপ-রচিত প্রখ্যাত পঙ্‌ক্তিগুলির কথা মধুসূদনের মনে পড়া স্বাভাবিক—

Where'er you find 'the cooling western breeze',
In the next line, it 'whispers through the trees':
If crystal streams 'with pleasing murmurs creep',
The reader's threaten'd, not in vain, with 'sleep'.

পোপ-এর মতো মধুসূদনও কশাঘাত করেছেন অক্ষম কবিদের, যাঁদের কাজকে ঘটকালির সঙ্গে তুলনা করা যায়—

কে কবি—কবে কে মোরে ? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী ?

সম্ভবত মধুসূদন এটাও ইঙ্গিত করতে চান যে, এই কবিরা 'টাকার ধান্দা'য় ব্যস্ত, ঘটকেরা যেমন তাদের পারিশ্রমিকের অঙ্ক সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন। যাঁরা 'just for a handful of silver' তাঁদের শক্তির অপব্যবহার করেন তাঁরা কোনো দিনই মহৎ কবি রূপে স্বীকৃতি পাবেন না, যে-মহৎ কবির অবিনশ্বর কীর্তি যমের সাধ্য নেই স্পর্শ করে।

প্রকৃত কবি তা হলে কে ? মধুসূদন নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন—

সেই কবি মোর মতে, কল্পনাসুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামী-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ কিরণ।

কল্পনার প্রসাদ-ধন্য এই কবি হচ্ছেন তাঁর অপার কাব্যসংসারের একমাত্র 'প্রজাপতি'—

আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে ;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে ;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আসে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে।

ইতালীয় ভাষায় অভিজ্ঞ মধুসূদনের স্মরণ-পথে তাসোর কথাগুলি উদিত হওয়া স্বাভাবিক—'Non merita nome di creatore, se non Iddio ed il Poeta' ("ঈশ্বর এবং কবি ছাড়া কেউই 'স্রষ্টা' নামের যোগ্য নয়")। এই প্রজাপতি-কবির রচনাই হবে প্রকৃত কবিতা, যার সম্বন্ধে তিনি 'কবিতা' সনেটে লিখেছেন—

মনের উদ্যান-মাঝে, কুসুমের সার
কবিতা-কুসুম-রত্ন।

যার মন এই 'কবিতা-অমৃত-রসে' মজে না, সে দুর্মতি।

ইংরাজ রোম্যান্টিক কবিদের রচনায় মধুসূদন কল্পনা-শক্তির জয়গান বারংবার শুনেছেন। ব্লেক থেকে কীট্‌স্‌ পর্যন্ত সব উল্লেখযোগ্য রোম্যান্টিক কবি নিও-ক্ল্যাসিকাল লেখকদের উপাস্য বিচার-বুদ্ধিকে স্থানচ্যুত করে কল্পনাকে সেখানে বসিয়েছেন। ব্লেক তাঁর উদ্দেশ্য জ্বালাময়ী ভাষায় বর্ণনা করেছেন 'মিল্‌টন' কবিতায়—

To cast off Bacon, Locke, and Newton from Albion's
covering,
To take off his filthy garments and clothe him with
imagination.

মধুসূদনের কল্পনা-প্রশস্তির মধ্যে এই রোম্যান্টিক সুরের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। 'মেঘনাদ-বধ' কাব্যে প্রারম্ভিক বাণী-বন্দনার পরেই দেখি মধুসূদন কল্পনাকে সম্বোধন করেছেন—

তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

'মধু বাতা ঋতায়তে' বৈদিক সূক্তের মতো এখানে 'মধু'র ছড়াছড়ি। মধুসূদন এখানে নিজের নাম নিয়ে শব্দের খেলায় মেতেছেন।

পরবর্তী কালে সনেট লিখবার সময় মধুসূদন তাঁর একটি স্বতন্ত্র চতুর্দশপদী রচনা করেন কল্পনাকে বিষয়-বস্তু করে—

লও দাসে সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে,
বাগ্দেবীর প্রিয়সখি, এই ভিক্ষা করি।

(প্রাচীন পাশ্চাত্ত্য কাব্যে উষা এবং সৌন্দর্য ও প্রেমের দেবী অ্যাফ্রডাইটিকে অনেক সময় হেমাঙ্গীরূপে দেখা হয়েছে।) এর পরের পঙ্ক্তি দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—

হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে,
নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্জর-ভিতরি!

টীকাকাররা ব্যাখ্যা করেছেন, কবির প্রাণ দেহরূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ। অর্থাৎ শেক্স্পিয়র যাকে 'muddy vesture of decay' বলেছেন, সেই মরদেহের খাঁচাতে। এই ব্যাখ্যাতে কিন্তু 'দৈব-বিড়ম্বনে' বাক্যাংশের কোনো সার্থকতা থাকে না। আমার মনে হয়, প্রথম চারটি পঙ্ক্তি লেখার সময় মধুসূদনের স্মৃতিতে শেলির 'ওড্ টু দ্য ওয়েস্ট্ উইণ্ড্' কবিতার প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল, বিশেষত এই লাইনগুলির—

A heavy weight of hours has chained and bowed
One too like thee : tameless, and swift, and proud.

শেলির 'a heavy weight of hours' মধুসূদনের লেখনীতে 'দৈববিড়ম্বনে' পরিণত হয়েছে। শেলির কবিতাটি লেখা হয় এমন এক মুহূর্তে যখন তাঁর কবিত্ব-শক্তি মন্দীভূত, যে-অবস্থায় কোল্রিজ্ বিলাপ করেছেন—

But oh ! each visitation
Suspends what nature gave me at my birth,
My shaping spirit of Imagination.

'নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী'র আর একটি দিক্ আছে। গ্রীক্ ভাষায় হোমারের রচনায় এবং অন্যত্র কবির বাণী বোঝাতে 'epea pteroenta' ('পক্ষযুক্ত শব্দাবলী') বাক্যাংশটি ব্যবহার করা হয়েছে যেটি মধুসূদনের বিশেষ ভাবে পরিচিত হওয়া

স্বাভাবিক। কাব্যের প্রেরণা খাঁচার ভিতর অচিন পাখির মতো, সে যে কেমনভাবে আসে, যায় কবি তার কোনো হদিশ পান না।

এইসব থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, মধুসূদন 'কল্পনা' কবিতাটি লেখার সময় নিজের ক্ষীয়মাণ কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। গতি-হীনতার দ্বারা মধুসূদন তাঁর কবিত্বশক্তির দুর্বলতাকেই বোঝাতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'ভিক্ষা' শব্দটিও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। কবি-রূপে তিনি নিজের উপর আস্থা রাখতে পারছিলেন না, অসহায় বোধ করছিলেন। সাহায্যের জন্য তাঁর কাতর প্রার্থনা ভিক্ষা-শব্দটিতে ধ্বনিত হয়েছে। কবির যে-অন্তর্বেদনার পরিচয় আমরা এই কবিতায় পাই তা আরও অনেকগুলি সনেটে প্রকাশ পেয়েছে। সনেটগুলিতে এই বেদনার অনুরণন শোনার কারণ শুধু মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনের দুঃখ-যন্ত্রণাই নয়, তাঁর কবিজীবনের ক্ষয়-ক্ষতিও।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' লেখার সময় যথার্থই মধুসূদনের কবিপ্রতিভার অবনতি আরম্ভ হয়েছে। সেইজন্য এই সনেটগুলির অধিকাংশই উৎকৃষ্ট রচনা হয়ে উঠতে পারে নি, যদিও অল্প কয়েকটি বেশ উচ্চস্তরের। কবি-প্রশস্তিমূলক রচনাগুলিতেও বিশেষ উৎকর্ষ চোখে পড়ে না। যে-চারজন বিদেশী কবির উদ্দেশ্যে তিনি সনেট রচনা করেছেন তাঁরা হচ্ছেন পেত্রার্কা, দান্তে, টেনিসন ও ভিক্তর উগো।

পেত্রার্কার কথা এসেছে উপক্রম-শীর্ষক কবিতায়। যশস্বী ইতালীয় কবি পেত্রার্কার কাব্য পদলালিত্যে পূর্ণ, সনেট-ধরনের কবিতার তিনিই প্রথম সার্থক কবি, এবং তাঁর অনুসরণে মধুসূদন সনেট রচনায় ব্রতী হয়েছেন, এ ছাড়া পেত্রার্কা সম্বন্ধে মধুসূদন আমাদের কিছুই বলেন নি। প্রেমের কবিতা রচনায় পেত্রার্কার অসাধারণ নৈপুণ্যের কথা অনুক্ত, এমন-কি, পেত্রার্কার শ্রেষ্ঠ কবিপ্রেরণার উৎস কবিমানসী লরার উল্লেখমাত্র নেই। 'কবিগুরু দান্তে' কবিতাটি অবশ্য রসোত্তীর্ণ। সনেটটি দান্তের ষষ্ঠ শতবার্ষিকী জন্মোৎসবের সময় রচিত, সুতরাং এটি কবি বিশেষ যত্ন নিয়ে লেখেন। মধ্যযুগ ও নবজাগৃতির সন্ধিক্ষণে দান্তের আবির্ভাবের বিশেষ গুরুত্ব মধুসূদন লক্ষ করেছেন—'জন্ম তব পরম সুক্ষণে!'

> সে বিষম দ্বার দিয়া, আঁধার নরকে,
> যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে
> পাপ প্রাণ, তুমি সাধু, পশিলা পুলকে।

এখানে মধুসূদন প্রচলিত মত অনুসরণ করে দান্তের 'ইন্‌ফার্নো' পর্বের শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং দান্তের বিখ্যাত উক্তির—'Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate' ('তোমরা যারা এখানে প্রবেশ করছ, সব আশা বিসর্জন দাও')—ব্যঞ্জনা রয়েছে।

> যশের আকাশ হতে কভু কি হে খসে
> এ নক্ষত্র? কোন্ কীটে কাটে এ কোরকে?

অনুপ্রাস কোনো কৃত্রিমতা নিয়ে আসে নি, বরং মধুসূদনের বক্তব্যকে স্ফুটতর করেছে।

টেনিসন-সম্পর্কিত কবিতাটির কোনো বিশেষত্ব নেই। ('পিকেশ্বর' কথাটি শ্রুতিকটু।) ভিক্তর উগো—সম্পর্কিত কবিতাটি সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। উগোর বহুমুখী প্রতিভার এবং তাঁর রোম্যান্টিক স্বতঃস্ফূর্ততার সম্বন্ধে মধুসূদন নীরব। 'ভবিষ্যদ্বক্তা কবি সতত এ ভবে' এ ধারণা প্রাচীন, এবং ইংরাজী সাহিত্যে সিড্‌নি থেকে শেলি সকলেই এ ধরনের উক্তি করেছেন। তবে এই পঙ্‌ক্তি থেকে মনে হতে পারে, মধুসূদন সাময়িকভাবে অন্তত নিজের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে খানিকটা আস্থা ফিরে পেয়েছেন।

বাল্মীকি, কালিদাস, জয়দেব, কৃত্তিবাস, ঈশ্বর গুপ্ত—স্বদেশীয় কবিদের প্রশস্তি রচনাতেও মধুসূদন বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। বাল্মীকি-সম্পর্কিত সনেটটিতে বাল্মীকির মাহাত্ম্য সুচারু-রূপে ব্যক্ত নয়। 'পিককুলপতি' শ্রুতিমধুর না হওয়ায় কালিদাস-সম্বন্ধে সুপ্রযুক্ত হয় নি। 'জয়দেব' অত্যন্ত সাধারণ কবিতা। কৃত্তিবাস-নামের মধ্যে মধুসূদন 'কীর্তির বসতি' খুঁজে পেয়েছেন বটে কিন্তু এর জন্য তাঁকে ভাষাতত্ত্বকে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। 'কাশীরাম দাস' কবিতাটি বরং স্বতন্ত্র ধরনের। এখানে মধুসূদনের শ্রদ্ধা ওজস্বিনী ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। কাশীরাম দাস যেন দ্বিতীয় ভগীরথ, অসাধ্য সাধন করেছেন।

রোম্যান্টিক সাহিত্য-ভাবনার অন্যতম সূত্র হল, বেদনা থেকে কাব্যের উৎপত্তি, যন্ত্রণা থেকে সঙ্গীতের। রোম্যান্টিক কবিরা এ কথা নানা ভাবে বলেছেন, যেমন শেলি—

> Most wretched men
> Are cradled into poetry by wrong :
> They learn in suffering what they teach in song.

(অবশ্য এই চিন্তা প্রাচীন ভারতীয় ভাবধারাতেও দেখা যায়; আদিকবির মর্মবেদনা থেকে কাব্যের সৃষ্টি, শোক যখন শ্লোকে রূপান্তরিত হয়েছিল।) শেলির আর একটি উক্তি— 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought' তাঁর স্কাইলার্ক-পাখি সম্পর্কিত কবিতায় পাওয়া যায়। মধুসূদনও তাঁর 'শ্যামা-পক্ষী' সনেটে লিখলেন :

> সঙ্গীত-তরঙ্গ-সঙ্গে মিশি কি রে ঝরে
> অদৃশ্যে ও কারাগারে নয়নের বারি ?…
> কি ভাবে, হৃদয়ে তোর কি ভাব উথলে ?—
> কবির কুভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে।

'কল্পনা' সনেটের মতো এখানেও মধুসূদন নিজের রুদ্ধপ্রায় কবিত্বস্রোত সম্বন্ধে সচেতন। তাঁর অবস্থা 'আঁধার পিঞ্জরে' কুঞ্জবিহারী বিহঙ্গের মতো। কবিকল্পনার উন্মুক্ত আকাশে পরিক্রমণের জন্য মধুসূদন ব্যাকুল। 'মোর ডানা নাই, শুধু আছি এক ঠাঁই, সে কথা যে যাই পাসরি।' এই ভুল ভেঙে যেতে কিন্তু দেরি হয় না, কীট্‌সের বিহঙ্গ-বিলাস যেমন একটিমাত্র 'forlorn' শব্দে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আর সেই ভুল-ভাঙার বেদনা মধুসূদনের সনেটগুলিকে বিষাদবিধুর করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ধর্ম

শুধু মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করাকে বেঁচে থাকা বলা শক্ত। শুধু দিন যাপন করা ও শুধু প্রাণ ধারণ করা সত্যকারের বেঁচে থাকা নয়। তাতে প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রকাশ নেই। প্রকৃত মনুষ্যত্ব বাঁচার মতো বাঁচায়। এই বাঁচাকে একপ্রকারের শিল্প বলা যেতে পারে ; এর স্থান সব ললিতকলার পুরোভাগে। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিগুরুই নন, তিনি জীবন-শিল্পীও। জীবন-শিল্প আমাদের সকলের যত্ন নিয়ে শেখা উচিত—সেটা মানুষের ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের নানা রচনায় জীবন-শিল্পের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অনেক সুন্দর ও মূল্যবান কথা রয়েছে।

সেই সমস্ত কথার তাৎপর্য আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই উপলব্ধির অভাবে আমরা অনেক সময় জীবন-শিল্পীরূপে নিজেদের ব্যর্থতার পরিচয় দিই। ঠিকভাবে বাঁচতে হলে আমাদের অনেক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় আর আমাদের অনেকেরই দুরূহ কাজে নিজেদের কঠিন পরিচয় দেওয়ার মতো শক্তির অভাব আছে। এ শক্তি সংগ্রহ করা কিন্তু কারও পক্ষেই একেবারে অসম্ভব নয়। কারণ, এ অন্তর-শক্তি, এ ভিতর থেকে আসে, বাইরের জিনিস নয়। এর জন্য পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভর করতে হয় না। এ শক্তি পেতে হলে প্রথমে নিজেকে জানতে হয়, বুঝতে হয়, তার পর নিজের চেষ্টায় নিজেকে বলীয়ান করতে হয়। এর জন্য সাধনার প্রয়োজন। আমরা বিদেশী ভাষা শিখতে গিয়ে কিংবা পদার্থ-বিদ্যার গভীরে প্রবেশ করার জন্য বা অর্থনীতির গবেষণায় অনেক সময় অতিবাহিত করি। অথচ জীবন-শিল্পে পারঙ্গম হওয়ার জন্য কোনো প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে মনে করি না। তাই অনেক সময় আমাদের জীবনের বাগান আগাছায় ভরে ওঠে। আমাদের মনে শান্তি থাকে না, প্রাণে থাকে না আনন্দ। আমরা নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য অনেক হীন ও তুচ্ছ জিনিসের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি—অনেক অমিতাচারে ও অনাচারে মগ্ন হই। সহজ সুখের কোনো রাজপথের সন্ধানে আমরা পলে পলে ঘুরে মরি।

আমরা ভুলে যাই, সুখের চেয়ে অনেক বেশী কাম্য আনন্দ। আনন্দ সুখের চেয়ে মহত্তর। আর আনন্দ শুধু সুখের মধ্যেই থাকে না, দুঃখের মধ্যেও থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাই 'ধর্ম' গ্রন্থের অন্তর্গত 'দুঃখ' প্রবন্ধে বলেছেন, 'দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে, তাহা আনন্দেরই অঙ্গ, অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে, তাহা আনন্দ। দুঃখ আনন্দরূপমমৃতম্।' একথা প্রমাণ করার চেষ্টা বৃথা। একান্তভাবে

উপলব্ধির বিষয়। অমানিশার গভীর তমসায় যেমন 'অনন্ত-তারা-গ্রহসংকুলা' নিশীথিনী উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তেমনই দুঃখের বেদনার গভীরে নিবিড় কোনো আনন্দের শিখা দীপ্তিময়ী। যিনি অমৃত, যিনি অসীম, তাঁর যেমন অমৃতও ছায়া, মৃত্যুও ছায়া। অমৃত ও মৃত্যুর মতো আনন্দ এবং দুঃখও সেখানে একাকার হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে তাঁর আত্মজাকে লিখেছেন যে, তিনি চান তাঁর কন্যা সুখী হন, কিন্তু অবিমিশ্র সুখ এই পৃথিবীতে পাওয়ার নয়। কন্যাকে তাই তিনি আশীর্বাদ করেছেন যেন তিনি আপন অন্তরের তেজে দুঃখকে কল্যাণে পরিণত করার মতো শক্তি অর্জন করতে পারেন। কবি তাঁর গানেও বারংবার এই কথাই বলেছেন। হৃদয়ে যখন তীব্র দহনের জ্বালা তখন সে যেন ধূপের মতো সুরভি ছড়ায় আর দীপের মতো আলো দেয়। দুঃখকে এড়াবার উপায় নেই, তাই দুঃখে অভিভূত না হয়ে দুঃখের হোমানলে নিজেকে পবিত্র করে নেওয়া আমাদের কর্তব্য। যত দুর্যোগ ও বিপত্তিই আসুক না কেন, আমাদের মনে যেন কোনো মালিন্য না আসে, চিত্ত যেন থাকে অপরাজিত।

বিঘ্ন বিপদ জয় করার মধ্যেই মনুষ্যত্ব। তাই 'শঙ্খ' ('বলাকা') কবিতায় আমরা কবির উদাত্ত কণ্ঠে শুনি,

> ব্যাঘাত আসুক নব নব, আঘাত খেয়ে অটল রব,
> বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক।

তাই তাঁর প্রার্থনান্তিক ভাষণে কবি বলেছেন—'বিঘ্ন না থাকলে যে আমাদের সাধনাই অসম্পূর্ণ হয়। তখন প্রতিকূলতাকে দেখলে কর্মনাশের ভয়ে আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠি নে; কারণ কর্মফলের চেয়ে আরও যে বড় ফল আছে। প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করলে আমরা কৃতকার্য হব বলে কোমর বাঁধলে চলবে না; বস্তুত কৃতকার্য হব কি না তা জানি নে—কিন্তু প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে আমাদের অন্তরের বাধা ক্ষয় হয়। তাতে আমাদের অন্তর ভস্মমুক্ত হয়ে ক্রমশ দীপ্যমান হয়ে ওঠে এবং সেই দীপ্তিতেই যিনি বিশ্বপ্রকাশ আমার চিত্তে তাঁর প্রকাশ উন্মুক্ত হতে থাকে। আনন্দিত হও যে কর্মে বাধা আছে।'

দুঃখই মানুষ ও দেবতার মিলন-সেতু। তাই ঝড়ের রাতেই পরাণ-সখা বন্ধুর অভিসার। গভীর অন্ধকার পার হয়ে তিনি আসেন, আসেন পেরিয়ে মরুভূমি। যে রাতে দুয়ারগুলি ঝড়ে ভেঙে যায়, চারিদিক হয় তমসায় আচ্ছন্ন, দীপের আলো আসে নিভে, সে রাতে তিনি আসেন। ঝড় তাঁর জয়ধ্বজা মাত্র। মানুষের ধর্ম হচ্ছে দুঃখের মধ্য দিয়ে দুঃখের পরিত্রাণ লাভ করা। দেবতার বেদনার দান স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণ করা। প্রকৃত মুক্তি এই গ্রহণে, বর্জনে নয়। কারণ যে-মুক্তি আমাদের আরামের দিকে টেনে নিয়ে যায়, যে-মুক্তি ভোগবিলাসে সার্থকতা খোঁজে, সে মুক্তি বন্ধনের নামান্তর।

মানুষের মুক্তি হবে পাখির মুক্তির মতো। পাখি যেমন নীড়ের গণ্ডি থেকে আকাশের ব্যাপ্তিতে মুক্তি পায়, তেমনই আমাদেরও পার্থিব জীবনের গণ্ডি থেকে

অধ্যাত্ম-অন্তরীক্ষে মুক্তি পেতে হবে। পাখির জীবনে নীড় প্রথম স্তর, সেই স্তর তাকে পরে অতিক্রম করে যেতে হয়। মানুষেরও প্রথম নির্ভর মৃত্তিকা, আর মানুষকেও মৃত্তিকাকে অতিক্রম করে যেতে হবে। এই অতিক্রমণই তার পুনর্জন্ম; এইজন্যই সে পাখির মতো 'দ্বিজ'। পৃথিবীকে তার উপেক্ষা করা চলবে না, পাখির যেমন নীড়কে অবহেলা করা চলে না।

মানুষের মনের একটা কলেবর আছে, আর সে কলেবরের পুষ্টি ও বিকাশ ত্যাগে। ত্যাগের দ্বারা ভোগই চরম ও পরম ভোগ। তাই উপনিষদের বাণী 'ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, অন্যের সম্পদে লুব্ধ হবে না' রবীন্দ্রনাথের রচনায় বহুবার ধ্বনিত হয়েছে। আর খ্রীস্টের বাণীও অনেক বার অনুরণিত হয়েছে: 'যে লোক ধনী তার পক্ষে মুক্তি বড় কঠিন।' সংসারের মধ্যে যে-ত্যাগের ধর্ম রয়েছে, অমোঘ তার বিধান। রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের অন্তর্গত 'ত্যাগ' প্রবন্ধে আমরা দেখি—'এই ত্যাগের দ্বারা আমরা দারিদ্র্য ও রিক্ততা লাভ করি এমন কথা যেন আমাদের মনে না হয়। পূর্ণতররূপে লাভ করবার জন্যই আমাদের ত্যাগ।'

স্বার্থকে ত্যাগ করতে পারলে আমরা পরকে ভালোবাসতে পারব, আর পরকে ভালোবাসার অর্থ সেই পরমপুরুষকেও ভালোবাসা, যাঁকে না পেলে সব কিছুই নিরর্থক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'The Religion of Man' গ্রন্থে আমাদের বৈষ্ণব গীতিকারের সেই গানের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, যে গানে দেবতাকে প্রেমিক-রূপে কল্পনা করা হয়েছে। প্রেমিকের বাঁশীর অনেক মনোহরণ সুর আর সেই বাঁশীর সুরে সুরে প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে বিরাজমান সৌন্দর্য ও ভালোবাসার নানা ছন্দ স্পন্দিত। এ সব সুর আমাদের কাছে নিমন্ত্রণের বাণী নিয়ে আসে। তারা আমাদের অনন্তকাল ধরে বলে চলেছে—'নিজের আত্মকেন্দ্রিক জীবনের নির্জনতা থেকে প্রেম ও সত্যের আবাসভূমিতে বেরিয়ে এসো।'

আমরা কি স্বভাবতই বধির, না পার্থিব স্বার্থের দাবীতে, হাটবাজারের কোলাহলে, আমরা বধির হয়ে গেছি? প্রেমিকের মধুর কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পাই না। আমরা যুদ্ধ করি, দরিদ্রের উপর উৎপীড়ন করি, অন্যের প্রাপ্য আত্মসাৎ করে নিজেদের চাতুর্যে পুলকিত হই। যে প্রেমের ধারা নীল আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে ও পৃথিবীর বুক থেকে ছাপিয়ে উঠছে, তা থেকে দূরে সরে গিয়ে আমরা নিজেদের জীবনকে মরুভূমির মত শুষ্ক করে তুলি।

তাই শ্যামলা, বিপুলা ধরণীর দিকে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে থাকলেই চলবে না। বাদ-বিসংবাদ পরিহার করে সব জিনিসকে ও সব মানুষকে ভালোবাসতে হবে। 'মিথ্যায় ঘেরে ছোটো কণাটিরে তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।' শেষ ছুটি নেওয়ার আগে পৃথিবীর রঙে আর একটু লালিমা এনে দেওয়া, মানুষের মনে আর একটু আলো ফুটিয়ে তোলা, সেটা শুধু কবির ধর্মই নয়, সব মানুষেরই ধর্ম। তার পর জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা, মরণ, যখন দ্বারে এসে দাঁড়াবে, তখন নির্ভয়ে, সানন্দে তাকে বন্ধু ভেবে বরণ করে নিতে হবে। সেটাও মানুষের ধর্ম।

গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ ও ত্যাগের আদর্শ

গ্যেটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নানা দিকে সাদৃশ্য রয়েছে এবং এই সাদৃশ্য শুধু বাইরের নয়। তাঁদের অন্তরের দিকে যে-সান্নিধ্য রয়েছে তা থেকে তাঁদের সহজেই 'সমানধর্মা' বা 'kindred spirits' বলা চলে। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই মহান্ পূর্বসূরীর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে তাঁকে 'ইওরোপের কবিকুলগুরু' রূপে বর্ণনা করেছেন। গ্যেটের একটি উক্তি সম্পর্কে তিনি তাঁর একটি চিঠিতে (কুষ্টিয়া, ৫ অক্টোবর, ১৮৯৫) লেখেন—

'Goethe-র একটি কথা আমি মনে রেখেছি, সেটা শুনতে সাদাসিধা কিন্তু বড়োই গভীর—

Entbehren sollst du, sollst entbehren.

Thou must do without, must do without.' ('ছিন্নপত্র', পৃঃ ২৮০)

এই উক্তিটি গ্যেটের 'ফাউস্ট' নাটকের প্রথম খণ্ডের পাঠ-কক্ষে ফাউস্ট ও মেফিস্টোফিলিস-এর দৃশ্যে নায়ক ফাউস্টের মুখে বসানো হয়েছে। ফাউস্টের অবশ্য এই ত্যাগের আদর্শ—

'তোমাকে ছাড়তে হবে, ছাড়তেই হবে',

একেবারেই মনোমত নয়। তাই সে আরও বলছে—

'(ত্যাগের) এই চিরন্তন গান
সব মানুষের কানে বাজছে,
যেটা আমাদের সারা জীবন ধরে
প্রতিটি মুহূর্ত রুক্ষস্বরে গেয়ে চলেছে।'

তাই আতঙ্ক নিয়ে ফাউস্টের ঘুম ভাঙে, আর যখন মনে হয় এমন একটা দিন সামনে এসেছে যে, সারা দিনের মধ্যে একটি ইচ্ছাও, একটিও পূর্ণ হবে না, তখন ফাউস্টের চোখ ফেটে জল আসে। ফাউস্টের এই নিদারুণ বিড়ম্বনার মধ্য দিয়ে গ্যেটে প্রত্যেক সাধারণ মানুষের জীবনের দৈনন্দিন তিক্ততার অভিজ্ঞতাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ মানব-জীবনের এই বিড়ম্বনার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিনিয়ত যে-ত্যাগের সংগীত ধ্বনিত হচ্ছে সেই সম্পর্কিত যে-উক্তি গ্যেটে ফাউস্টের মুখে বসিয়েছেন—

'তোমাকে ছাড়তে হবে, ছাড়তেই হবে',

সেটা তাঁকে অতটা প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, মানুষের অশান্তির একটা প্রধান কারণ মানুষ সব সময় 'বহু বাসনায় প্রাণপণে' চেয়ে চলেছে, এবং এর অধিকাংশ চাওয়াই পাওয়াতে পরিণত হচ্ছে না। মানুষ যদি শান্তি চায়, তা হলে তার ত্যাগের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই ; তাকে ছাড়তে হবে, ছাড়তেই হবে। এইজন্যই ঈশোপনিষদের সেই বিখ্যাত শ্লোক—

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্

'তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই ভোগ করিতে হইবে, অন্যের ধনে লোভ করিবে না' ; অথবা 'ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করিবে,...'—
রবীন্দ্রনাথের এত প্রিয় এবং রবীন্দ্রনাথ বারংবার এটি উদ্ধৃত করেছেন বা এটির উল্লেখ করেছেন। গ্যেটের উক্তির সঙ্গে উপনিষদের এই বাণীর একটি অন্তর্নিহিত মিল থাকায় গ্যেটের উক্তিটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আরও বেশি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের অন্তর্গত পূর্বে উল্লিখিত চিঠিতে এই উক্তি-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> 'কেবল হৃদয়ের অতিভোগ নয়, বাইরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিসপত্রও আমাদের অসাড় করে দেয়। বাইরের সমস্ত যখন বিরল তখনই নিজেকে ভালো রকমে পাই।'

এই সত্যই রবীন্দ্রনাথের প্রখ্যাত একটি গানের মূল অনুপ্রেরণা—

> 'আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই,
> বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে,
> এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভরে।'

বাধা-বিপত্তি, ব্যর্থতা, না-পাওয়া মানুষের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ। সেই ছন্দ ত্যাগের স্পন্দনে দোলায়িত। আমাদের জীবনের ট্র্যাজেডি এই যে, আমরা সেই ছন্দে যোগ দিতে পারছি না, ত্যাগের ব্রতে দীক্ষিত হতে অক্ষম। আর অপ্রাপ্তি বা ব্যর্থতা যে অনেক সময় আমাদের চরিত্র-গঠন কিংবা পূর্ণতর সুন্দরতর জীবনের পক্ষে অপরিহার্য এই কথাটিও আমরা ভুলে যাই, যদিও এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনেকবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এই পাঠ প্রাচ্য ভাবধারার মধ্যে কিছুটা পেয়েছিলেন কিন্তু আরও বেশি পেয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে, যাঁরা সকলেই তাঁর প্রিয় লেখক এবং যাঁদের মধ্যে রয়েছেন গ্যেটে, কার্লাইল ও ব্রাউনিং। গ্যেটের Entbehrung-তত্ত্বের কথা আর একবার মনে পড়বে। এই প্রসঙ্গে গ্যেটের গদ্যরচনা থেকে একটি অংশের অনুবাদ প্রাসঙ্গিক হবে। আমার মনে হয়, এটির সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল, যদিও সে-সম্পর্কে কোনো প্রমাণ এখনও পাই নি। গ্যেটের গদ্যাংশটি এইরূপ :

'আমাদের দৈহিক জীবন, আমাদের সামাজিক জীবন, রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার, সাংসারিক জ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, এবং সব রকম আকস্মিক অবস্থাবিশেষ বা পরিবেশ আমাদের একটা কথাই শিক্ষা দেয়— ত্যাগ করো। আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে অবস্থিত অনেক কিছুর বিকাশের পথে আমরা বাধা পাই। আমাদের চরিত্রকে রক্ষার জন্য বাইরের যে-সমস্ত জিনিস আমাদের প্রয়োজন তার অনেক কিছুই আমাদের দেওয়া হয় না, অথচ অনেক কিছু যা আমাদের স্বভাবের প্রতিকূল এবং আমাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক সে সমস্ত আমাদের উপর জোর করে চাপানো হয়। যা আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে অর্জন করেছি কিংবা সুযোগের দাক্ষিণ্য যা আমাদের দিয়েছে, সেগুলি থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হয়। আর আমাদের নিজেদের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবার আগেই, একটু একটু করে আমাদের ব্যক্তিত্বের অংশ ছাড়তে হয় যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত সেটা আমাদের একেবারে ছেড়ে চলে যায়।

'আর এ ব্যাপারটা এতই সার্বজনীন যে, যখন কোনো লোককে দেখা যায় যে সে তার নিজের ভাগ্যের জন্য ক্ষুব্ধ, সমাজ তাকে অবজ্ঞা করে চলে. বস্তুত তার দুর্ভাগ্য যত বেশি হবে, তাকে বাইরে তত প্রসন্ন থাকতে হবে, তা না হলেই সে অপরাধী।

'এই প্রতিবন্ধকতা জয় করার জন্য প্রকৃতি কিন্তু মানুষকে শক্তি, কর্মক্ষমতা ও সহিষ্ণুতা পর্যাপ্তভাবে দিয়েছে। তার দেহমনের গঠন-বিন্যাস এমন যে সে নিজের জন্য নূতন পথ সৃষ্টি করে নিতে পারে— এবং কোনো কিছুই প্রকৃতির এই আশীর্বাদ থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। তখনকার মতো যা তার অন্তরঙ্গ এবং প্রিয় তা ত্যাগ করার শক্তি সে এই থেকেই সংগ্রহ করে যদি সেই মুহূর্তেই অন্য কোনো নূতন কিছু তার হাতের মুঠোয় আসে। এইভাবে নিজের অজ্ঞাতসারেই তার সমস্ত জীবন সে নূতনভাবে গড়তে আরম্ভ করে।'

কার্লাইল তাঁর *Sartor Resartus* গ্রন্থে গ্যেটের এইসব উক্তির কথা মনে রেখে লিখেছেন—"Make thy claim of wages a zero, then ; thou hast the world under thy feet. Well did the Wisest of our time write : 'It is only with Renunciation (*Entsagen*) that Life, properly speaking, can be said to begin'...Close thy Byron ; open thy Goethe." গ্যেটে ও কার্লাইলের যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন তা ব্রাউনিঙের জীবনদর্শনেও আমরা প্রতিফলিত দেখি। ব্রাউনিং তাঁর বহু কবিতায় একই ধরনের কথা বলেছেন। তাঁর *The Ring and the Book* কাব্যগ্রন্থের একটি অংশের কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—

Was the trial sore ?
Temptation sharp ? Thank God a second time !
Why comes temptation but for man to meet

And master and make crouch beneath his foot,
And so be pedestalled in triumph ?

ত্যাগের আদর্শই আমাদের শেখাবে এই দৃষ্টিভঙ্গী যাতে আমরা সংসারের বাধা-বিপত্তিতে বিচলিত না হই। রবীন্দ্রনাথও গ্যেটে, কার্লাইল এবং ব্রাউনিঙের মতো বিশ্বাস করেন দুঃখের মূল্য অপরিসীম। তাই 'ধর্ম' গ্রন্থের অন্তর্গত 'দুঃখ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

'দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য।··· মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে।'

তাই তাঁর 'শঙ্খ' কবিতায় বজ্র-নির্ঘোষে ধ্বনিত হয়েছে—

ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অচল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক।

তাই ত্যাগের মহিমা কীর্তিত হয়েছে 'শান্তিনিকেতন'-গ্রন্থের 'তপোবন' প্রবন্ধে—

'ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করার জন্য নয়, নিজেকে পূর্ণ করার জন্যেই; ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য।··· ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।··· ত্যাগকে দুঃখরূপে অঙ্গীকার করে নেওয়া নয়, ত্যাগকে ভোগরূপেই বরণ করে নেওয়া উপনিষদের অনুশাসন।'

রবীন্দ্র-দর্শনের একটা বড় দিক সমন্বয়ের দিক। তাঁর ত্যাগের আদর্শের মধ্যে উপনিষদের অনুশাসনের সঙ্গে মিলেছে প্রতীচ্যের কবিকুলচূড়ামণি গ্যেটের মনীষা ও প্রজ্ঞা। তাই এই আদর্শ তাঁর বিভিন্ন রচনায় এত উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে। আর এই আদর্শ সাধারণ মানুষের পক্ষে পথ-নির্দেশ। জীবনের ঘূর্ণীবাত্যায় বিতাড়িত মানুষ এই আদর্শের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাবে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের খুব কাছের লোক, আমাদের কথা তিনি সব সময় ভেবেছেন, এবং সেই কারণেই আমাদের পরিত্রাণের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা।

ত্যাগের আদর্শ প্রচারের অর্থ এই নয় যে, আমরা সংসারের সুখ থেকে নিজেদের ইচ্ছাপূর্বক বঞ্চিত করব। সুখকে আমরা শুধু দৈহিক পর্যায়ে উপভোগ করব না ; দৈহিক তৃপ্তির সঙ্গে আধ্যাত্মিক অনুভূতি মিশিয়ে সুখকে আমরা আনন্দে উন্নীত করব। আনন্দের মধ্যে সুখ ও দুঃখের সহাবস্থান সম্ভব। যেটা আমরা পেলাম সেই সুখকে যদি আমরা আনন্দে রূপান্তরিত করি, যেটা আমরা পেলাম না সেই দুঃখকেও যদি আমরা আনন্দে পরিণত করি, তবেই আমাদের সার্থক জীবন। এতেই আমাদের শান্তি, যে-শান্তির সম্বন্ধে দান্তে বলেছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছা মিশিয়ে দিতে হয়। সব কিছুতেই আমাদের সন্তোষের অনুভূতি যেন

থাকে, সব অবস্থার সঙ্গে যেন আমরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারি, যে-কোনো কিছুর জন্য যেন আমরা প্রস্তুত থাকি—'Ripeness is all' এই আমাদের মন্ত্র। ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনদেশীয় সাধক সেণ্ট জন্ এই কথাই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন—

'তোমাদের মনে সব সময় শান্তি রেখো ; পৃথিবীর কোনো কিছুই যেন তাকে বিক্ষুব্ধ করতে না পারে ; সব কিছুরই এক দিন অবসান হবে। সব অবস্থাতেই— সে অবস্থা যত কঠিনই হোক না কেন— আমরা আনন্দ করব, বিষাদে ম্রিয়মাণ হব না, যাতে যেটা পরম প্রেয় সেই আত্মার শান্তি ও সমতা আমরা না হারাই।'

জীবনশিল্পী বলেন্দ্রনাথ

অস্‌কার ওয়াইল্‌ড্‌ লিখেছেন, 'He who can look on the loveliness of the world and share its sorrow, and realize something of the wonder of both, is in immediate contact with divine things, and has got as near to God's secret as any one can get।' বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কেও এ উক্তি পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। সংসারের যা-কিছু রমণীয় তা দেখার জন্য তাঁর ছিল সজাগ চোখ, বিশ্বের নানা বেদনার সুর শোনার জন্য ছিল উন্মুখ কান। সৌন্দর্যের ও বেদনার বিচিত্র আনন্দ তিনি উপভোগ করেছেন। তাই মর্ত্যবাসী হয়েও তাঁর দিব্য চেতনা সম্ভব হয়েছে ; তাই বিধাতার সৃষ্টিরহস্যের সামান্য একটু অংশও তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত।

শুধু বেদনার সুস্পষ্ট সুরই বলেন্দ্রনাথ শোনেন নি, সংসারের সর্বত্র এই সুরের অনুরণনও তিনি উপলব্ধি করেছেন। সমানধর্মা চণ্ডীদাস সম্বন্ধে তিনি যে-উক্তি করেছেন তা তাঁর নিজের লেখা সম্পর্কেও বলা চলে— তিনি যে 'তাঁহার লেখায় অনবরত দুঃখের কথা পাড়িয়াছেন, তাহা নহে ; কিন্তু তাঁহার রচনায়, হয়তো অজ্ঞাতসারে, কেমন একটা দুঃখের ভাব প্রবেশ করিয়াছে।' বলেন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে একটি অব্যক্ত বেদনার ধ্বনি রয়েছে। সে ধ্বনি তাঁর সমালোচনায়ও পরিব্যাপ্ত। এই কারণে 'উত্তরচরিত' তাঁর শ্রেষ্ঠ সমালোচনাত্মক রচনা। বিষাদই ভবভূতির দৃশ্যকাব্যের মূল সুর এবং সে সুরটুকু বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে— 'কিন্তু ভবভূতির কাব্যে সুখও যেন অত্যন্ত প্রগাঢ় হইয়া অনেকটা দুঃখেরই মতো হইয়া আসে। হয়, তাহার সহিত কতকগুলি দুঃখকাহিনী বিজড়িত, নয়, তাহার মধ্যে একটি অনির্দেশ্য বিবশ ব্যাকুলতা— সুখ কি দুঃখ নির্ণয় করিয়া উঠা কঠিন ; যদি বা মিলন হয়, মিলনের মাঝখানে যেন শতবর্ষের বিরহ জাগিয়া থাকে এবং মিলনান্ত উপসংহারেও পুরাতন বিরহ পরিতৃপ্ত হয় না। কালিদাসের কাব্যে যেমন দুঃখও বিলাস-অলসিত মোহন মধুর বেশে কতকগুলি সুন্দর চিত্রবদ্ধ হইয়া মোহ উদ্রেক করিয়া দেয়, ভবভূতির কাব্যে সুখ সেইরূপ মর্মস্থলে বেদনাবিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত করুণ নিবিড় হইয়া উঠে।' ভাষার লাবণ্য বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য ; শব্দ-চয়নে তিনি অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেন। কিন্তু 'উত্তরচরিত' রচনাটির মহিমা ও লালিত্যের তুলনা বলেন্দ্রনাথেও বিরল। দৃষ্টান্ত নির্বাচন করা দুরূহ ; সমগ্র প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করার ইচ্ছা হয়। কালিদাস ও ভবভূতির বিস্তৃত তুলনামূলক আলোচনা দ্বিজেন্দ্রলাল

ব্রায় করেছেন, এবং নিপুণভাবে করেছেন। তবুও স্বল্পপরিসরে, দু-চার ছত্রের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ যা বলেন তার উৎকর্ষ দ্বিজেন্দ্র-রচনার চেয়ে কম নয়—

'কালিদাস যেখানে ফুলটি, মালাটি, মদরাগ ও চুম্বনবিলাস এবং তদানুষঙ্গিক সুন্দর জ্যোৎস্না, মধুর মলয় ও উদ্ভিন্ন-যৌবনা প্রকৃতি দিয়া খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য উদ্রেকে প্রিয়জনকে স্মরণ করাইয়া দেন, ভবভূতি সেখানে অন্তরের অন্তরে ডুবিয়া মানবহৃদয়ের গভীর বেদনা অনুভব করেন এবং সেই বেদনার মধ্য হইতে প্রিয়জনকে যেন মন্থন করিয়া তুলেন; সেইজন্য প্রিয়জন তাঁহার নিকট এমন কি-জানি-কি এবং প্রিয়স্পর্শে তিনি একেবারে আকুল হইয়া উঠেন—নিশ্চয় করিতে পারেন না— সুখ না দুঃখ, প্রবোধ না নিদ্রা, শরীরে বিষসঞ্চার হইয়াছে অথবা মদিরা পান করিয়াছেন, চৈতন্য লুপ্ত কি উন্মীলিত।'

'উত্তরচরিত'-এর তুলনায় 'মেঘদূত' প্রবন্ধটি আমাদের কিছুটা নিরাশ করে। বলেন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, মেঘদূত গীতিকাব্য এবং কালিদাস এই কাব্যে বর্ষাকালে বিরহের প্রভাব দেখিয়েছেন; কালিদাসের মতো বিরহের কবি আর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। 'কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ' বাক্যাংশের সার্থকতা বলেন্দ্রনাথ আমাদের বুঝিয়েছেন: 'অন্তর্বাষ্পঃ' শব্দটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু 'মেঘদূত'-কাব্যের গভীরে তিনি প্রবেশ করতে পারেন নি, রবীন্দ্রনাথের মতো পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘের সার্থক বিশ্লেষণ করতে পারেন নি। অথচ নিখিল বিশ্বে অহরহ যে-বিরহ স্পন্দিত তা তিনি শুধু শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারাই নয়, অন্তর দিয়েও অনুভব করেছেন। বসন্তকালে বিরহিণীদের উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস তাঁর হৃদয় স্পর্শ করে; সহানুভূতি প্রকাশ করে তাঁদের সঙ্গে তিনি অশ্রু মোচন করতে থাকেন। তাঁর ধারণা, বর্ষার বিরহ নীরবে হৃদয় দহন করে— বসন্তের বিরহের মতো তা সহজে ধরা দেয় না; এইজন্য সামান্য কবিরা বর্ষার বিরহ অনুভব করতে পারেন না; বিরহিণীর হৃদয়ে অবগাহন ব্যতীত তা অনুভব করা যায় না। এই দিক থেকে বলেন্দ্রনাথ নিজে অসামান্য কবি। পাপিয়ার হৃদয়োচ্ছ্বাসে তিনি বিরহিণীর মর্মব্যথা বুঝতে পেরেছেন; ভেককণ্ঠোচ্ছ্বাসে যে-বিভীষিকার ছায়া তা তাঁর হৃদয়েও সঞ্চারিত।

বৈষ্ণব কবিদের কবিতায় এই বিরহ বহুবার ধ্বনিত হয়েছে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের যে-তুলনাত্মক আলোচনা বলেন্দ্রনাথ করেছেন তাতে তাঁর সিদ্ধান্ত— প্রেমের কবিরূপে চণ্ডীদাসের স্থান বিদ্যাপতির চেয়েও উঁচুতে। প্রেমের সুর চণ্ডীদাসে আরও স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে; তাঁর কবিতায় সর্বত্রই প্রেমের বিশেষ বিকাশ দেখা যায়। এর অন্যতম কারণ, সুখই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য নয়—

> পিরীতি না কহে কথা।
> পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পিরীতি মিলয়ে তথা।

চণ্ডীদাস জানেন, জ্বলনেই প্রেম; সুখের মাঝে প্রেম শুকিয়ে যায়। তাই বলেন্দ্রনাথের উক্তি—'চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতির তুলনায় আমরা দুঃখের কবি বলিতে পারি।' চণ্ডীদাসের কবিতা তাঁর কাছে প্রিয়তর হলেও বিরহের কবিরূপে

বিদ্যাপতির বিশেষত্বকে কিন্তু বলেন্দ্রনাথ বিশেষ মর্যাদা দিতে পেরেছেন—'বিদ্যাপতির বিরহ-গানগুলিতে কেমন একটি ভাব আছে। তাঁহার "এ ভরা বাদর" শুনিলে বর্ষাকালের বিরহের ভাব কেমন যেন হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তাঁহার "সময় বসন্ত, কান্ত রহু দূরদেশ" শুনিলে বসন্তের বিরহও তেমনি ফুটিয়া উঠে।...বিদ্যাপতির কবিতাকে চণ্ডীদাসের তুলনায় যৌবনাচ্ছন্ন বলা যাইতে পারে। আর বিদ্যাপতিতে কেমন একটা অতৃপ্তির ভাব দেখা যায়। তাঁহার অতৃপ্তির একটি গান একেবারে বিখ্যাত। সে গান আমাদের—

> জনম অবধি হম রূপ নেহারনু, নয়ন ন তিরপিত ভেল।
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয় জুড়ন না গেল ॥

পাশ্চাত্ত্য প্রেমের কবিতায় বিরহের অনুভূতির বা অতৃপ্তির এই ব্যাপকতা নেই—এমন-কি কোনো ইংরেজি প্রতিশব্দ পাওয়া কঠিন।'

ইংরেজিতে কথা আছে, This world is a comedy to those that think, a tragedy to those that feel। বলেন্দ্রনাথ মনীষী এবং চিন্তাশীল কিন্তু অনুভূতির দিকে তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। জীবনের ট্র্যাজিক দিকটিই তাঁর কাছে বেশি পরিস্ফুট। তবে বলেন্দ্রনাথ সেন্টিমেন্ট্যাল নন—কারণ তিনি সক্ষম এবং প্রবল, তিনি ভাবের রাজা— ভাব এবং ভাষা উভয়ই তাঁর আয়ত্ত। তিনি নিজেই বলেছেন, সেন্টিমেন্ট্যালের মধ্যে একটু ভান আছে, কৃত্রিমতা আছে, অন্তত ছট্ফটানির কিছু আধিক্য। এইসব জিনিস বলেন্দ্রনাথের রচনায় নেই, কিন্তু সেন্টিমেন্টের আধিক্য আছে। সেন্টিমেন্ট্যাল না হয়েও তিনি সেন্টিমেন্টের ব্যবহার করতে পারেন। তাঁর 'জীবন-ট্র্যাজেডি' রচনাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মত— শুধু উপসংহার দেখে ট্র্যাজেডি কি না ঠিক করা যায় না— সুচিন্তিত। বাস্তবিক কোনো কোনো সময় দেখা যায়, বিয়োগান্ত হলেও ট্র্যাজেডি হচ্ছে না এবং মিলনান্ত হলেও ট্র্যাজেডি হচ্ছে। ট্র্যাজেডির ধারা অন্তঃসলিলা নদীর মতো। বাইরের গঠন থেকে বিচার করা যাবে না, অন্তরে প্রবেশের প্রয়োজন। জীবনের ট্র্যাজেডি কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সুখের গভীরতায় আমরা যে দুঃখপ্রবাহ অনুভব করি, সেইখানেই জীবনের ট্র্যাজেডি। বাইরে সারাদিন হাসিলেও আমাদের অন্তরে একটা অশ্রুসিক্ত ভাব বহিয়া যায়, আমাদের মিলনের মধ্যে একটা বিরহ-বিদ্ধ ভাব থাকে, যাহাতে জীবন নিতান্ত লঘু হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের শত সহস্র অস্ফুট ভাবেই ট্র্যাজেডি বজায় থাকে—সুখের মধ্যে দুঃখ, শান্তির মধ্যে অতৃপ্তি ইত্যাদি। কাঁদিয়া ফেলিলেই অনেক স্থলে কমেডি হইয়া দাঁড়ায়, দীর্ঘনিশ্বাস আসিয়া ট্র্যাজেডি রচনা করে। আমরা অতীতে দাঁড়াইয়া বর্তমান অনুভব করিয়া, সেই বর্তমানে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া দেখি, ট্র্যাজেডি ক্রমাগতই যেন ঘনাইয়া আসে।'

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা জীবন-ট্র্যাজেডি বোঝেন নি বলে বলেন্দ্রনাথ যে-অভিযোগ করেছেন তার ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়। বিয়োগ বা বেদনার দ্বারা নাটকের অবসান

না ঘটানোর পক্ষে একটা বড় যুক্তি আছে, যেটা বলেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। মৃত্যুকে তিনি জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি মনে করেছেন এবং তাঁর ভুলটা এখানেই। মৃত্যু শুধু একটা ব্যক্তিগত জীবনের চরম পরিণতি হতে পারে— সাধারণ জীবনের নয়। বিশেষ একজনের বা কয়েকজনের মৃত্যুতে জাগতিক জীবনের গতি স্তব্ধ হয় না, হওয়া উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে তাঁর কন্যাকে সান্ত্বনা দান করতে গিয়ে লিখেছেন, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র দুঃখ বেদনা যাতে সংসার-চক্রের নিত্য আবর্তনে বাধা সৃষ্টি না করে তা আমাদের দেখা উচিত। ম্যাথু আর্নল্ডের ভাষায়—'The mundane movement of the world must go on।' শেক্‌স্‌পিয়রও এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বিয়োগান্ত নাটক লিখলেও নায়কের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নাটকের সমাপ্তি টানেন নি। শেক্‌স্‌পিয়রের রঙ্গমঞ্চে ড্রপ্‌-কার্টেন্ বা দৃশ্যযবনিকার প্রচলন ছিল না, সেটাই এর একমাত্র কারণ নয়। নায়কের মৃত্যুর পরেও সাধারণ জীবনযাত্রা অব্যাহত, এটা দেখানোও শেক্‌স্‌পিয়রের উদ্দেশ্য। অভিন্নহৃদয় হোরেশিওর আলিঙ্গনে 'The rest is silence' বলার পর হ্যাম্‌লেট্ যখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছে, তখন ফর্টিন্‌ব্রাস্ রাজ্যভার গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে এসেছে। একজন রাজার মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু রাজতন্ত্র দীর্ঘজীবী।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, বলেন্দ্রনাথের নিম্নের উক্তিতে যে-অভিমত প্রকাশ পেয়েছে তার আলোকে ট্র্যাজেডিতে হাস্যরসের শেক্‌স্‌পিয়রীয় প্রয়োগের স্বপক্ষে ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে— 'প্রহসনের মধ্যে অনেক সময় ট্র্যাজেডি ঘুমাইয়া থাকে। প্রহসন কাষ্ঠহাসি হাসিয়া ট্র্যাজেডির অভিনয় দেখাইয়া দেয় মাত্র। ...জীবন-ট্র্যাজেডিকে ব্যক্ত করিবার জন্য প্রহসন-ঘটনা দুই-চারিটা থাকে। কিন্তু সে প্রহসনের পরিণাম ট্র্যাজেডি। বৈচিত্র্যের জন্য তাহাতে সৌন্দর্য সুব্যক্ত হয়।'

Angst বা বেদনা ট্র্যাজেডির শেষ কথা নয়; ট্র্যাজেডির শেষে এক গভীর প্রশান্তির মধ্যে আমরা বিলীন হই। এর যে-সব কারণ সম্ভব তার মধ্যে রয়েছে অ্যারিস্‌টট্‌ল্-উক্ত 'ক্যাথার্সিস্'—অনুকম্পা ও ত্রাসের অনুভূতিগুলির বিশুদ্ধীকরণ। কারণ সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ আছে, কিন্তু প্রশান্তির অনুভূতি সর্বজনীন। কেবল একটি হৃদয়-উন্মথিত দীর্ঘশ্বাসে যদি ট্র্যাজেডির সমাপ্তি ঘটত, তা হলে দর্শকের মনে অন্য ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারত। অশ্রু বিসর্জনের মধ্য দিয়ে যে অবসান আসে সে অবসানে উচ্ছ্বাসের চেয়ে ভাবগভীরতা বেশি। অশ্রুজল ও দীর্ঘশ্বাসের যে তুলনা বলেন্দ্রনাথ করেছেন সেটা পড়ার পর এ সব কথা মনে আসা অস্বাভাবিক নয় —'দীর্ঘনিশ্বাসে আপনাতে আর আপনি থাকে না, কিন্তু আপনাকে পাঁচজনের মধ্যে হারাইয়া ফেলি না। দীর্ঘনিশ্বাসে আত্মহত্যা; অশ্রুজলে আত্মবিসর্জন। দীর্ঘনিশ্বাসে হৃদয় ছারখার হইয়া গিয়াছে, প্রতীকারাশা বিরল; অশ্রুজলে হৃদয়ের মোহ ধুইয়া গিয়াছে, কিন্তু হৃদয় যায় নাই। অশ্রুজলে জগৎ ডুবিতে পারে; দীর্ঘনিশ্বাসের কাছে জগৎ ঘেঁষিতে পারে না-- তাপ বড় প্রবল।'

প্রকৃতির অন্তরে বলেন্দ্রনাথ অনায়াসে প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতির বর্ষণ-মুখরিত অন্ধকারই তাঁকে বেশি আকর্ষণ করে। অশ্রুজলের মধ্যে তিনি যেমন মানব-হৃদয়ের নীরব ভাষা দেখেছেন, শ্রাবণের হৃদয়কে অবিরল ঝরতে দেখেছেন। বর্ষায় বাইরের মতো আমাদের অন্তরেও হঠাৎ আঁধার আসে আর সেইজন্যই শ্রাবণের বারিধারা আমরা উপভোগ করতে পারি। এই উপভোগের মধ্যে আশঙ্কা আছে। সেই সশঙ্ক ব্যাকুলতার কথাই বলেন্দ্রনাথ বলেছেন— 'শ্রাবণবর্ষণে মনের উপর কেমন একটা স্থির প্রভাব পড়ে, কিন্তু তথাপি মনের আকুলতা ঘুচে না। সদাই ভয় হয়, কোথায় যেন চিরবিরহ রচিত হইতেছে, কোথায় কে যেন একেবারে হারাইয়া যাইতেছে। একটা কোন্ অনির্দেশ্য বিভীষিকার পশ্চাতে মন যেন সারাক্ষণ ঘুরিয়া বেড়ায়। জানালা খুলিয়া একেলা আকাশের পানে তাকাইয়া থাক, বসিয়া বসিয়া সেই ঝম্‌ঝম্ ধারা পতন শব্দ শ্রবণ কর, মন যেন আপনার মধ্যে উদাস হইয়া বসিয়া আছে। বসন্তে মন যেমন আপনা হারাইয়া উদাস, এ তেমন নহে। এ আর এক ভাব।'

এই আর এক ভাবের সুরের মূর্ছনা বলেন্দ্রনাথের রচনায় বারংবার এসেছে। দীঘির কালো জলে, স্রোতোবহা কল্লোলিনীর নির্ঝরে এই সুরই কবি শুনতে পেয়েছেন—

> শুকতারা সুগভীর ফেলিয়া নিশ্বাস ডুবে যায় আকাশের কোলে।
> তটিনীর শ্রান্ত কায় শিহরি উঠিছে ছায়া দেখে আপনার জলে।

উড়িষ্যার সূর্যমন্দির দেখতে কোনারকে এসেও বলেন্দ্রনাথের একই অনুভূতি হয়েছে— 'কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মতো, মায়ার মতো ; যেন কোন্ প্রাচীন উপসংহার শৈবালশয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে— এবং অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি-রেখায় ক্ষীণপাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মতো বোধ হয়।' রবি বর্মার পাতাল-প্রবেশ চিত্রটি তাঁকে মুগ্ধ করেছে, কারণ এই ছবিতে একই সুর গুঞ্জরিত—লক্ষ্মণের অশ্রুম্লান অধোবদন, রামের উদ্বেল ব্যাকুলতা, রামের প্রতি সীতার সকরুণ বদ্ধদৃষ্টি। এই সুর তাঁকে অভিভূত করেছে, বিবশ করেছে, কিন্তু প্রমত্ত করে নি। 'কি-জানি-কি-হয়' মুখখানির জন্য 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-এর লেখক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের আকুল হাহাকার বলেন্দ্রনাথের 'সে' লেখাটির মধ্যে নেই। এখানে শুধু অন্তরের আর্তি রয়েছে— 'সে আজ নাই— কিন্তু তাহার স্মৃতি যেন ঘনাইয়া আসিতেছে। পূর্বে সে গৃহে আবদ্ধ ছিল, এখন সে জগতে বিস্তৃত। আকাশে সে, চন্দ্রালোকে সে, কুঙ্কুম-সৌরভে সে ফুটিয়া উঠিতেছে। আগে সে এমন ছিল না—এখন যেন সর্বত্রই সেই।' এই পঙ্‌ক্তিগুলি পড়ার পর বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোকটির কথা মনে পড়বে—

> সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
> সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

'মিলন আর বিরহ এই দুইয়ের মধ্যে মিলনের চেয়ে বিরহই ভালো। মিলনে শুধু প্রিয়াকেই পাওয়া যায়, বিরহে ত্রিভুবনই প্রিয়াময়।'

ত্রিভুবনের সব কিছু সৌন্দর্যের জন্য বলেন্দ্রনাথ আকর্ষণ অনুভব করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর একজন ইংরেজ গদ্য-লেখকের মতো বলেন্দ্রনাথও বলতে পারতেন, I am amorous of all beautiful things। এই সৌন্দর্য বলেন্দ্রনাথ মানুষের মাঝে দেখেছেন, দেখেছেন তার প্রকৃতির মহিমায়, তার আকৃতির মাধুর্যে। প্রেয়সী নারীর নয়নে-অধরে যে যাদুর আবেশ তা তিনি অনুভব করেছেন; ক্ষীণমধ্যার বরতনু, পিনদ্ধ কঞ্চুলিকানিবদ্ধ সঘনস্পন্দিত কনকযৌবনমোহ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। সৌন্দর্য বলেন্দ্রনাথ ঐশী লীলায় প্রত্যক্ষ করেছেন, যে-লীলা ঋতুচক্রের আবর্তনে ও মানুষের সমাজ-জীবনে সমভাবে বিকশিত হয়েছে। এই সৌন্দর্য বলেন্দ্রনাথ জনয়ত্রী জন্মভূমির স্নেহমধুর অধরে, দেশের পূজা-পার্বণে, স্বাদেশিক আচারে, শুভ উৎসবে খুঁজে পেয়েছেন; খুঁজে পেয়েছেন কালিদাসের কবিতায়, বৈষ্ণব পদাবলীতে, জর্জ এলিঅটের উপন্যাসে, রবিবর্মার ছবিতে, প্রাচীন মন্দিরের ভাস্কর্যে। তাঁর বিচিত্র সৌন্দর্যানুভূতিকে তিনি চিত্রকরের মতো তাঁর লেখনী-তুলিকার সাহায্যে ধরে রাখতে চেয়েছেন। এই জীবনে যা-কিছু সুন্দর— আর সুন্দর বলেই ক্ষণস্থায়ী—তাঁর চিত্ত এক দিকে আনন্দোদ্বেল করে তুলেছে, অন্য দিকে করেছে বেদনার্দ্র। জীবনের উত্তাপ তিনি সর্বদেহে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর মনের কোণে বৈরাগ্যের হিমকণা অদ্রব থেকে গেছে। তিনি জীবনের গভীর গহনে প্রবেশ করেও একটা দূরত্ব বজায় রাখতে পেরেছেন। বলেন্দ্রনাথ প্রকৃত শিল্পী— জীবনই তাঁর শিল্প।

সাহিত্যশিল্পী বলেন্দ্রনাথ

জীবনে স্বল্পায়ু হয়েও যাঁরা তাঁদের সাহিত্যকর্মের মধ্যে চিরায়ু হয়ে বেঁচে আছেন বিশ্বের সেই ক্ষণজন্মা সাহিত্যিকদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম। এঁদের মধ্যে যাঁর নাম সবার উপরে তিনি জন্ কীট্স্। কীট্সের অকাল-মৃত্যু উপলক্ষে শেলি যে শোকগাথা রচনা করেছিলেন (*Adonais*) তার একটি স্তবক তিনি এই পঙ্‌ক্তিটি দিয়ে আরম্ভ করেন—'The inheritors of unfulfilled renown।' কীট্সের মতো অন্যান্য যে-সব কবি তাঁদের প্রতিভা পূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার আগেই ধরার পালা সাঙ্গ করে নবজীবনের কূলে যাত্রা করেছেন তাঁরাই এখানে শেলির স্মরণপথে এসেছেন, বিশেষত চ্যাটার্টন, সিড্‌নি ও ল্যাটিন কবি লিউকান্। বলেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গেও শেলির পঙ্‌ক্তিটি মনে আসা স্বাভাবিক। বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্তি অবিনশ্বর, কিন্তু এই কীর্তির মধ্যে গভীর অপূর্ণতা রয়ে গেছে। দীর্ঘজীবী হলে কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে তাঁর আসন অনেক উঁচুতে হতে পারত।

বলেন্দ্রনাথের যখন ছাব্বিশ বছর বয়স, তখন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মাধবিকা' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের অন্তিম কবিতাটির নাম 'অবসান'।[১] এই কবিতাটিতে কবি যখন তাঁর সংগীতকে 'রে স্বল্পায়ু' বলে সম্বোধন করেন, তখন কি নিজের অকাল-মৃত্যু সম্পর্কে কোনো পূর্বাভাস তাঁকে শঙ্কিত করে তুলেছিল ?—

'হে মোর সঙ্গীত তোর পতঙ্গের প্রাণ
এক বসন্তেই শুধু হল অবসান।
এক বেলা নৃত্য শুধু এক বেলা গান,
ছড়ায়ে রঙান্ পাখা কুসুমে শয়ান।
একটুকু স্বর্ণরেণু, পুষ্পপরিমল,
একটুকু রবিকর, শিশিরের জল,
কিছুক্ষণ খেলাধূলা মুগ্ধ অভিনয়,
তার পরে দিনশেষ— আর বেশি নয়।
রে স্বল্পায়ু, তাহে তোর কোনো খেদ নাই,
যে পারে অমর হতে হোক্ না সে, ভাই,
বৃদ্ধ যশ, উচ্চাসনে বসি' তার পাশে
চিরকাল বেঁচে থাকা, মহা লাঞ্ছনা সে।
তার চেয়ে ঢের ভাল, ছড়াইয়া পাখা
খেলাশেষে কুসুমের বক্ষে মরে' থাকা।'

১ বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, তৃতীয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ ১৩৭২, পৃ. ৭৩

এই কবিতাটির শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি রবীন্দ্রনাথের 'স্ফুলিঙ্গ'র কথা মনে করিয়ে দেয়। বলেন্দ্রনাথও তাঁর পিতৃব্যের মতো সুদূর আকাশে আঁকা ইন্দ্রধনুকে ছেড়ে মাটির ধরণীর প্রজাপতিটির পাখাকেই ভালোবেসেছেন।

উজ্জ্বল সম্ভাবনার কোরক স্ফুটনোন্মুখ রয়ে গেল, প্রস্ফুট হওয়ার সুযোগ পেল না— বলেন্দ্রনাথের রচনার অনেক পাঠকের মনেই এই চিন্তার উদয় হয় এবং এই চিন্তার মধ্যে বেদনার আভাস আছে। বলেন্দ্রনাথের লেখা পাঠ করার যে-অভিজ্ঞতা তার মধ্যেও এ বেদনা পাঠকের অজ্ঞাতসারেই সঞ্চারিত হয়। বলেন্দ্রনাথের রচনাতে করুণ সুরের মূর্ছনা বারংবার প্রকম্পিত। আগন্তুক বেদনা ও অন্তর্নিহিত বেদনার মিশ্রণের ফলে কখনও পাঠকের অনুভূতি বিষাদাচ্ছন্ন হওয়া বিচিত্র নয়।[২]

বলেন্দ্রনাথের রচনা যদি নঞর্থক হত তা হলে এই বিষাদ হয়তো বিশ্বনিন্দার প্রথম সোপান হতে পারত। কিন্তু প্রত্যয়নিষ্ঠ বলেন্দ্রনাথের পক্ষে বিশ্বনিন্দকের ভূমিকা নেওয়ার চেয়ে অকল্পনীয় আর কিছু হতে পারে না। বিষণ্ণতা রোম্যান্টিক সাহিত্যশিল্পীর লেখনীতে নানা রূপ পরিগ্রহ করে। বলেন্দ্রনাথের বিষণ্ণতা রোম্যান্টিক বিষণ্ণতা হলেও তিনি কখনও রোম্যান্টিক ফরাসী সাহিত্যিক শাতোব্রীয়াঁর মতো জীবনক্লান্তিতে জর্জরিত হন নি। বলেন্দ্রনাথ কোনো দিন লিখতে পারতেন না— 'কিছু উপভোগ করারও আগেই হতাশা এসে পড়ে ; কামনাগুলি থেকে যায়, কিন্তু মোহ আর কিছু থাকে না। কল্পনাশক্তিতে সমৃদ্ধি, প্রাচুর্য ও চমক রয়েছে ; জীবনে রয়েছে দীনতা, শুষ্কতা আর মোহিনীমায়ার বিলুপ্তি। এ হচ্ছে পূর্ণ হৃদয় নিয়ে শূন্য সংসারে বেঁচে থাকা, আর কোনো কিছু আস্বাদন করারও আগেই সব কিছু বিস্বাদ হয়ে যাওয়া।'[৩] অভাব-বোধ বলেন্দ্রনাথেও এসেছে— নিঃসঙ্গতা তাঁর প্রাণেও তীব্র হয়ে বেজেছে। তিনি কিন্তু যখন এ বোধকে বাণীরূপ দিচ্ছেন তখন তার মধ্যে তিক্ততার চেয়ে নির্বেদের ভাব অনেক বেশি—

'মানব-জীবনের মধ্যে মধ্যে এইরূপ ক্ষণিক শূন্যতায় তাহার অতৃপ্তির ভাবের বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের জীবনে তৃপ্তি কোথায়? তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া অতীতের সান্ত্বনা, পদতলে ভবিষ্যতের কি-জানি-কি। পশ্চাতে কেবল দূর— অতিদূর মাত্র ; সম্মুখেও তাই— ধূ ধূ কেবলই একটা সীমাহীন মহাদূর। চতুর্দিকের এই অসীম বিস্তৃতির মধ্যে আপনার ক্ষণভঙ্গুরত্ব লইয়া কে পরিতৃপ্ত হইবে? আমরা সমস্ত জগতের সহিত জীবনের প্রবাহ অনুভব করিয়া আকুল হইয়া উঠি, স্তম্ভিত হইয়া থাকি ; কখনও আশায়, কখনও নৈরাশ্যে অতৃপ্তি।'[৪]

বলেন্দ্রনাথ সংবেদনশীল লেখক—বেদনার সূক্ষ্ম কম্পনেও তাঁর হৃদয়তন্ত্রী স্পন্দিত হয়। কিন্তু জীবনের বিচিত্র বেদনা তাঁকে বিশ্ব থেকে কোনো দিন বিমুখ করে নি।

২ কীট্‌সের কবিতা-পাঠেও এই অনুভূতি স্বাভাবিকভাবেই আসে।
৩ ফ্রঁাসোআ র‍্যনে ভীকঁৎ দ্য' শাতোব্রীয়াঁ। 'খ্রীস্টধর্মের স্বরূপ' (১৮০২)
৪ 'ক্ষণিক শূন্যতা' ব. গ্র. পৃ. ২৮৩

অনেক সময় হঠাৎ খুশির মতো হঠাৎ বিষণ্ণতা তাঁর চিত্তে ঘনিয়ে এসেছে —শুধু অকারণ বিষাদে তাঁর মন বিধুর হয়ে উঠেছে। মেঘালোকে তাঁর চিত্তও অন্যথাবৃত্তি হয়ে ওঠে—শ্রাবণ যখন পথের ধারে সকল বারি ঢেলে দেয় তখন চিত্তবিকার রোধ করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়—'ধরণীর সুগভীর অন্ধকারে আষাঢ়ান্তে মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় ঢালিয়া দিয়া অন্ধকার আকাশ যখন বিরহনিঃশ্বসিত সুরে অবসাদ গাহিতে থাকে, তখন ঝরঝর ধারায় শ্রাবণের গভীর হৃদয় কোথায় ঝরিয়া যায়।··· চারিদিকেই ক্রমাগত অন্ধকার ঘনীভূত হয়, সূর্যালোকে মেঘের ছায়া পড়ে, তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে অন্ধকারের উপর অন্ধকার যেন নৃত্য করিতে থাকে। এই অন্ধকারময় ভাবপ্রবাহের মধ্যে মানবের হৃদয়ও অন্ধকার না হইয়া কি থাকিতে পারে?'[৫]

এক দিক থেকে দেখলে, করুণ-রসই আদি রস। ক্রৌঞ্চবধে বিচলিত আদি কবির শোকের অনুভূতি সুললিত শ্লোকে উৎসারিত হয়েছিল। করুণ-রসের এই গুরুত্বের জন্যই সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। বলেন্দ্রনাথের বীণায় যে-সকরুণ রাগিণী ধ্বনিত হয়েছে তার মধ্যে আমরা জীবনের সেই মহাসংগীত শুনি ওয়র্ড্সোয়র্থ যাকে বলেছেন 'still, sad music of humanity'।

বলেন্দ্রনাথ বেদনাবিলাসী aesthete নন, তিনি ভাবুক। আর ভাবুক বলেই তিনি নিজের অন্তরে আশ্রয়সৌধ নির্মাণ করতে পারেন, যে-ধরনের নির্মিতির কথা কীট্স তাঁর বন্ধু রেনল্ড্স্‌কে একবার একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—'আমার এখন মনে হচ্ছে, প্রায় যে কোনো লোকই তার নিজের অন্তরলোক থেকে উর্ণনাভের মতো নিজের বায়বীয় নগরদুর্গ বয়ন করতে পারে।' বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য-শিল্পের ভিত্তিপ্রস্তর আবিষ্কার করতে গেলে তাঁর হৃদয়ের গভীর গহনে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে। এ দিক থেকেও বলেন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে রোম্যান্টিক।

তাঁর যে অন্তর্মুখী প্রবৃত্তি বলেন্দ্রনাথকে নিজের হৃদয়ের অন্তস্তলে নিয়ে গেছে সেই প্রবৃত্তিই তাঁকে জীবনের অন্তঃপুরে পৌঁছে দিয়েছে। জীবনের অনাবরণ, প্রকৃত রূপ তিনি দেখতে চেয়েছেন, দেখতে চেয়েছেন তার স্বাভাবিক নগ্নতা। 'নগ্নতা আর কাহাকে বলে? অলঙ্কারশূন্যতা বৈ ত নয়। সৌন্দর্য সৌন্দর্যের আবরণে অবগুণ্ঠিত সর্বত্রই। যেখানে কৃত্রিমতার আড়ম্বরে সৌন্দর্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সেইখানেই নগ্নতা প্রচ্ছন্ন। চাকচিক্যে সৌন্দর্য সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, ব্যক্ত হইতে পারে না। শুভ্র চন্দ্রালোকে যন্ত্রবিশেষের সাহায্যে সিন্দূরের আভা ফেলিলে কি সৌন্দর্য ব্যক্ত হইবার সুবিধা পায়? এইজন্য প্রকৃতিতে নগ্নতা সৌন্দর্যময়ী। নগ্নতায় আত্মা পরিব্যাপ্ত।'[৬] জীবনকে বলেন্দ্রনাথ দেখেছেন, চিনেছেন, ভালোবেসেছেন।

৫ 'শ্রাবণের বারিধারা' ব. গ্র. পৃ. ১৭৭
৬ 'নগ্নতার সৌন্দর্য' ব. গ্র. পৃ. ২৫৯

বাইরের হাসির ছটায় তিনি ভোলেন নি, ভিতরের অশ্রুজলের উৎস সন্ধান করেছেন।

জীবন-ফুলের রঙ লাল। সেই লালিমায় রক্তিম হয়ে উঠেছে বলেন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা। তাই তাঁর লেখা অত সহজে আমাদের মর্ম স্পর্শ করে, তিনি এত অনায়াসে অতি কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন। তাঁর সাহিত্য-শিল্পীর লেখনী-তুলিকায় বলেন্দ্রনাথ যে-সব বর্ণাঢ্য আলেখ্য অঙ্কন করেছেন সেগুলিতে নানাবিধ বর্ণের বিন্যাস সত্ত্বেও রক্তিমারই প্রাধান্য। সংসার থেকে সরে গিয়ে, জীবন থেকে পালিয়ে বলেন্দ্রনাথ মুক্তি পেতে চান নি— আশ্রয় খোঁজেন নি কোনো গজদন্তনির্মিত মিনারে, বা বোদ্‌লেয়ারের মতো কোনো নিভৃত কক্ষে, যেখানকার হাওয়াতে লেগে আছে দিবাস্বপ্নের গোলাপী আমেজ ও আলস্যের নীলিমা। বলেন্দ্রনাথ যে নন্দিনীর জনক তার হাতে রক্তকরবীর কঙ্কণ, তার সীমন্তে রক্তকরবীর রক্তিমা।

বলেন্দ্রনাথের প্রাণপ্রাচুর্য তাঁর 'simple, sensuous and passionate' কবিতাগুলিতে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। 'যৌবনের অনন্ত উচ্ছ্বাসে' 'মাধবিকা' ও 'শ্রাবণী' উচ্ছ্বসিত। কীট্‌সের মতো বলেন্দ্রনাথও ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী— 'mighty abstract idea of beauty' বলেন্দ্রনাথকেও অভিভূত করেছে। সহৃদয় সমালোচক যখন বলেন, 'সৌন্দর্য দর্শনের ও সৌন্দর্য ভোগের এমন কীট্‌সীয় দৃষ্টি ও মন লইয়া আর কোনো বাঙালি লেখক জন্মগ্রহণ করেন নাই',[৭] তখন তিনি নিতান্ত অত্যুক্তি করেন না। নারী বলেন্দ্রনাথের কাছে সৌন্দর্য মূর্তিমতী—তাই নারীর উন্মাদক রূপে তিনি বিহ্বল। তিনি রোম্যান্টিক কবি— নারী তাঁর কাছে দেবীও। কিন্তু মানসীকে তিনি বার বার মানুষী-রূপে পেতে চেয়েছেন— তাঁর প্রেয়সী নারী প্রদীপ্ত বাসনায় প্রোজ্জ্বল। স্রোতোবহার কলবেদনার মধ্য দিয়ে তিনি প্রেমিক হৃদয়ের অভিলাষকে ভাষা দিয়েছেন—

রহিব ঘিরিয়া তব
তরল যৌবনখানি— তনু অভিনব—
শত নাগিনীবেষ্টনে অনঙ্গের মত।[৮]

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের প্রেমের কবিতার প্রভাব বলেন্দ্রনাথের এই সমস্ত কবিতায় থাকা স্বাভাবিক, কারণ, প্রিয়নাথ সেনের ভাষায়, তখন 'সমস্ত বঙ্গদেশ রবীন্দ্রনাথের বীণাঝঙ্কারে কম্পিত, উচ্ছলিত'।[৯] তা ছাড়া, ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'পরমস্নেহাস্পদ',[১০] আর 'বলেন্দ্রনাথের সকল কার্যেই রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল'।[১১]

৭ প্রমথনাথ বিশী, 'বাংলার লেখক' (প্রথম খণ্ড ১৩৫৭), পৃ. ৮২
৮ 'কলবেদনা', 'মাধবিকা', ব. গ্র. পৃ. ৬৯
৯ 'স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'প্রদীপ' (সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়) আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৬
১০ 'নদী' কবিতার উৎসর্গ (২২-এ মাঘ, ১৩০২)
১১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-জীবনী' দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৫৫), পৃ. ২৭

রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য 'বিদায়-অভিশাপ' ১৩০০ সালের শ্রাবণ মাসে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা সাহিত্যে যে-আলোড়নের সৃষ্টি হয় তার ঢেউ এসে বলেন্দ্রনাথের কবিচিত্তকেও দোলায়িত করে। 'বিদায়-অভিশাপ' প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পরে বলেন্দ্রনাথ যে 'অগ্নিহোত্র' কবিতাটি রচনা করেন তার দীপ্তি রবীন্দ্র-রশ্মি-বিচ্ছুরিত—

পড়েছে কি মনে
কোন পুরাণ কাহিনী—সরস্বতীতীরে
যবে ঋষিকন্যাগণ চারি ধারে ঘিরে
গুঞ্জন করিত বসি মৃদু মৃদু স্বরে
দিবসের দুঃখসুখ যত, মৌনভরে
শুনিত একান্তচিতে কথা অভিনব
ঋষিমুখে, লাজাঞ্জলি দিত শিরে তব
বাষ্পাকুলচোখে ধীরে মন্ত্র পাঠ করি'
স্মিতমুখে শুচিমনে দেবতারে স্মরি',
দীপ্তি তব ঝলকিত চারু চন্দ্রানন
উজ্জ্বল আভায় ; সেই স্মৃতি পুরাতন
উঠিছে কি জাগি' আজি অরুণবরণে
তপ্ত বক্ষতলে, তাই শ্বসিছ সঘনে
শত শিখা মেলি ?[১২]

ভাব ও ভাষা দুদিক থেকেই সমগ্র কবিতাটি রবির আলোয় উদ্‌ভাসিত। বলেন্দ্র-নাথের অধিকাংশ কবিতাই রবীন্দ্র-রসসিক্ত। 'চৈতালি' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের তদানীন্তন কাব্যগ্রন্থগুলির সুর এইসব কবিতায় অনুরণিত।

'মাধবিকা'তে যে নারীকে আমরা নর্মসহচরী-রূপে পাই, তার এক নূতন রূপ 'শ্রাবণী'তে। মধুমাসে যে 'রহঃসখী', বর্ষণের দিনে সে 'গৃহিণী, সচিব'। বসন্তের অনঙ্গ-রঙ্গ বর্ষায় অনন্তের সুরে ধ্বনিত—

'বাহিরে তোমারে চাহি' পাই অন্তঃপুরে,— অন্তরে খুঁজিতে গিয়া হেরি বহু দূরে।'[১৩]

গৃহ-বধূ-রূপে নারীর যে-কল্যাণী মূর্তি 'বধূ' কবিতায় ফুটে উঠেছে, তার পূর্ণ বিকাশ 'গৃহলক্ষ্মী' কবিতায়—

তখন আছিলে শুধু রূপে সমুজ্জ্বল,
আজিকে তোমারে হেরি' সর্ব অমঙ্গল
ধীরে সরে' যায় দূরে ;...
ঘেরিয়াছে চারি ধারে কত দুঃখ সুখ,
কত উন্মেষিত আশা, কত ম্লান মুখ।

১২ 'মাধবিকা' ব. গ্র. পৃ. ৬৬। ১৩ 'কোথা ?' 'শ্রাবণী' ব. গ্র. পৃ. ৭৬।

সকল হৃদয়ভার বক্ষে লহ টানি—
তাই তুমি গৃহলক্ষ্মী, সকলের রানী।[১৪]

বলেন্দ্রনাথের এই কবিতায় ওয়র্ডসোয়র্থের 'She was a phantom of delight' কবিতার প্রভাব সুস্পষ্ট, যে-কবিতায় ওয়র্ডসোয়র্থ বলেছেন তিনি তাঁর প্রণয়িনী-পত্নীকে 'nearer view' থেকে দেখেছেন, এবং spirit ও woman এই দুইরূপেই দেখেছেন।

ইংরাজী রোম্যান্টিক কবিতা যে বলেন্দ্রনাথ সাগ্রহে অধ্যয়ন করেছিলেন তার পরিচয় আমরা বলেন্দ্রনাথের আলোচনাগুলিতেও পাই। 'অলঙ্কারে সৌন্দর্য সঙ্কুচিত হইয়া থাকে কেন?' এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি শেলির এবং ওয়র্ডসোয়র্থের কবিতার স্কাইলার্ক-পাখির তুলনা করেছেন—

'শেলির Skylark-এ সৌন্দর্যের সম্যক্ স্ফূর্তির কারণ, নগ্ন আত্মার অভিব্যক্তি। শেলি দেহাবরণের প্রত্যেক তরঙ্গ-ভঙ্গে আত্মা প্রস্ফুটিত করিয়াছেন।...ওয়র্ডসোয়র্থের Skylark-এ নগ্ন আত্মার এমন বিকাশ হয় নাই, সেই জন্য তাঁহার পক্ষীর কণ্ঠধ্বনিতে হৃদয় সেইরূপ আকুল করে না। শেলির বিহঙ্গ-কণ্ঠ সৌন্দর্যস্নাত, সে স্বরলহরীর মধ্যে জগতের ব্যবধান নাই, সে সৌন্দর্য অনাবৃত, সৌন্দর্যাচ্ছন্ন।'[১৫]

সূর্যাভিসারী শেলির (ব্রাউনিং শেলিকে 'sun-treader' বলেছেন) কবি-কল্পনার স্বরূপ বলেন্দ্রনাথের কাছে সহজেই ধরা পড়েছে।

সমালোচনাত্মক রচনা সম্বন্ধে হ্যাজ্‌লিট্ লিখেছেন—'A genuine criticism should, as I take it, reflect the colour, the light and shade, the soul and body of a work'।[১৬] এই নিরিখে বিচার করলে বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যসমালোচনার উৎকর্ষ সম্পর্কে আমাদের কোনো দ্বিধা থাকে না। তাঁর সমালোচনাকে আমরা যথার্থই 'সৃষ্টিমূলক'[১৭] বলতে পারি। বলেন্দ্রনাথের সমালোচনা সেই শ্রেণীর সমালোচনা যার সম্বন্ধে অস্‌কার্ ওয়াইল্‌ডের মন্তব্য—'a creation within a creation'।

শেক্‌স্‌পিয়রের তরুণ ভাগ্যবিড়ম্বিত নায়ক রোমিও বলেছিল, 'I shall be the candle-holder and look on'। এই রূপতৃষ্ণা বলেন্দ্রনাথেরও। রৌদ্র-ছায়া মাখানো, ঋতুচক্রের আবর্তনে স্পন্দিত, শ্যামলা ধরণীর দিকে তিনি 'মুগ্ধ নয়নে' চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁরও 'পথ চাওয়াতেই আনন্দ'। তাঁর চোখের সবটুকু আলো দিয়ে বলেন্দ্রনাথ নিখিল ভুবনের সবটুকু সৌন্দর্য নিরীক্ষণ

১৪ 'শ্রাবণী' ব. গ্র. পৃ. ৭৭।

১৫ 'নগ্নতার সৌন্দর্য' ব. গ্র. পৃ. ২৬। ১৬ 'On Criticism', *Table Talk*

১৭ 'বলেন্দ্রনাথের সমালোচনা সৃষ্টিমূলক। সাহিত্য ও শিল্প অবলম্বন করে বাসনালোকের স্বর্ণমেঘস্তর যেন নূতন মোহে আর একটি জগৎ সৃষ্টি করে।'— রথীন্দ্রনাথ রায়, 'বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা', 'সাহিত্য-বিচিত্রা' (নূতন সংস্করণ), পৃ. ২৩৮

করতে চান। এর জন্য তিনি পথপরিক্রমাতেও প্রস্তুত, তবে যদি সমানধর্মা, সৌন্দর্যলাবী কালিদাসের মতো সাথী পান—

মনে হয়, হে কবীন্দ্র, তব সাথে যদি
পথে পথে দিন শুধু যেত নিরবধি।
… … …
দুই ধারে ক্ষীয়মাণ ছবি পরে ছবি—
সৌন্দর্যচয়নে দোঁহে মগ্ন শুধু, কবি।[১৮]

অনেকে মনে করেন, এই কবিতা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে লেখা। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। বলেন্দ্রনাথের কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের 'ঋতুসংহার' কবিতার প্রভাব সুপরিস্ফুট। 'কবীন্দ্র' বলতে তখনকার দিনে সাধারণত কালিদাসকেই বুঝানো হত ; রবীন্দ্রনাথও তাই বুঝিয়েছেন ; বলেন্দ্রনাথ তাঁর অনুবর্তন করেছেন। তা ছাড়া, 'চৈতালি'তে 'ঋতুসংহার'-এর ঠিক পরের কবিতার নাম 'মেঘদূত'। 'শ্রাবণী'তে 'পথে পথে'র ঠিক আগের কবিতার নাম 'মেঘদূত'। বলেন্দ্রনাথের 'পথে পথে' রবীন্দ্রনাথের 'ঋতুসংহার'-এর সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি— কিন্তু প্রতিধ্বনির মাধুর্য ধ্বনির মধুরতা থেকে দূরে নয়।

বড় লেখক হওয়ার আশা যিনি পোষণ করেন, মহাকবি মিল্‌টন তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন 'নিজেই প্রকৃত কবিতা' হওয়ার জন্য।[১৯] বলেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জীবনে প্রকৃত কবিতা হতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবনের ছন্দোবন্ধনে ছিল কাব্যশিল্পের সুষমা। তাঁর স্বভাবে একটা স্নিগ্ধ পবিত্রতা আছে যেটা তাঁর সব রচনায় প্রতিভাত হয়েছে ও সেগুলিকে লাবণ্য দিয়েছে। তাঁর নিজের উপমার সাহায্য নিয়ে আমরা বলতে পারি, ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের মতো তাঁর মধ্যে যেন কেমন একটি অক্ষুণ্ণ শুচিতা আছে। এই শুভ্র-সমুজ্জ্বল শুচিতা সাহিত্যশিল্পী বলেন্দ্রনাথের জন্য বাংলা সাহিত্যে বিশেষ একটি স্থান চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত রাখবে।

১৮ 'পথে পথে'। 'শ্রাবণী', ব. গ্র. পৃ. ৭৬

১৯ 'He who would not be frustrate of his hope to write well hereafter in laudable things ought himself to be a true poem.'—*Apology for Smectymnuus* Introdn. to Sec. I.

শরৎচন্দ্র ও ডিকেন্স

যোগেন্দ্রনাথ সরকার রচিত 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র' বইটিতে দেখা যায় শরৎচন্দ্রের এই উক্তিটি—'ডিকেন্স দিনের বেলায় লিখতেন বলেই তাঁর লেখা অত সুন্দর—হুবহু দিনের আলোর মতো স্পষ্ট ও উজ্জ্বল।'

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ডিকেন্স-এর সাদৃশ্য নিয়ে বিশদ কোনো সাধারণ আলোচনা ইতিপূর্বে হয় নি, যদিও কেন হয় নি সেটা খুব বিস্ময়কর। এমন-কি শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এমন সমালোচনাত্মক গ্রন্থও রয়েছে যেখানে নির্দেশিকায় ডিকেন্সের উল্লেখ নেই, যদিও অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য লেখকদের নাম রয়েছে। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে, তুলনার প্রয়োজন কি ? এর উত্তর, তুলনার প্রয়োজন অনেক। বাঙালী মনীষীর কথায় বলা যায়, 'পাঠকেরা তুলনায় সমালোচনা বড় ভালবাসেন।' তা ছাড়া, ভিন্ন দেশের দু-জন 'সমানধর্মা' লেখকের তুলনামূলক আলোচনা তাঁদের রচনার বৈশিষ্ট্য ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে আমাদের সাহায্য করে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হতে পারে, এত সব পাশ্চাত্ত্য কথাসাহিত্যিক থাকতে ডিকেন্স কেন ? এর উত্তর সহজ। অন্য অনেকের চেয়ে ডিকেন্সের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশি। এ দেশে শিক্ষিত সমাজে 'ডেভিড কপারফীল্ড' বা 'টেল্স অফ টু সিটিজ' বইগুলির কথা জানেন না এমন লোকের সংখ্যা কম। আর একটা কথা—ডিকেন্স ও শরৎচন্দ্র সমানধর্মা লেখক তো বটেনই, ডিকেন্স শরৎচন্দ্রের সর্বাধিক প্রিয় বিদেশী লেখক। তাঁর উপন্যাসে ডিকেন্সের প্রভাব যে অনস্বীকার্য তার অন্তত একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্তমান লেখকের পিতৃদেব স্বর্গত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দত্তা'-সম্পর্কিত প্রবন্ধে দেখিয়েছেন।[১]

২

ডিকেন্স যে শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় লেখক ছিলেন, এটা নিঃসংশয়ে বলা চলে। আমরা বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এটা জানতে পারছি। শরৎচন্দ্রের আত্মীয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক্' গ্রন্থে লিখেছেন—'এই সময়ে তাহাকে ইংরাজি উপন্যাস এবং গ্যানোর ফিজিক্স খুব মন দিয়া পড়িতে দেখিতাম। তাহাকে স্কট পড়িতে বড় একটা দেখি নাই কিন্তু ডিকেন্সের সুখ্যাতি সে শতমুখে করিত।' সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য' গ্রন্থে একই কথা

১ ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র সম্পাদিত 'শরৎ-চর্চা' (১৯৭৭) দ্রষ্টব্য।

বলেছেন—'ইংরেজ লেখকদের মধ্যে ডিকেন্সের লেখা তার খুব ভালো লাগত।' স্মৃতিচারণ-রত বিভূতিভূষণ ভট্ট 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'আমার শরৎদা' প্রবন্ধে লিখেছেন—'অনেকদিন ডিকেন্সের ডেভিড কপারফীল্ড্ হাতে করিয়া এখানে সেখানে এবাড়ী ওবাড়ী পর্যন্ত করিতে দেখিয়াছি।' 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র'তে যোগেন্দ্রনাথ সরকার আমাদের জানিয়েছেন যে, কথাপ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন, 'ইংরেজী নভেলের মধ্যে ডিকেন্স আমার সবচেয়ে ভালো লাগে।' ডিকেন্স ও রাস্কিন-এর আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে একদিন যখন এই দুই ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালীর তর্ক বাধে তখন শরৎচন্দ্র ডিকেন্সের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। তিনি মনে করিয়ে দেন—'ডিকেন্স একজন সত্যকারের স্রষ্টা'। ডিকেন্সের প্রতি শরৎচন্দ্রের এই অনুরাগ আরও তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, শরৎচন্দ্র বিদেশী লেখকের বই বেশি পড়েন নি। এ সব তাঁর খুব একটা পছন্দ হত না। 'চন্দননগরের আলাপ-সভায়' (যাতে তাঁর অনেক মূল্যবান উক্তি আছে) তিনি বলেন, 'পরের লেখা সাহিত্য আমি খুব কম পড়েছি। ও আমার ভালো লাগে না। আমার বাড়িতে যে বই আছে তার অধিকাংশই সায়েন্সের বই।'

ডিকেন্স ছাড়া অন্যান্য বিদেশী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁদের লেখা শরৎচন্দ্র পড়েছিলেন এবং তাঁর ভালো লেগেছিল তাঁদের মধ্যে দুই জন মহিলা রয়েছেন—মিসেস্ হেনরি উড্ এবং মারি করেলি। এঁদের একজনকেও প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকরূপে গণ্য করা হয় না। মেরি ম্যাকে-র ছদ্মনাম 'মারি করেলি' (১৮৫৫-১৯২৪)। এঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলির সবই প্রায় উনবিংশ শতাব্দীতে লেখা—'আ রোমান্স অফ টু ওয়র্লড্‌স্' (১৮৮৬-আত্মজীবনমূলক উপন্যাস),'ব্যারাবাস' (১৮৯৩), 'সরোজ অফ সেটান' (১৮৯৫) এবং 'দ্য মাইটি অ্যাটম' (১৮৯৬)। তিনিও শরৎচন্দ্রের মতন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং শরৎচন্দ্রের মতন বিজ্ঞানে তাঁরও যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। শরৎচন্দ্রকে যেটা মারি করেলির উপন্যাসে আকৃষ্ট করে, সেটা তাঁর আন্তরিকতা এবং অধ্যাত্মবোধ ও নীতিবোধের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মে শরৎচন্দ্র 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে যে চিঠি লেখেন তাতে তিনি 'চরিত্রহীন' সম্পর্কে বলেন, 'এটা একটা সম্পূর্ণ Scientific Ethical Novel'। শরৎচন্দ্রের এই ইংরাজী বাক্যাংশটির উপর মারি করেলির প্রভাব আছে বলে মনে হয়।

এলেন্ উড্ যিনি মিসেস্ হেনরি উড্ (১৮১৪-৮৭) নামে সমধিক পরিচিত, তিনি মারি করেলি থেকে অনেক স্বতন্ত্র ধরনের। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী রক্ষণশীল এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর মধ্যবিত্ত জীবনের কাহিনীগুলিকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ঈস্ট লিন্' (১৮৬১), 'দ্য চ্যান্নিংস্' (১৮৬২) এবং 'মিসেস্ হ্যালিবার্টন্‌স্ ট্রাবল্‌স্' (১৮৬২)। প্রথমোক্তটির অনুবাদ হয়েছে বহু ভাষায় এবং বহুবার সেটিকে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। 'বিরাজ-বৌ' উপন্যাসের সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়।

মিসেস্ উড্ কিংবা মারি করেলির উপন্যাসের পরিধি অনেক সময় স্বাভাবিকভাবেই অপ্রশস্ত। এদিক থেকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এঁদের তুলনা করা যায়। গার্হস্থ্য

উপন্যাস রচনায় লেখিকারা সিদ্ধহস্ত এবং শরৎচন্দ্র পুরুষ লেখক হয়েও এই ধরনের উপন্যাসে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর স্বল্পায়তন 'নিষ্কৃতি' উপন্যাসটি এর সাক্ষ্য বহন করছে। তবে এদিক থেকে দেখলে বোঝা যায় এমিলি ব্রন্টি ছিলেন লক্ষণীয় ব্যতিক্রম ; তিনি গৃহস্থালীতে মনোনিবেশ করেন নি, নীড় ছেড়ে তিনি চলে গেছেন আকাশের দিকে। কবির গানের ভাষায় তাঁর উপন্যাস 'ওয়াদারিং হাইট্স'-এর মর্মবাণী ধ্বনিত :—

> অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে
> নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
> বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে' শরৎচন্দ্র কোনো দিন পরিক্রমা করতে পারেন নি, ডিকেন্সও পারেন নি। তাঁদের উপন্যাস সেই cosmic বা 'মহাজাগতিক' স্তরে পৌঁছতে পারে নি যে স্তরে রয়েছে 'ওয়াদারিং হাইট্স্' কিংবা ডস্টয়েফ্স্কি বা টল্স্টয়ের উপন্যাস। শরৎচন্দ্র টল্স্টয় পড়েছিলেন, 'রেজারেকশন' ছিল তাঁর অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ। হয়তো এ গ্রন্থের কিছু ছাপ শরৎচন্দ্রের কোনো লেখায় খুঁজে পাওয়া যাবে। তবু মূলত শরৎচন্দ্র ডিকেন্সের মতো সামাজিক কিংবা পারিবারিক উপন্যাসের লেখক। এ কথা বলার অর্থ কথাসাহিত্যিকরূপে শরৎচন্দ্র বা ডিকেন্সকে ছোটো করা নয়। বরং এক দিক থেকে দেখলে তাঁদের কৃতিত্ব অনেক বেশি। নিছক সাংসারিক বা সামাজিক উপন্যাস লিখেও তাঁরা বিশ্বের বরেণ্য কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে নিজেদের স্থান করে নিতে পেরেছেন। এখানে জেন্ অস্টিন্-এর উল্লেখ শুধু প্রাসঙ্গিক নয়, প্রয়োজনীয়ও বটে।

জেন্ অস্টিনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাদৃশ্য সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শরৎচন্দ্রও সাধারণ জিনিসকে অনায়াসে অসাধারণে রূপান্তরিত করতে পারেন। তাঁর সেই 'exquisite touch' রয়েছে যেটা ওয়াল্টার স্কট শ্রীমতী অস্টিন্-এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। নিজের শৈলীর সঙ্গে জেন্-এর শৈলীর বৈষম্য দেখাতে গিয়ে স্কট তাঁর 'জর্নাল'-এ লেখেন (১৪ই মার্চ ১৮২৬)—'The Big Bow-Wow strain I can do myself like any now going ; but the exquisite touch, which renders ordinary commonplace things and characters interesting, from the truth of the description and the sentiment, is denied to me.'

তবে, জেন্ অস্টিনের সঙ্গে এক জায়গায় শরৎচন্দ্রের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। শরৎচন্দ্র ডিকেন্সের মতো মানুষের দুঃখ-কষ্টের মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন, মানুষের বেদনার ইতিহাস তাঁর অনেক গ্রন্থের অনেক অংশেই লিপিবদ্ধ। জেন্ অস্টিনের পক্ষে এটা সম্ভব হয় নি। তিনি এ-সব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর আত্মসচেতনতা লক্ষ করার মতো। 'ম্যান্স্ফীল্ড পার্ক' উপন্যাসে তাঁর নিজের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—'Let other pens dwell on guilt and misery.' তাঁর পরবর্তী যুগে যাঁরা তাঁর অসমাপ্ত কাজ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের

মধ্যে রয়েছেন ডিকেন্স; জর্জ এলিয়ট এবং মিসেস্ গ্যাস্কেল্। শেষোক্ত দু-জন লেখিকার কথাও শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গে মনে পড়বে।

শরৎচন্দ্র-প্রসঙ্গে লেখিকাদের কথা আগে মনে পড়ে এইজন্য যে, শরৎচন্দ্রের মধ্যে নারী-সত্তা সাধারণ পুরুষ লেখকদের তুলনায় বেশি পরিণত ও সংবেদনশীল ছিল এবং তাঁর উপন্যাসে এটা কিছুটা প্রতিফলিত। এটা অস্বাভাবিক বা অগৌরবের নয়। প্রতি পুরুষের মধ্যে যে সুপ্ত এক নারী-সত্তা এবং প্রতি নারীর মধ্যে সুপ্ত এক পুরুষ-সত্তা অল্পবিস্তর রয়েছে এ সত্য আজ মনস্তত্ত্ব-শাস্ত্রে স্বীকৃত। একই কারণে শরৎচন্দ্র নারী-চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছেন। অন্য পুরুষ লেখক যাঁরা এটি করতে পেরেছেন, তাঁদের মধ্যে শেক্স্পিয়র রয়েছেন। কেউ কেউ এমনও মনে করেন যে, শেক্স্পিয়রের নাটকগুলি কোনো নারীর লেখা, কারণ কোনো পুরুষের পক্ষে নাকি এ ধরনের জীবন্ত নারী-চরিত্র সৃষ্টি করা সম্ভব নয়! এদিক থেকে অবশ্য ডিকেন্সের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাদৃশ্য পাওয়া যাবে না। নারী-চরিত্রে এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি ডিকেন্সের নেই এবং তাঁর উপন্যাসে পুরুষালি-ভাব অনেক বেশি পরিস্ফুট। বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, বঙ্কিমের প্রতিভার মধ্যে একটা গৃহিণীপনার ভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের উক্তি, একটু অন্য অর্থে, শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। এবং এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বঙ্কিমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্র কারুর ক্ষেত্রেই 'গৃহিণীপনা' শব্দটি নিন্দার্থক নয়।

বাঙালী লেখককে কোনো ইংরাজ লেখকের সঙ্গে মেলাবার দিকে আমাদের একটা প্রবণতা আছে, তাই মধুসূদনকে 'বাঙ্লার মিল্টন' এবং নবীনচন্দ্র সেনকে 'বাঙ্লার বায়রন' বলে আমরা তৃপ্তিলাভ করি। উপন্যাস-ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের খেতাব বাঙ্লার স্কট', এবং এ খেতাব দেওয়ার সময় অন্যান্য সাদৃশ্য ছাড়াও 'দুর্গেশনন্দিনী'র সঙ্গে 'আইভ্যান-হো'র মিলের কথা বেশি করে ভাবা হয়েছে, যদিও বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বলেছেন যে তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখার আগে 'আইভ্যান্-হো' পড়েন নি। অবশ্য স্কট পড়তে তাঁর ভালো লাগে নি, এ-কথা বঙ্কিমচন্দ্র কখনো বলেন নি, শরৎচন্দ্র প্রকারান্তরে বলেছেন। এর একটা কারণ অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাশৈলীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাশৈলীর গুরুতর পার্থক্য। রোম্যান্সের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সময় ঝুঁকেছেন এবং তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটিকে 'মূর্তিমান রোম্যান্স' বা 'রোম্যান্স ইন্কার্নেট্' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। স্বভাবতই তিনি রোম্যান্সের যাদুকর স্কটের প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং তাঁর রোম্যান্টিক ঐতিহাসিক উপন্যাসের পাতায় পাতায় তিনি, স্কটের মতোই, অতীতকে প্রাণবন্ত করে তুলবেন। রবীন্দ্রনাথও ইতিহাসাশ্রয়ী আখ্যায়িকা রচনা করেছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ঐতিহাসিক কাহিনী কোথায়? তিনি নিজে যে যুগে দেখেছেন,

সেই যুগের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রেখে ঔপন্যাসিকরূপে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতো বাস্তবনিষ্ঠ লেখকের পক্ষে সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা হয়তো সম্ভব ছিল না। বাস্তবনিষ্ঠ ঔপন্যাসিক হয়েও ডিকেন্স তাঁর অবিস্মরণীয় উপন্যাস 'আ টেল্ অফ টু সিটিজ' ফরাসী-বিপ্লবের পটভূমিকায় রচনা করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে কিন্তু কাহিনীর সূত্রপাত ঘটে ১৭৭৫-তে যখন 'আশার বসন্ত আর নৈরাশ্যের হেমন্ত বিরাজ করছিল। যখন সব কিছু আমাদের সামনে ছিল, কিছুই আমাদের সামনে ছিল না…।' ডিকেন্স কার্লাইলের 'ফরাসী বিপ্লব' গ্রন্থ থেকে কতটা সাহায্য পেয়েছিলেন সেটাই বড় কথা নয়; বড় কথা সেই ঋণলব্ধ বিষয়কে তিনি শিল্পকর্মের সুবর্ণে রূপান্তরিত করতে পেরেছেন কি না। যাই হোক, ডিকেন্সের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য দুই-ই রয়েছে; তবু শরৎচন্দ্রকে যদি 'বাঙ্‌লার…' কিছু বলতেই হয়, বাঙ্‌লার ডিকেন্স বলাই ভালো। তাঁদের নিজস্ব ক্ষেত্রে তাঁরা দুজনেই 'অপরাজেয়' কথাশিল্পী। (শরৎচন্দ্র-প্রসঙ্গে এই বিশেষ বিশেষণটির প্রতি বাঙালী পাঠকের দুর্বলতার কথা সুবিদিত।) এই সূত্রে টমাস্ হার্ডির কথা কেউ ভুলতে পারেন। হার্ডির উপন্যাস শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মতো আবেগপ্রধান, হার্ডি-ও শরৎচন্দ্রের মতো নারী-দরদী, হার্ডি-ও গ্রাম-জীবনের সার্থক আলেখ্য রচনা করেছেন। (এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ডিকেন্স একান্তভাবেই 'শহুরে' লেখক। ডক্টর জন্‌সন কিংবা চার্লস্ ল্যাম্-এর কাছে যেমন, চার্লস্ ডিকেন্সের কাছেও লণ্ডনই বিশ্বসংসার।) মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে হার্ডি এবং শরৎচন্দ্র দুজনেই সমান আগ্রহী। কিন্তু ভাগ্যের যে বিড়ম্বনা হার্ডির উপন্যাসের পাত্রপাত্রীকে সর্বদা অস্থির করেছে, তাঁদের নিয়ে প্রকৃতির যে নিষ্ঠুর পরিহাস, শেক্‌স্‌পিয়রের গ্লস্টার যাকে বলছে (এ উক্তির উল্লেখ হার্ডি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'টেস্'-এর ভূমিকায় করেছেন)—

> As flies to wanton boys, are we to the gods ;
> They kill us for their sport—

সে জিনিস শরৎচন্দ্রের রচনায় কোথায়?

করুণরস প্রকাশে শরৎচন্দ্রের অসামান্য ক্ষমতা এবং 'চরিত্রহীন'-এর সাবিত্রীর, 'গৃহদাহ'-এর অচলার এবং 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বের কমললতার বেদনাবিধুর মর্মন্তুদ কাহিনী মনে রেখেও বোধ হয় বলা যায়, শরৎচন্দ্রের প্রতিভার প্রবণতা ও বিকাশ ট্র্যাজেডির চেয়ে কমেডির দিকে বেশি; এদিক থেকেও তিনি ডিকেন্সের সমগোত্রীয়। মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় শরৎচন্দ্র ব্যথিত হয়েছেন, ডিকেন্সও হয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে শেষ কথা নয়। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখে মেলানো যে জীবন, যেটাকে শেক্‌স্‌পিয়রের নাটকে জীবন-বস্ত্রের টানা-পোড়েন বলা হয়েছে, সেই জীবনের প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন শরৎচন্দ্র ও ডিকেন্স। কান্নাহাসির দোলনে তাঁদের রচনা স্পন্দিত, তাঁদের উপন্যাসে পৌষ এলে ফাল্গুন বিলম্বিত হয় না। হার্ডির মতো তাঁরা 'আমার আঁধার ভালো'-কে উপন্যাসের মূলমন্ত্র করেন নি; ভাবেন নি যে—

'happiness was but the occasional episode in a general drama of pain'।

শরৎচন্দ্রকে 'বাঙ্‌লার ডিকেন্স' বলার আর একটি প্রধান যুক্তি এই যে, ডিকেন্স যেমন ইংরাজদের কাছে, শরৎচন্দ্রও তেমনি বাঙালীদের কাছে, সর্বাধিক জনপ্রিয় সাহিত্যিক। জনপ্রিয়তা অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখকদের কাল হয় (যেমন সমার্সেট্‌ মম্‌-এর ক্ষেত্রে), এবং লেখক তাঁর যথাযোগ্য স্বীকৃতি পান না। সুখের বিষয়, শরৎচন্দ্র এবং ডিকেন্সের ক্ষেত্রে সেটা হয় নি। সাধারণ স্বল্পশিক্ষিত পাঠকদের মন যে লেখক জয় করতে পারেন তিনি বরাবর সাধারণ লেখকই থেকে যান, অসাধারণত্বের স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারেন না, এ ভুল ধারণা একটা সময়ে অবশ্য শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রকৃত সমাদর হতে দেয় নি, ঠিক যেমনটা এক সময় ডিকেন্সের ক্ষেত্রে ঘটেছে। তবে ভুল অচিরেই ভেঙে গেছে। হৃদয়াবেগের প্রবলতা থাকলেই যে সেটা উপন্যাসের একটা ত্রুটি হবে, এমন কথা মাঝে মাঝে শোনা গেলেও সেটাকে শেষ পর্যন্ত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় নি।

হৃদয়াবেগের প্রবলতার দিক থেকে দেখলে ডিকেন্সের উপন্যাসের চেয়ে শরৎ-চন্দ্রের উপন্যাস অধিকতর উল্লেখযোগ্য বলতে হয়। এর একটা কারণ, নারী পুরুষের চেয়ে ভাবাবেগ দ্বারা বেশি চালিত হয় এবং শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাসই নায়িকা-কেন্দ্রিক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, লা ব্রুয়ের যখন বলেছিলেন, 'নারীরা চরমের দিকে ঝোঁকে, তারা পুরুষদের চেয়ে হয় বেশি ভালো, নয় বেশি খারাপ', এবং বায়রন যখন লিখেছিলেন,

> Man's love is of man's life a thing apart,
> 'Tis woman's whole existence.

—তখন তাঁরা সত্যের বড় একটা অপলাপ করেন নি। কেউ কেউ 'চরিত্রহীন'কে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মনে করেন। এই উপন্যাসে 'মেসের ঝি' সাবিত্রীকে কেন্দ্র করে ভাবাবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, যদিও সাবিত্রী নিজে অনেক সময় অসামান্য সংযমের পরিচয় দিয়েছে। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে অন্ধকারে বৃক্ষতলে সতীশের অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

> 'তাহার দুই চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এ অশ্রু সে দমন করিতে চাহিল না—এ অশ্রু সে মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিল না! অশ্রু যে এত মধুর, অশ্রুতে যে এত রস আছে, আজ সে তাহার পরম দুঃখের এই প্রথম উপলব্ধি করিয়া সুখী হইল এবং যাহাকে উপলক্ষ করিয়া এত বড় সুখের আস্বাদ সে জীবনে এই প্রথম গ্রহণ করিতে পাইল, তাহারই উদ্দেশে দুই হাত যুক্ত করিয়া নমস্কার করিল।'

শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' সম্পর্কে ইংরাজীতে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ শরৎচন্দ্রের 'profound emotional power'-এর উল্লেখ করেছেন। এর দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন রচনার পাতায় পাতায় ছড়ানো। হৃদয়াবেগের এই আতিশয্য অনেকে পছন্দ

করেন নি। যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'চরিত্রহীন' পড়ে 'অভিভূত বিচলিত' বোধ করেছিলেন, তিনিই আবার প্রশ্ন তুলেছেন, 'শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিও হৃদয়সর্বস্ব কেন, হৃদয়াবেগ কেন সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করে—মধ্যবিত্তের হৃদয় ?' ('লেখকের কথা')

ভাবাবেগের প্রাবল্যের জন্য শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে হাস্যরস ততটা প্রাধান্য পায় নি যতটা ডিকেন্সের উপন্যাসে পেয়েছে, যদিও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে হাস্যরস যথেষ্টই রয়েছে। হাস্যরসে ডিকেন্সের সমকক্ষ সাহিত্যিক বিরল। বিশ্বসাহিত্যে তাঁর স্থান অনন্য। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র পিক্‌উইক্‌-এর স্থান Don Quixote এবং ফল্‌স্টাফ্‌ এর পাশে। অনাবিল হাস্যরসে তাঁর রচনা উদ্‌ভাসিত, যদিও কোনো কোনো উপন্যাসে সে হাস্যরস অনেক কঠোর হয়ে উঠেছে, যেমন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আওয়ার মিউচুয়াল ফ্রেণ্ড্‌'-এ। ডিকেন্সের 'কমিক' চরিত্রের সংখ্যা অগণিত। তারা অধিকাংশই খুব অদ্ভুত, খেয়ালী ধরনের নরনারী। 'ডেভিড্‌ কপারফীল্‌ড'্‌-এ বেট্‌সি ট্রট্‌উড্‌-এর কথা ধরা যাক। ডেভিডের মাতার কন্যাসন্তান হবে ধরে নিয়ে ভদ্রমহিলা তার বাড়িতে এসেছিলেন, পুত্র-সন্তান হয়েছে শোনামাত্র ছুটে পালিয়ে যান। বাগানে গাধা ঢুকে পড়লে তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয় ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত অস্থিরতা। কিংবা 'মার্টিন্‌ চাজ্‌ল্‌উইট্‌'-এ স্থূলাঙ্গিনী ধাত্রী সারা গ্যাম্প্‌, যার কণ্ঠ সুরেলা নয় কিন্তু চোখ সজল থাকে। সে এক মনগড়া বন্ধু মিসেস্‌ হ্যারিস্‌-এর অস্তিত্ব কল্পনা করে তার অনুমোদন নিয়ে বেঁচে আছে। কিংবা 'গ্রেট্‌ এক্‌স্‌পেক্‌টেশন্‌স্‌'-এর জো গার্গেরি। তার মধ্যে যেমন রয়েছে হার্কিউলিসের শক্তি, তেমনি হার্কিউলিসের দুর্বলতাও। রণরঙ্গিণী স্ত্রীর কাছে সে সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। এরা সাধারণ মানুষ নয়, খানিকটা হয়তো অ্যাব্‌নরম্যাল্‌। কেউ যদি এদের 'পাগলাটে' বলে, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু এই সব চরিত্র আঁকতে মানবদরদী ডিকেন্সের নৈপুণ্য অসাধারণ। এদের নিয়েই তাঁর প্রখ্যাত 'চরিত্র-চিত্রশালা'। এরাই তাঁর উপন্যাসে এনেছে জীবনের জোয়ার এবং তাঁর উপন্যাসকে করে তুলেছে এত আকর্ষক।

শরৎচন্দ্র ও ডিকেন্স দুজনকেই জীবনের প্রথম দিকে নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। উভয়েই জীবনকে নিজের চোখ দিয়ে দেখেছেন, দুজনের কেউই পণ্ডিত লেখক ছিলেন না ; তাঁদের আসল ডিগ্রী জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া। দুজনেরই মুখ্য উদ্দেশ্য পাঠককে আনন্দদান করা। শরৎচন্দ্র তাঁর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'পড়িয়া যদি না আনন্দের আতিশয্যে চোখে জল আসে তবে আর সে গল্প কি ?' এ উক্তিতে ডিকেন্সের মনোভাবও পূর্ণভাবে প্রতিফলিত। কাহিনী যাতে পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট করে ও স্বচ্ছন্দগতি হয় সে দিকে উভয়েই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। 'চেতনা প্রবাহ' বা 'স্ট্রীম অফ কনশাস্‌নেস্‌' পদ্ধতির পূর্বাভাস তাঁদের লেখায় রয়েছে, কিন্তু তাঁরা জেম্‌স্‌ জয়েস্‌ কিংবা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌-এর মতো গল্পকে বিসর্জন দেন

নি। ই. এম্. ফর্স্টার এর 'অ্যাস্পেক্টস্ অফ্ দ্য নভেল'-এর কথা আমাদের মনে পড়বে—'yes,—oh dear, yes !—the novel tells a story'।

শরৎচন্দ্র ও ডিকেন্স দুজনেই তাঁদের উপন্যাসে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জীবনের নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। দুজনের হৃদয়ই নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত মানুষের জন্য বেদনার অনুভূতিতে আর্দ্র। মানুষের জন্য তাঁদের দরদ সীমাহীন, সহানুভূতি অপরিসীম। অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁদের লেখনী খড়্গের মতো তীক্ষ্ণ, অথচ জীবনকে তাঁরা দেখেছেন ক্ষমাসুন্দর চোখে, অসীম ঔদার্য নিয়ে। অনাথ শিশুদের দুঃসহ দুরবস্থা 'অলিভার টুইস্ট'-এ জ্বলন্ত অক্ষরে মুদ্রিত। তেমনি সামাজিক দলাদলি মানুষকে কতো নীচ ও অমানুষ করতে পারে, সে সত্য 'পল্লীসমাজ' বইখানিতে জাজ্বল্যমান। 'অরক্ষণীয়া' এবং 'বামুনের মেয়ে'তেও সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের প্রতিবাদ স্পষ্ট। 'ডেভিড কপারফীল্ড্'-এ সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রণালীর এবং ঋণগ্রস্তদের কারাগৃহের শোচনীয় অবস্থার দিকে ডিকেন্স অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। 'ব্লীক্ হাউস্', 'হার্ড্ টাইম্স্', 'লিট্‌ল্ ডরিট্'—পরবর্তী কালের অধিকাংশ উপন্যাসে ডিকেন্স কোনো না-কোনো সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। তিনিও শরৎচন্দ্রের মতো বলতে পারতেন, 'আমি একটা উদ্দেশ্য লইয়াই গল্প লিখি, সেটা পরিস্ফুট না হওয়া পর্যন্ত ছাড়িতে পারি না।' তবে এঁদের কেউই সামাজিক সমস্যার কোনো সদ্য-প্রস্তুত সমাধান আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেন নি। করার ইচ্ছাও তাঁদের ছিল না। ঔপন্যাসিক অ্যাংগাস্ উইল্‌সন্ যথার্থই বলেছেন—'I don't think that it's the novelist's job to answer. He is only concerned with exposing the human situation.'

৫

শরৎচন্দ্র ও ডিকেন্স পাঠকের মনোরঞ্জনের কথা সর্বাগ্রে ভেবেছেন বলেই তাদের প্লটে অনেক সময় খুঁত থেকে গেছে। কখনো কথোপকথনে বড় বেশি জায়গা নিয়েছে, কখনো বা ঘটনার অস্বাভাবিক সমাবেশ দেখা দিয়েছে। অনেক সময় অতিনাটকীয় বা অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটানো হয়েছে। 'দত্তা' থেকেই এর উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে। ডিকেন্সের ক্ষেত্রে 'নিকোলাস্ নিক্‌ল্‌বি'র কথা মনে পড়বে। চরিত্র-চিত্রণে দুই লেখকই দক্ষ, কিন্তু মাঝে মাঝে দুজনেই চরিত্রকে পরিণতির পথে নিয়ে যেতে গিয়ে স্বাভাবিকতায় জলাঞ্জলি দিয়েছেন। 'দেনাপাওনা' থেকে জীবানন্দের দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে। অত্যাচারী, দুশ্চরিত্র নায়ক পূর্ব-পরিত্যক্তা স্ত্রী ষোড়শীর সংস্পর্শে আসার পর হঠাৎ 'ভালোমানুষ' হয়ে গেল। তেমনি 'ডেভিড কপারফীল্ড্'-এ দেখি উপন্যাসের শেষে মিকবার সাহেব অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসর জমিয়েছে, যে নিষ্কর্মা ও অলস মানুষটি সারা জীবন শুধু 'কিছু ঘটবে' এই আশা নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই সব পরিণতি সাধারণ পাঠকের কাছে খুবই প্রীতিকর—এবং উপন্যাসগুলির সুখান্তক পরিসমাপ্তিতে সাহায্য করেছে।

শরৎচন্দ্র ও ডিকেন্স দুজনের উপন্যাসেই করুণরস এবং হাস্যরসের অবতারণা ঘটেছে। এঁদের দুজনের লেখাতেই মেঘ-রৌদ্রের খেলা। করুণরস অনেক সময় এত তীব্র যে তা ভাবালুতায় পর্যবসিত হয়েছে। 'মহেশ' গল্পের উপসংহার এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, যেখানে গফুর নিজের হাতে মহেশকে হত্যা করছে এবং তার পর দশ বছরের বালিকা কন্যা আমিনার হাত ধরে চিরকালের মতো গৃহত্যাগী হচ্ছে. 'ওল্ড্ কিউরিয়সিটি শপ'-এ লিট্‌ল্ নেল্-এর মৃত্যুর দৃশ্যও ডিকেন্স চড়া সুরে বেঁধেছেন। পাঠকের চোখে যাতে কয়েক বিন্দু বেশি অশ্রু আসে, সেজন্য শরৎচন্দ্র ও ডিকেন্স দুজনকেই বেশ যত্নশীল দেখা যায়। লর্ড ডেভিড সেসিল-এর মন্তব্য মনে পড়বে, 'Pathos can be the most powerful of all the weapons in the novelist's arsenal. But it is far the most dangerous to handle.'

শরৎচন্দ্র ও ডিকেন্স দুজনেই 'ডেমোক্র্যাট্', দুজনেই 'বাস্তববাদী'। আবার দুজনের কেউই অবিমিশ্র বাস্তববাদী নন ; তাঁরা আদর্শবাদীও। যদি এই দুটি শব্দ আমাদের নেহাৎই এইভাবে ব্যবহার করতে হয় তাহলে বলতে হবে, তাঁদের লেখায় বাস্তববাদ ও আদর্শবাদের সমন্বয় ঘটেছে। শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন,—'গোটা দুই শব্দ আজকাল প্রায় শোনা যায়, Idealistic and Realistic—আমি নাকি এই শেষ সম্প্রদায়ের লেখক। অথচ, কি করে যে এ-দুটোকে ভাগ করে লেখা যায়, আমার অজ্ঞাত।' ('স্বদেশ ও সাহিত্য')

শরৎচন্দ্র এবং ডিকেন্সের প্রধান প্রধান সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যগুলি এখানে দেখা গেল। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' কতটা আত্মজীবনমূলক এবং ডিকেন্সের আত্মজীবনমূলক উপন্যাস 'ডেভিড কপারফীল্ড'-এর সঙ্গে তার মিল কোথায়, সে প্রশ্ন আলোচনা করা হয় নি। তবে এটা বোধ হয় স্পষ্ট হয়েছে যে, শরৎচন্দ্র ও ডিকেন্স দুজনেই জীবনকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন এবং দুজনেরই বিশ্বাস—'সবার উপরে মানুষ সত্য'। জীবনের শত দুঃখের মধ্যেও হাসিমুখে থাকতে পারাটাই মানুষের ধর্ম—এটাই তাঁদের শিক্ষা। বেট্‌সি ট্রট্‌উডের ভাষায়—'We must meet reverses boldly···we must live misfortune down.' আমাদের কোনোভাবেই মনুষ্যত্বের মহিমাকে খর্ব করার অধিকার নেই। তাই শরৎচন্দ্র বলেছেন—মানুষের মৃত্যু ততটা পীড়াদায়ক নয় যতটা পীড়াদায়ক মনুষ্যত্বের মৃত্যু। যিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন 'মানুষের অন্তর জিনিসটা অনন্ত' সেই শরৎচন্দ্র আলোকের কবি। আলোকের কবি বলেই 'যে-আঁধার আলোর অধিক' সে-আঁধার তাঁর কাছে লাবণ্যমণ্ডিত। আঁধারের অপরূপ রূপ তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল —'কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে, আলোই রূপ, আঁধারের রূপ নাই?' আলোক-অন্ধকারের বিচিত্র জগৎ তিনি অবিষ্কার করেছিলেন মানুষের অন্তরে, যেখানে অন্ধকারকে ছাপিয়ে ফুটে ওঠে আলোর জ্যোতি। ডিকেন্সও শরৎচন্দ্রের মতো আলোকাভিসারী, তাই তিনি বলতে পেরেছেন, 'There are dark shadows on the earth, but its lights are stronger in the contrast.'

করুণানিধান : 'একলা পথের যাত্রী'

এখনকার পাঠকের কাছে কবি করুণানিধানের কবিতার প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা সে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। পরমার্থের জন্য তাঁর যে আর্তি নানা কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে সেটা কি তাঁর রচনাকে সাম্প্রতিক কালের পক্ষে অনুপযোগী করে তুলেছে? কিন্তু কবিতায় আধ্যাত্মিকতার রূপ কিংবা প্রকাশের ভঙ্গি নিয়ে আমাদের আপত্তি থাকলেও আধ্যাত্মিকতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। অন্নময় প্রাণ থেকে চিন্ময় প্রাণে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অল্পবিস্তর রয়েছে। শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি থেকে আমরা সব সময় মুক্তি পেতে চাইছি। 'চিরসুন্দর' কবিতায় করুণানিধান তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুললিত সুরে এই কথাই বলতে চেয়েছেন—

> বন-গিরিতে ঢের ঘুরেছি, মন ভরে নাই কিন্তু নাথ,
> ঊর্ধ্বে চেয়ে উদাস বুকে উধাও ছুটি দিবস-রাত—
> জ্যোৎস্না-মেঘে মগ্ন পাখায় লগ্ন ফেনমঞ্জরী—
> যাত্রী আমার পরাণ-পাখি নীল পারাবার সন্তরি।
>
> এই সুষমার সীমার শেষে ঘর বাঁধিতে উন্মনা—
> ত্বর সহে না,—কোন্ ঠিকানা? ফুরিয়ে গেল দিন গোণা!
> সকল স্মৃতি দাও ঘুচায়ে, থাকুক শুধু এক স্মৃতি,
> জীবন থেকে দাও গো মুছে ভক্তিহীনের দুষ্কৃতি।

প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ য়ুং বলেছেন—যৌবন কাটিয়ে মানুষ যখন মধ্য বয়সে পা দেয় তখন তার কাছে অধ্যাত্মজীবনের প্রশ্নটাই, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন, যে মুহূর্তে মানুষ নিজের অধ্যাত্মজীবনের কোনো সার্থকতা খুঁজে পায় সে মুহূর্তেই সে মানসিক ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করে। যৌবনে সে বহু বাসনায় বিড়ম্বিত, সংসারই তার সর্বস্ব, ওয়র্ডসোয়র্থ যেটাকে 'the world is too much with us' বলেছেন। যৌবনোর্ধ্বে তার ক্রমশ উপলব্ধি হয়, শ্রেয়কে ছেড়ে সে প্রেয়ের দিকে ঝুঁকেছিল, অল্পের জন্য বহু হারাতে বসেছিল। তখন তার লক্ষ্য বদলায়। প্রাতিভাসিকের আপাত-রমণীয় পথ ছেড়ে সে তখন পারমার্থিকের ক্ষুরধার-দুর্গম পথে পদক্ষেপ করে। নূতন লক্ষ্যবস্তুর নামকরণ কি হবে সেটা বড় কথা নয়। যদি বলি 'ঈশ্বর', তাতেই বা দোষ কি? ঈশ্বরের প্রকৃত পূজা নিজের নিরাপত্তার জন্য নয়; সেটা

ঝড়ের রাতে আত্মার অভিসার, সেটা অপ্রাপণীয়কে পাওয়ার বাসনায় অকারণ, অবারণ চলা। দার্শনিক অ্যাল্‌ফ্রেড্ নর্থ হোয়াইট্‌হেডের ভাষায়—

The worship of God is not a rule of safety—it is an adventure of the spirit, a flight after the unattainable.

(Science and the Modern World)

শাঁদ্রে জীদ্ একবার লিখেছিলেন, মরমী না হলে মানুষ কোনো বড় কাজ করতে পারে না। এই কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলা যায়, মরমী না হলে বড় কবি হওয়া যায় না। মহান্ কবির এই একটা অন্তত বড় গুণ করুণানিধানের রয়েছে। তাঁর 'প্রাণের ভাষা'তে ঈশ্বর-সান্নিধ্যের জন্য আকুলতা অন্তর থেকে উৎসারিত—

দেখতে তোমায় পাইনে ব'লে সুখ তো নাহি নাথ,
কখন তব নাগাল পাব, বাড়িয়ে আছি হাত,—
ডাকছি তোমায় শূন্য জুড়ে আকাশ-ধ্বনি আসছে ঘু'রে
তারার সাথে জাগছি একা প্রভাত-হারা রাত!
অশ্রু আমার অশ্রু নহে—নয়ন-পাতা-ভরা,
বিরহেরি শরৎ-রাতের শিশির-কণা ঝরা ;
হৃৎ-সাগরের বেলার 'পরে, তুষার-শাদা ফেনার থরে
ফুটবে না কি আলোর লীলা ভুবন-মনোহরা।

রবীন্দ্রনাথের রাগিণীর আভাস শোনা যাবে, কিন্তু সেটা করুণানিধানের কবিতায় কোনো ছন্দপতন ঘটায় নি। রবীন্দ্রানুসারী হয়েও তিনি তাঁর স্বকীয় দ্যুতিতে দীপ্যমান। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ-রজনীকান্ত সেনের মিলিত প্রতিধ্বনিও আমাদের কানে আসে, যেমন ওই কবিতারই প্রথম অংশে—

অপমানে চূর্ণ করো আমার অহঙ্কার
দীর্ণ করো অবিশ্বাসের পাষাণ গুরুভার—
সন্তানেরে শাস্তি দিতে বাজবে ব্যথা দয়াল চিতে,
তুমিই আছ বিপথ হতে আমায় ফেরাবার।

এই প্রতিধ্বনি ধ্বনিকে ব্যঙ্গ করে না, ধ্বনিকে নূতন বাণীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। মরমী কবিরূপে রবীন্দ্রনাথ অতলস্পর্শী গভীরতায় অবগাহন করেছেন। হৃদয়ের ব্যাকুলতাকে রজনীকান্ত অসাধারণভাবে মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন। করুণানিধানের বৈশিষ্ট্য অন্য দিকে। তাঁর কবিতায় আমরা অনেক সময় ভাবাবেগ ও শমতার একটা দুর্লভ ভারসাম্যের পরিচয় পাই যেটার ফলে তাঁর কবিতার প্রভাব পাঠকের মনে দীর্ঘস্থায়ী। অন্তরের হাহাকার যে রচনার প্রথমাংশে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে—

মোর এ শুষ্ক পাণ্ডু অধরে চুম্বন করো দান,
স্নায়ুতে শোণিতে আসুক বন্যা ভাঙিয়া সর্ব প্রাণ।
মন্থন করি অন্তর মোর হে অনুত্তম নাথ,
অর্পিয়ো তৃষা ওগো প্রাণাধিক দাও প্রসারিয়া হাত।

সেই লেখাই ('যাচনা') শেষ হচ্ছে শান্ত প্রার্থনার শান্তি-শ্রাবণ-ধারায়—

লও প্রভু লও করুণা করিয়া উদ্দেশে সঁপিলাম
মোর জগতের মলিন মাধুরী মরমের অভিরাম ;
দাও দাও তব মনের মহিমা রেণু-কণা-পরিমাণ
কান্ত-আঁখির অমৃতধারায় শান্ত হউক প্রাণ।

আবেগ ও স্থিরতার এই সমন্বয় করুণানিধানের কবিতাকে শুধু স্বতন্ত্রই করে নি, আকর্ষকও করেছে।

২

অনন্তের সন্ধানে মানবের যে যাত্রা সেখানে সে একা, নিঃসঙ্গ। আমাদের অনেকের মতো কবি করুণানিধানকেও একলা চলতে হয়েছে। পথের কাঁটাতে তাঁর চরণতল ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, তবু তিনি নিরস্ত হন নি। কামনা যেখানে প্রবল, প্রার্থনা ঐকান্তিক, সেখানে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে তো চলবে না। তাই নিজেকে তিনি যে প্রশ্ন করেছেন তারই মধ্যে উত্তর নিহিত রয়েছে—

প্রহেলিকার গোলকধাঁধায় ক্রোশের পরে ক্রোশ চলি,
রহস্যময় পরশমণি ভরবে কখন অঞ্জলি !
ঘোর বিপদের ছদ্মবেশে মঙ্গল আসে, ভয় কি তোর ?
সাধনপথের বিভীষিকায় শঙ্কা কিসের, আত্মা মোর ? ['চিরসুন্দর'

তিনি 'পণ করেছেন, আমাদের বরেণ্য পূর্বপুরুষদের অনুসৃত পথই তাঁর পথ। চিত্ত তাঁর ভয়শূন্য, উচ্চ তাঁর শির—

আমরা ভাগ্যবান্, দিক-অতীতের ওপারে ধ্বনিত অপৌরুষের গান।
দাঁড়ায়েছি গরীয়ান্, অন্ধকারের নিগূঢ় রন্ধ্রে বিদ্ধ জ্যোতির বাণ।
ধাই দিবা-শর্বরী, জনম হইতে জনমান্তরে অজেয় শকতি ধরি।

ভারত-সন্তানরূপে, অমেয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী-রূপে করুণানিধান অজেয় শক্তি ধারণ করেছেন এবং এই শক্তি তাঁর চলার পথের পাথেয়। 'মঙ্গল-গীতি' কবিতায় তিনি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক মহিমা কীর্তন করেছেন। তাঁর সমানধর্মা কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক এই অতীত ঐতিহ্যের গৌরবময়ী বাণী বারংবার স্মরণ করে প্রেরণা পেয়েছেন ; 'সোমনাথ'-মন্দিরের নব নব নির্মাণের মধ্যে ভারত-আত্মার চিরন্তনী সাধনাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ভারতের ধর্ম, ভারতের সংস্কৃতি থেকে করুণানিধান অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন, পেয়েছেন এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ। চরৈবেতি। পথ থেকে পথে, তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে তাঁর পরিক্রমা চলেছে। 'কুরুক্ষেত্রে, গয়া, গঙ্গায়, বারাণসী, পুষ্করে।' চলেছেন 'সেই পথে, যার 'পরে আলো না ফুরায়'। 'পদ্মা-তটে',—

'জানি নে যাত্রা কোন্‌খানে শেষ, কবে উত্তরিব সন্ধ্যার দেশ,
পূর্ণ পক্ব ফলের মতন, বৃন্তভ্রষ্ট টুটিবে জীবন, সকল বেদনা এড়াবে।'

যখন যেখানে যাচ্ছেন, একই লক্ষ্যে কবি রয়েছেন স্থির, অচঞ্চল। একই অন্বেষণ নিয়ে দেশে-বিদেশে, সমুদ্র-পাহাড়ে ঘুরেছেন, প্রবেশ করেছেন অরণ্য-গহনে। রূপতীর্থে তিনি অরূপকে খুঁজে ফিরেছেন। যে-পাওয়ার পর আর কোনো পাওয়াকেই বড় মনে হয় না সেই পরম পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর বুকে। পদ্মার তটে তাঁর নতুন অভিজ্ঞতার জন্ম হচ্ছে। রুদ্রের দারুণ দীপ্তিতে জীবনের নতুন রূপ উদ্ভাসিত হল। আগের স্বপ্নঘোর, তন্দ্রাজড়িমা এখন ছুটে গেছে—

সোনালী-সবুজ গাঙ্‌ভরা জল একূল-ওকূল করে টল্‌মল্—
মেঘ-রথে কারা করে আনাগোনা দুলায়ে উড়ায়ে তসর ওড়না
ভাঁজে ভাঁজে ছায়া জড়ায়ে।
ভাঙিল নিমেষে সে রঙমহল, নিবিল গোধূলি গোলাপ-পাটল ;
লুকোচুরি শেষ কিরণ হুরীর, মণির মিনার মেঘের পুরীর
কোথায় গেল রে মিলায়ে ?

করুণানিধান যেন কীট্‌সের 'Sleep and Poetry' কবিতার অবিস্মরণীয় ছবিকেই অভিনব সজ্জায় সাজিয়েছেন—

Yes, thousands in a thousand different ways
Flit onward—now a lovely wreath of girls
Dancing their sleek hair into tangled curls...
The visions all are fled—the car is fled
Into the light of heaven, and in their stead
A sense of real things comes doubly strong.

বাঙালী কবির 'sense of real things' অবশ্য অন্য সুরে ঝংকৃত। একটি ক্ষণমুহূর্তের জন্য দিব্য-অনুভূতি তাঁকে চেতনার নতুন স্তরে উন্নীত করে দিয়েছে—

ঢাকিল মসীতে মানস-কানন, যা-কিছু আছিল আঁখি-রঞ্জন—
আঁধারে বিধুর ধূ-ধূ করে মাঠ, কপিশ আকাশে উদাসীন ঠাট
কে আছে স্তব্ধ দাঁড়ায়ে।
ঘর্ঘর-ঘোষ বজ্রস্তনিতে লহর তুলিল সকল শোণিতে—
হেরিনু মূরতি ভীতি-ভঞ্জন, কণ্ঠে দোদুল হরিচন্দন
পরাগের ধূম উড়ায়ে।

এই 'পরম-ক্ষণ'টিতেই সারা জীবনের নিঃসঙ্গতার বেদনা এক নিমেষে ধুয়ে মুছে যায়। তখন মনে হয়—'একলা পথের যাত্রী, তবু আজ তো আমি নই একা।'

প্রেম ও আধুনিক কবি

অনাদি কাল থেকে প্রেম মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতির মর্যাদা পেয়ে এসেছে, তাই প্রেমই কাব্যের আদি রস। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর টমাস হার্ডি 'ইন্ টাইম্ অফ দ্য ব্রেকিং অফ নেশান্স' নামে একটি অনবদ্য কবিতা লেখেন ; তাতে কয়েকটি ছবি তিনি পর পর সাজিয়ে দেন। তা থেকে এই সত্য ফুটে ওঠে যে বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয়ের মধ্যেও মানুষের আদিম কর্মের কোনো বিরাম নেই। কৃষক ভূমির কর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে, প্রেমিকের মন আকৃষ্ট প্রেমাস্পদের দিকে।

এ যুগে আমরা মনে করতে পারি, আমরা প্রেমকে অনেক সূক্ষ্মভাবে অনুভব করছি, অনেক বিচিত্রভাবে প্রকাশ করছি, আধুনিক কবিতায় প্রেমের অভিব্যক্তি ব্যাপকতর ও গভীরতর। এ ধারণা পোষণ করার কিন্তু সঙ্গত কারণ নেই। আগেকার যুগেও প্রেম একই ভাবে মানুষের মনে সাড়া জাগিয়েছে ও কবির হৃদয়ে প্রেরণার সঞ্চার করেছে। 'প্রেমিক যে-জন ভালো সে বেসেছে আজি আমাদের মতো।' কবিও আমাদের কবির মতোই প্রকাশের ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। গর্বে আমরা যত ইচ্ছা নেচে বেড়াতে পারি, কিন্তু কালিদাসকে আমরা আজও হারাতে পারি নি। প্রেমের কবি রূপে তিনি এখনও অপরাজেয়। যে হরিণী ব্যাধকে চেনে না, তার যে বিদ্ধ হতে বিলম্ব লাগে না, এ কথা কালিদাসের মতো এমন মর্মস্পর্শীভাবে আর কে বলতে পেরেছে? আষাঢ়ের প্রথম-দিবসে আজও আমাদের মন কি স্বাধিকার-প্রমত্ত যক্ষের বিরহ-বেদনায় ব্যথাতুর হয়ে ওঠে না? 'বৈষ্ণব পদাবলী'তে প্রেমের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের যে-অপরূপ মিলন ঝংকৃত—যে-মিলন লাখ লাখ যুগ পরেও প্রেমিকের মনের ব্যাকুলতা ঘোচাতে পারে না—তারও কোনো তুলনা বিরল।

আমি বলেছি, কালিদাস অপরাজেয়। প্রশ্নটা অবশ্য জয়-পরাজয়ের নয়, ছোট-বড়রও নয়। কালিদাস ব্রাউনিঙের চেয়ে কত বড় বা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কত ছোট, এই ধরনের প্রশ্নের মীমাংসা সাহিত্যে করা যায় না, করার কোনো প্রয়োজনও নেই। টেনিস-খেলায় আমরা নাম্বার ওয়ান্, নাম্বার টু, ইত্যাদি শ্রেণী-বিভাগ স্বচ্ছন্দে করতে পারি, সাহিত্যে পারি না। আধুনিক কবিতার সার্থকতা বিচার করতে গিয়ে তাই সে কবিতা আগের যুগের কবিতাকে কি ভাবে 'পরাজিত' করেছে সে বিচার অর্থহীন।

কথা উঠতে পারে, আমরা দেখব আধুনিক কবি নতুন কি বলেছেন। নতুন তিনি কী-ই বা বলতে পারেন? শুধু বাণ নন, অনেক বড় কবিই আগে লিখে গেছেন

—'শত-শত-গীতি-মুখরিত বনবীথিকা।' সুতরাং এই সংসারের আর উচ্ছিষ্ট হতে বাকী রইল কী? তা ছাড়া সব কিছুরই তো পুনরাবৃত্তি ও পুনরাবর্তন দেখা যায়। 'The thing that hath been, it is that which shall be; and that which is done is that which shall be done: and there is no new thing under the sun.' (Ecclesiastes i. 9)

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু বৈশিষ্ট্য অবশ্য লক্ষ করা যায়, এবং সে বৈশিষ্ট্য আধুনিক কাব্যে প্রতিফলিত। আধুনিক কবির প্রবণতা বিশ্লেষণের দিকে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে জীবনের জটিলতা বেড়ে চলেছে। এই জটিলতায় আমরা যত জড়িয়ে পড়ছি তত সব কিছুর অর্থ খুঁজে পাওয়ার জন্য আমরা ব্যস্ত হচ্ছি, সব কিছু তলিয়ে দেখতে চাইছি। মানুষের মনের আনাচে-কানাচে ঢুকতে চাইছি। এর ফল সব সময় ভালো হচ্ছে না। যে-সব অশান্তি এড়ানো যেত, আমাদের অনুসন্ধিৎসা অনেক সময় সেগুলিতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। কীট্‌স্ দেড় শত বৎসর পূর্বে এই উপলব্ধিতে উপনীত হয়ে লিখেছিলেন,

It is a flaw
In happiness, to see beyond our bourn,—
It forces us in summer skies to mourn,
It spoils the singing of the Nightingale.

জর্জ মেরিডিথ্‌কে আমরা আধুনিক প্রেমের কবিতার ইতিহাসে অন্যতম পথিকৃতের সম্মান দিতে পারি, যদিও তাঁর 'মডার্ন লাভ্‌' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে। যে 'সীমানা অতিক্রমণ'-এর কথা কীট্‌স্ বলেছেন, সেই ভুল মেরিডিথের নায়ক-নায়িকাকে করতে দেখা যাচ্ছে। বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণ ছুরিকা দিয়ে তারা পরস্পরকে বিদ্ধ করছে, ফলে তাদের দাম্পত্য জীবনে বিরাট ফাটল ধরেছে; সুখের জন্য যে-ঘর তারা বেঁধেছিল, তাদের নিজেদের প্রজ্বলিত অনলেই সে ঘর দগ্ধ হচ্ছে—

Then each applied to each that fatal knife,
Deep questioning, which probes to endless dole.
Ah, what a dusty answer gets the soul
When hot for certainties in this our life!

মেরিডিথ প্রথমবার বিবাহ করেছিলেন মেরি এলেন্ নিকল্‌স্‌কে (ইনি ছিলেন ঔপন্যাসিক টমাস্ লাভ্‌ পীককের বিধবা কন্যা)। তিনি মেরিডিথের মনোবৃত্ত্যনুসারিণী না হওয়ায় তাঁদের মনোমালিন্য চলতে থাকে। দশ বছর চেষ্টার পরও তাঁরা নিজেদের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্যে আসতে না পারায় শেষ পর্যন্ত বিবাহবিচ্ছেদ মেনে নেন। মর্মস্পর্শী 'মডার্ন লাভ্‌' কাব্যের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি কবির অন্তর থেকে উৎসারিত।

প্রেমের কবিতায় মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী আমরা ইতিপূর্বে রবার্ট ব্রাউনিঙের কবিতায় পেয়েছি। ব্রাউনিঙকে হেন্‌রি জেমস্ 'tremendous and incom-

parable modern' রূপে দেখেছিলেন। ওআল্‌টার পেটারের কাছে তিনি ছিলেন 'the most modern, to modern people the most important of poets'। আধুনিক ইংরাজ কবিরা ডান্‌-এর কবিতাকে এই শতাব্দীতে নতুনভাবে 'আবিষ্কার' করেছেন। ডান্‌-এর কবিতার সঙ্গে ব্রাউনিঙের কবিতার সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। ব্রাউনিঙ ডানের মতো নাটকীয়তা পছন্দ করেন। এই নাটকীয়তা তাঁদের কবিতাকে নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত করেছে ও চিরকালের আধুনিকতায় নবীন করে রেখেছে। তাই ডান্‌-এর যে-পঙ্‌ক্তি দুটি রবীন্দ্রনাথকে দোলা দিয়েছিল তা তিনি 'শেষের কবিতা'তে রূপান্তরিত করেছেন—

'দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর,
ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর',

সেগুলির আকর্ষণ আজকের পাঠকদের কাছে অটুট রয়েছে। ডান্‌ তাঁর পাঠককে সজোরে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন, সঙ্গীতের মাদকতায় ঘুম পাড়িয়ে দিতে নয়। যে-প্রেমিকযুগল পরস্পরের কাছ থেকে দূরে রয়েছে তাঁদের যখন ডান্‌ কম্পাসের দুটি কাঁটার সঙ্গে তুলনা করেন তখন সে তুলনা আমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে 'সমকালীন' মনে হয়।

এই 'সমকালীন' সুর আমরা ব্রাউনিঙের কবিতাতেও বারংবার শুনি। তাঁর প্রেমের কবিতায় অন্তহীন বৈচিত্র্য। আনন্দের আতিশয্য থেকে গভীর বিষাদ —পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরীর স্বরগ্রামে ষড়্‌জ থেকে নিষাদ—এই তাঁর কবিতার সীমা। তীব্রতা এই কবিতার বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতার প্রচণ্ড শক্তিকে দার্শনিক স্যান্‌টায়ানা 'lava hot from the crater'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'এ সেরিনেড অ্যাট্‌ দ্য ভিলা', 'এ লাভার্স কোয়ার্ল', 'ইন্‌ থ্রী ডেজ'—প্রেমের বিভিন্ন দিক এই সব কবিতার বিষয়বস্তু। ব্রাউনিঙের আর কয়েকটি প্রেমের কবিতায় (যথা 'রেসপেক্‌টেবিলিটি', 'এ লাইট উম্যান্‌' এবং 'দ্য স্ট্যাচু অ্যাণ্ড দ্য বাস্ট') কবি একটি বিশেষ বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রেম একান্তভাবে দুটি নর-নারীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলেও প্রেমিকের জীবন সামাজিক পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সমাজের অনুশাসনের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

ডান্‌ ও ব্রাউনিঙের কাব্যের প্রভাব টমাস স্টার্নস্‌ এলিঅটের কবিতায় পরিস্ফুট। তাঁর কবিতায় প্রেম যখন এসেছে তখন নয়ন-ভোলানো হৃদয়-দোলানো রূপে কিংবা সঞ্জীবনী মন্ত্র নিয়ে আসে নি, বিধ্বংসী শক্তি-রূপেও আসে নি, এসেছে আধুনিক সভ্যতার অন্তঃসার শূন্যতা নিয়ে : not with a bang but a whimper। এই পথেই সে পৃথিবীর শেষ দিন ঘনিয়ে আসছে যে সমস্ত পৃথিবীটা 'পোড়ো জমি'র বেশি কিছু নয়। প্রেমিক, অ-প্রেমিক আমরা সকলেই 'ফাঁপা মানুষ'। এলিঅট অতৃপ্ত প্রেমের যন্ত্রণা নিয়ে লিখেছেন, লিখেছেন তৃপ্ত প্রেমের তীব্রতর যন্ত্রণা নিয়ে। তাঁর নায়ক জে. অ্যাল্‌ফ্রেড্‌ প্রুফ্রক্‌ হ্যামলেটের রোগে আক্রান্ত হয়েছে—শতবার দেখা গেছে সে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না, মতিস্থির করতে পারছে

না। তার চোখের সামনে যে-সন্ধ্যা বিস্তারলাভ করছে তাকে তার তন্দ্রালসা ও সোনার-আঁচল-খসা মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে

......spread out against the sky
Like a patient etherized upon a table.

নগ্ন-শুভ্র বাহু, নারীদেহের সৌরভ তাকে কিছুটা চঞ্চল করছে বটে, কিন্তু কোনো নারীর সান্নিধ্য একান্তভাবে পাওয়ার জন্য পুরুষের যেটুকু উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন সে উদ্যোগের তার নিতান্ত অভাব। বাস্তবের সম্মুখীন হওয়ার জন্য যে-সাহসের প্রয়োজন সেটুকু তার নেই। ব্রাউনিঙের চিত্রশিল্পী-নায়ক অ্যান্‌ড্রিয়া ডেল্‌ সার্টোর মতো সেও নৈতিক দিক্‌ থেকে কাপুরুষ।

যে-সব বিদেশী কবি এলিঅট্‌কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ফরাসী কবি শার্ল বোদ্‌লেয়ার অন্যতম। পাশ্চাত্ত্য জগতে বোদ্‌লেয়ারকে অনেক সময় 'আধুনিকতার জনক' অভিহিত করা হয়। তিনি রোম্যাণ্টিক বটেন আবার রোম্যান্স-বিরোধীও। ডান্‌ ও ব্রাউনিঙের কবিতায় যেমন, বোদ্‌লেয়ারের কবিতায়ও আমরা 'প্রেমের কুঞ্জের অনেক বাঁকা গলি-ঘুঁজি'র সন্ধান পাই। ল্যাটিন কবি কাটুল্যাস্‌ ঘৃণা ও প্রেমকে মেলাতে পেরেছিলেন ও ঘোষণা করেছিলেন 'Odi et amo'। আনন্দ ও আতঙ্কের সমন্বয়ে বিচিত্র হয়ে উঠেছে বোদ্‌লেয়ারের কবিতা। 'লে ফ্ল্যুর দ্য মাল্‌'-এর কথা লিখতে গিয়ে উগো যে 'frisson nouveau' ('অভিনব শিহরণ') উল্লেখ করেছেন বোদ্‌লেয়ারের প্রেমের কবিতা পাঠ করলে সে উপলব্ধি স্বাভাবিক। প্রিয়ার কেশ নিয়ে তিনি যে-কবিতা রচনা করেছেন ('La Chevelure') তাতে তিনি মানসীকে বিলাসিনী এশিয়া ও জ্বালাময়ী আফ্রিকার সঙ্গে তুলনা করেছেন, তুলনা করেছেন সুগন্ধ অরণ্যের সঙ্গে। তাঁর প্রিয়া মরূদ্যান, সেখানে কবি স্বপ্নের অবসর খুঁজে পেয়েছেন।

উইলিয়াম্‌ বাট্‌লার ইয়েট্‌স্‌-এর 'ক্রেজি জেন্‌ টক্‌স্‌ উইথ দ্য বিশপ' কবিতাটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। জেন্‌ পাগলী হতে পারে, পতিতা হতে পারে, কিন্তু যে কথা ইয়েট্‌স্‌ তার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই—

...Love has pitched his mansion in
The place of excrement.

প্রেম ও লালসাকে জেন্‌ পৃথক ভাবে দেখতে পারছে না—সুন্দর ও কুৎসিতের ব্যবধান স্বল্প। জৈব আকর্ষণ প্রেমের অন্যতম উপাদান। ডান্‌ তাঁর 'দি একস্টেসি' কবিতায় লিখেছেন—

Love's mysteries in souls do grow,
But yet the body is his book.

ব্রাউনিঙের ভাষায় আমরা বলতে পারি,

'মাটিতে থাকবে প্রেমের মূল,
আকাশে ফুটবে প্রেমের ফুল।'

(দিলীপকুমার রায়ের) অনুবাদ

তবে দেহকে যেমন অস্বীকার করার উপায় নেই, দেহকে সর্বস্ব মনে করারও কোনো সঙ্গত কারণ নেই। (ডি. এচ্. লরেন্স খানিকটা এই জাতীয় ভুল করেছিলেন।) সাম্প্রতিক কালের কোনো কোনো বাঙালী কবির আদিরসাত্মক কবিতা পড়লে ধারণা হতে পারে যে, জীবনের লক্ষ্য শুধু যথেচ্ছ সম্ভোগ, উদ্দাম দৈহিক সম্পর্ক। তাঁদের বাইবল্ হচ্ছে অ্যাল্‌ফ্রেড চার্লস কিন্‌সে-সম্পাদিত 'সেক্‌সুয়্যাল বিহেভিয়ার ইন্ দ্য হিউম্যান্ মেল্' এবং 'সেক্‌সুয়্যাল বিহেভিয়ার ইন্ দ্য হিউম্যান্ ফিমেল'। এই দুটি গ্রন্থে সম্পাদকদের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের বিচার কত মারাত্মক হতে পারে তাও দেখা যায়। এই রিপোর্ট দুটির বিরাট কলেবরের মধ্যে প্রচলিত-অপ্রচলিত, সরল-কঠিন, গ্রীক্-ল্যাটিন বহু শব্দের সমাবেশ হয়েছে, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র চার অক্ষরের ইংরাজী শব্দ—love, কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সৌভাগ্যক্রমে আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রেমের কবিতা শুধু ভোগবাদী বালখিল্যের দলই লেখেন নি। জীবনানন্দ দাশ একাধিক অপূর্ব প্রেমের কবিতা রচনা করেছেন। সে কবিতাগুলি পুরবী রাগিণীর মতো বিষণ্ণ, হেমন্ত-গোধূলির মতো ম্লান। জীবনানন্দ প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো বলতে পারেন নি—'মৃত্যু? / সে ত' ম'রে যায়!' মৃত্যুর নিয়ত পদধ্বনি সম্বন্ধে জীবনানন্দ সচেতন। মানুষগুলো ভূত হয়ে যাচ্ছে—আকাঙ্ক্ষার ভূত নিয়ে খেলছে। মুহূর্তের জন্য প্রেম আসে—তারপর চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়।

> একদিন-একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা।
> একরাত-একদিন করেছি মৃত্যুরে অবহেলা।
> একদিন-একরাত, তারপর প্রেম গেছে চ'লে। ('প্রেম')

'বনলতা সেন' কবিতায় প্রেমিকের ক্লান্ত হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাণী-রূপ পেয়েছে। প্রেমিকার চোখে তার মানসীর যে-মূর্তি ফুটে উঠেছে সে নারী অর্ধেক মানবী, অর্ধেক কল্পনা। অতীত-বর্তমান একাকার হয়ে গেছে। আধুনিক কবিতায় এমন রমণীয় রোম্যান্টিক সুর বাঙ্‌লা কাব্যে বেশী শোনা যায় নি। নজরুল ইসলামের কবিতা অনেক সময় বেশি সেন্‌টিমেন্‌ট্যাল। জীবনানন্দের কবিতা মোটামুটি এ ত্রুটি থেকে মুক্ত।

সঙ্গতি ও সুষমার জন্য ব্যগ্র অমিয় চক্রবর্তী প্রেমের মধ্যে মুক্তি চেয়েছেন। 'সব থেকে শ্রেষ্ঠ ভাষা সে ভাষা প্রেমের।' (এ যেন ব্রাউনিঙের 'Love is best'-কে ভাষান্তরিত করা হয়েছে।) প্রিয়ার সঙ্গে তিনি বারবার মিলিত হতে চেয়েছেন—বারবার বিচ্ছেদ দু-জনের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছে। এই বিচ্ছেদকে কবি মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেন নি, কবিগুরুর মতো বলতে পারেন নি—'চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন / চিরবিচ্ছেদ করি জয়।' কিংবা এই ভেবে সান্ত্বনা পান নি—'প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু স্বল্পক্ষণ / প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন।' চিরবিরহী হয়েও

তিনি 'সঙ্গমবিরহবিকল্পে' বিরহকে বরণীয় বলে মনে করতে পারছেন না। তাই তাঁর শেষ প্রশ্নের মেলে নি উত্তর—

হৃৎপিণ্ডে রক্তের ধ্বনি যেখানে মনের শিরা ছিঁড়ে
যাত্রী চলে গেল পথে কোটি ওক্লাহোমা পারে লীন,
রক্ত ক্রুশে বিদ্ধ ক্ষণে গির্জে জ্বলে রাঙা সে তিমিরে—
বিচ্ছেদের কল্পান্তরে প্রশ্ন ফিরে আসে চিরদিন।
ফিরে আসে চিরদিন ॥ ('ওক্লাহোমা')

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'শাশ্বতী' মূলত রোম্যান্টিক। দেহ ও দেহাতীতের সুন্দর সমন্বয় এ কবিতার বৈশিষ্ট্য। আর্নেস্ট ডাউসন্ তাঁর প্রিয়াকে নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন, I have been faithful to thee, Cynara! in my fashion। সুধীন্দ্রনাথের ভাগ্যলিপি ভিন্ন। তাঁর মানসী সাইনারার মতো একনিষ্ঠ নয়। 'আজ সে কেবল আর কারে ভালোবাসে।' ক্ষণিকার জন্য কবির রয়েছে শাশ্বত প্রেম তাই সে চিরন্তনীও বটে—

স্মৃতি-পিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
আমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা ;
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।

'শেষের রাত্রি' কবিতায় বুদ্ধদেব বসু তাঁর মানসীর চুলের আঁধারে হারিয়ে গেছেন। তিনি সেখানে 'অন্ধকার বিদিশার নিশা' খুঁজে পান নি, খুঁজে পেয়েছেন অনন্ত বাসনা। চুলের ঝড়ে ঘোড়সওয়ার হওয়ার উন্মাদক কামনায় তিনি অস্থির।* কঙ্কাকে তিনি তাই বারংবার শঙ্কা ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের প্রেমের তীব্রতা কালের নিত্য-উধাও রথের যাত্রাকেও থামিয়ে দিতে পারবে এই অহংকারে কবি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছেন—

এসো চ'লে এসো, যেখানে সময় সীমানাহীন,
সময়-ছিন্ন বিরহে কাঁপে না রাত্রিদিন।
সেখানে মোদের প্রেমের সময় সময়হীন
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।

'চিল্কায় সকাল' কবিতায় কালেরই শুধু পরিবর্তন হয় নি, সুরেরও। উন্মাদনা এখানে স্তব্ধ, চিত্ত ভাবস্থির।

যাঁদের অনেক সময় পঞ্চাশের কবি-রূপে বর্ণনা করা হয় তাঁরাও অনেকে প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁরা ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেন নি, অনুসরণ করেছেন্। রবীন্দ্র-রস-সিক্ত হয়েও সিদ্ধেশ্বর সেনের প্রেমের কবিতা নিজস্ব মাধুর্যে স্নিগ্ধ—

হরিণী-হাওয়ার মত তুমি,
চকিত চোখের ছায়া মেলে,

কাঁদায়ে মনের বনভূমি,
ঘুমের মেঘের মেয়ে এলে !

শান্তিকুমার ঘোষের কবিতা সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে। প্রাচীন ভারতীয় কাব্য ও রবীন্দ্রনাথের রচনা আত্মসাৎ করেও তিনি নিজস্ব মনোরম কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন :

দিনের সংগ্রামে ক্লিষ্ট সমতল থেকে প্রাণ
চায় আজ পাহাড়ের ছায়া, ঝর্ণার অবাধ খুশি, কাছের আকাশ।
মন্থর মেঘের রাশি বেদনার স্পর্শে ছিলো তারুণ্যের দিনগুলি—
তোমার দাক্ষিণ্যে হোলো দীপ্ত বেগবান।

এই পদলালিত্য আমরা অরবিন্দ গুহের প্রেমের কবিতাতেও পাচ্ছি। তিনি 'উচ্চ থেকে উচ্চে কণ্ঠ তোলায়' বিশ্বাসী নন, তাঁর 'বিনীত কণ্ঠস্বর' তাঁর রচনাকে কমনীয় করে তুলেছে—

গ্রীষ্মদুপুরে তৃষ্ণা ছড়িয়ে চলো
আমাকে জ্বালিয়ে তুমি আরো বেশী জ্বলো,
তুমি সরোবর জলে-জলে ছলো-ছলো—
তুমি স্বপ্নের স্বর্গের স্বাক্ষর।

এই কবিরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের কাছে সমধিক ঋণী। রবীন্দ্রনাথের রচনাকে আধুনিক বাঙ্লা কাব্যের উৎসরূপে বর্ণনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রকাব্যে যুগ-ধর্মের সঙ্গে শাশ্বতিকের অভিনব সমন্বয় ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের যুগকে অতিক্রম করে কালান্তরের সূচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে প্রেমের অপরূপ অভিব্যক্তি আজও বিশ্বসাহিত্যের বিস্ময়। আশ্চর্য মিতভাষণ ও ব্যঞ্জনার জন্য 'পরশের সত্য পুরস্কার / খণ্ডিয়া দিয়াছে দোষ মিথ্যা সে নিন্দার' কিংবা 'রাতের সব তারাই আছে / দিনের আলোর গভীরে' আধুনিক প্রেমের কবিতার যে-কোন পঙ্ক্তি থেকে আধুনিকতর।

খ্রীস্টীয় ল্যাটিন সাহিত্য

খ্রীস্টধর্ম যখন রোমানদের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, তত দিনে রোমক সাহিত্যের সুবর্ণযুগ তো কেটে গেছেই, রজত-যুগও অতীত। তবু প্রথম যুগের খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেক বড় লেখক রয়েছেন। চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে মহাপ্রাণ কন্‌স্টান্‌টাইনের আমলে খ্রীস্টধর্ম প্রথম সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু এর অনেক আগে থাকতেই ল্যাটিন সাহিত্যে ভালো খ্রীস্টীয় রচনার সূত্রপাত হয়েছে (২০০ খ্রীস্টাব্দের আগেই)।

মার্কাস্‌ অরিলিআসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী কমাডাসের রাজত্বকালে (১৮০-৯২ খ্রীস্টাব্দ) যে-খ্রীস্টীয় সাহিত্যের সূচনা হয়, তার দুটি প্রধান শাখা। একদিকে আফ্রিকার গোষ্ঠী, নতুন ল্যাটিন এঁদের লেখার বাহন; অন্য দিকে ইতালীয় গোষ্ঠী, এঁরা প্রাচীন রীতিতে খ্রীস্টীয় রচনা লিখেছেন। প্রথমোক্তদের লেখার সঙ্গে আপিলিউআসের শৈলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। শেষোক্তরা কুইন্‌টিলিয়ান্‌ ও তাঁর শিষ্যদের অনুবর্তী; সিসারোর প্রভাবের দ্বিতীয় পর্যায় এঁদের মধ্যে লক্ষণীয়। প্রথম গোষ্ঠীর লেখক টের্টিউলিআনের রচনা ও দ্বিতীয় গোষ্ঠীর লেখক মিনিউকাস্‌ ফেলিক্সের রচনার তুলনামূলক পাঠে এই বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য সহজেই প্রতীয়মান হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে আফ্রিকান্‌ রীতিরই প্রাধান্য ছিল, যদিও ক্রমশ এই শৈলীর প্রথম দিকের রুক্ষতা অন্তর্হিত হয়। শেষ পর্যন্ত চতুর্থ শতাব্দীর শেষে অগাস্‌-টিনের লেখায় দুই শৈলীর সমন্বয় দেখা যায়।

মিনিউকিয়াস্‌ ফেলিক্স সম্ভবত দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের বা তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকের লেখক। তাঁর জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর দর্শন মূলক কথোপকথন, 'অক্টেভিআস্‌', রোমের বন্দর অস্‌টিআর পটভূমিকায় রচিত, এবং খ্রীস্টধর্মের স্বপক্ষে যে-সব রচনা লেখা হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এটি বিতর্কমূলক আলোচনা হলেও বেশ সুখপাঠ্য। খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিত অক্‌টেভিআস্‌ ও মিনিউকাস্‌ এবং শিক্ষিত পৌত্তলিকদের মুখপাত্র রোমক আইন-জীবী কাএকিলিআসের কথাবার্তা এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। নেতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে খ্রীস্টধর্মের উপর কাএকিলিসাসের আক্রমণ অক্‌টেভিআস্‌ প্রতিহত করেছেন। খ্রীস্টানদের আচরণের বিরুদ্ধে যে-সব কুৎসা সাধারণত রটনা করা হত অক্টেভিআস সেগুলির প্রতিবাদ করেছেন ও শেষ পর্যন্ত কাএকিলিআস্‌কে তিনি ধর্মান্তরিত করতে পেরেছেন। রোমক জগতে খ্রীস্টধর্মের প্রসারের ফলে তখনকার শিক্ষিত

মনে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার খানিকটা ধারণা আমরা এই রচনা থেকে পাচ্ছি।

টের্টিউলিআন্ ফেলিক্সের সমসাময়িক লেখক। তিনি আফ্রিকার অধিবাসী (সম্ভবত ফেলিক্সও তাই ছিলেন)। স্বাভাবিক, সহজ চরিত্রের মানুষ টের্টিউলিআন্ নন। রুদ্র তেজ ও বিদ্রূপের দিকে প্রবণতা তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। খ্রীস্টান হবার আগে আইনজীবীরূপে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। ধর্মান্তরিত হবার পর প্রথম দশ বছর তিনি ছিলেন খ্রীস্টধর্মের অন্যতম প্রবক্তা। তারপর তিনি প্রচলিত খ্রীস্টধর্ম পরিত্যাগ করে অনাচারী মন্টানি-সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। তাঁর যে-সব রচনা এখনও পাওয়া যায় তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে প্রত্যয়সিদ্ধ ভাষণ 'অ্যাপোলোগেটিকাস্'। এটিকে 'প্রাচীন যুগের মহত্তম ভাষণ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এতে রোমক রাজ্যপালদের কাছে সহজবোধ্য ভাষায় খ্রীস্টধর্মের প্রশস্তি কীর্তন করা হয়েছে। অবশ্য সমর্থনের চেয়ে আক্রমণের অংশই বেশি জোরালো হয়েছে। টের্টিউলিআনের কঠোরতার আদর্শের মধ্যে কোনো খাদ নেই। পরবর্তী কালের খ্রীস্টান যোগী, সন্ন্যাসী ও প্রাণোৎসর্গীদের কৃচ্ছ্র জীবনধারার সূচনা এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

টের্টিউলিআনের রচনাবলীর মধ্যে একত্রিশটি এখনও প্রচলিত আছে। 'আত্মার সাক্ষ্য'তে তিনি ভগবানের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। 'প্রাণোৎসর্গীদের প্রতি' একাগ্রতার বাণী বহন করেছে। 'নারীদের পোশাক সম্পর্কে' রচনার মধ্যে আমরা দেখছি দৈনন্দিন ও ঘরোয়া জীবনের খুঁটিনাটিও খ্রীস্টধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। 'এক বিবাহ'তে একাধিক বিবাহের নিন্দা করা হয়েছে।

টের্টিউলিআনের রচনা থেকে অলঙ্কারবহুল ভাষার প্রচলিত রীতি সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র বাক্যের দিকে তাঁর প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। ফলে তাঁর ভাষায় অনেক সময় অভিনব ব্যঞ্জনা এসে পড়েছে। (এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, টের্টিউলিআন্ ল্যাটিন ভাষার শব্দভাণ্ডারে অনেক নতুন শব্দ সংযোজন করেছেন।) প্রশ্ন ও তার সংক্ষিপ্ত উত্তর, বিরোধাভাস ও শ্লেষ-অলঙ্কার ইত্যাদির প্রয়োগ টের্টিউলিআনের ভাষায় প্রায়ই দেখা যায়; অর্থগৌরবের জন্য কোনো কোনো সময় তাঁর রচনা দুর্বোধ্য মনে হয়। তবে খ্রীস্টীয় ল্যাটিন সাহিত্যে তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে।

চতুর্থ শতকের মহত্তম খ্রীস্টীয় লেখক ল্যাক্টান্টিআস্। টের্টিউলিআন্ শেষের দিকে পৌত্তলিক গ্রীস ও রোমের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। ল্যাক্টান্টিআস্ কিন্তু বিশ্বাস করতেন খ্রীস্টধর্মের প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির জন্য পৌত্তলিক অতীত থেকে অনেক কিছু আহরণ করা যেতে পারে। খ্রীস্টীয় নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি সিসারোর মানবিকতার সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তাঁর রচনাশৈলীর সৌষ্ঠবেও সিসারোর প্রভাব দৃষ্ট হয়। একাধিক অর্থে তাই তাঁকে 'খ্রীস্টীয় সিসারো' বলা যায়। রেনেসাঁস্ বা নবজাগৃতির যুগে এই ধরনের সমন্বয় সম্ভব হয়েছিল, সেজন্য এই সময় ল্যাক্টান্টিআস্-রচিত গ্রন্থ খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে (অবশ্য মধ্যযুগেও ল্যাক্টান্টি-

আসের জনপ্রিয়তা কম ছিল না।) তাঁর রচনার মধ্যে 'অত্যাচারীদের মৃত্যু' ও 'ঐশ্রী উষ্মা'র উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ফিনিক্স পাখী' কবিতাও সম্ভবত তাঁর রচনা।

গল্‌-দেশীয় সন্ত অ্যাম্‌ব্রোস্ (জন্ম আ. ৩৩৯ খ্রীস্টাব্দে) মিলান্-নগরীর ধর্মযাজক পদে বৃত হয়েছিলেন। সন্ত অগাস্‌টিনের উপর তাঁর গভীর প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। স্বাধীনচেতা অ্যাম্‌ব্রোস গির্জার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করতেন ও রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে গির্জার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁকে মধ্যযুগের অন্যতম স্রষ্টা বলা যেতে পারে। 'ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে' তাঁর একটি মূল্যবান্ রচনা। অ্যাম্‌ব্রোসের ঘনসন্নদ্ধ অথচ সরল শৈলী বাগ্মীসুলভ দৃঢ়তা ও কাব্যসৌন্দর্যে পূর্ণ; অন্যান্য প্রাচীন রচনার, বিশেষ করে ভার্জিলের লেখার, বহু পরোক্ষ উল্লেখও রয়েছে। গদ্য ছাড়া স্তোত্র-রচনাতেও অ্যাম্‌ব্রোস্ সিদ্ধহস্ত। 'দিনের আলোর শেষে' স্তোত্রটিতে তিনি ঈশ্বরের কাছে শয্যাসান্নিধ্য প্রার্থনা করেছেন।

থেসালোনিকায় ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী পরাক্রান্ত সম্রাট্ থেওডোসি-আস্‌কে তিরস্কার করার মতো মানসিক শক্তি ও সাহস অ্যাম্‌ব্রোসের ছিল; তিনি সম্রাট্‌কে প্রায়শ্চিত্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সম্রাট্‌কে লেখা এক চিঠিতে তিনি লেখেন—

'আপনি মানুষ, প্রলোভনের দ্বারা আপনি আক্রান্ত হয়েছেন। একে জয় করুন। শুধু অশ্রু ও অনুতাপের দ্বারাই পাপকে পরাভূত করা চলে। দেবদূত বা দেবদূতশ্রেষ্ঠের পক্ষেও এ সম্ভব নয়। ভগবান্ স্বয়ং—একমাত্র যিনি আমরা পাপ করার পরে বলতে পারেন, "আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি"—তাদেরই শুধু ক্ষমা করেন যারা অনুতপ্ত।

আমি আপনাকে সনির্বন্ধভাবে অনুরোধ করছি, অনুনয় করছি, মিনতি করছি, সাবধান করছি, কারণ এটা আমার কাছে গভীর পরিতাপের বিষয় যে আপনার মতো যিনি পরমপুণ্যনিলয়, যাঁর করুণা সর্বজনবিদিত, একক অপরাধীদেরও যিনি বিপদে ফেলেন না, এতজন লোকের মৃত্যুর জন্য তাঁর কোনো দুঃখ বা উদ্বেগ নেই।'

শেষ পর্যন্ত সম্রাট্ সন্ত অ্যাম্‌ব্রোসের বশ্যতা স্বীকার করেন। এতে গির্জার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অনেক বৃদ্ধি পায়।

আউসোনিআস্ (আনুমানিক ৩০০—আ. ৩৯৬ খ্রীস্টাব্দ) বর্দো-নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও পরে সেখানে অধ্যাপনা করেন। তাঁকে শেষ ল্যাটিন ও প্রথম ফরাসী কবি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্রাট ভ্যালেন্টিনিআন্ তাঁর পুত্র গ্রাটিআনের শিক্ষক হবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। আউসোনিআস্ মূলত কবি; তাঁর লেখা বেশ লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাঁর অধিকাংশ লেখাতেই অলঙ্কারের বাহুল্য আছে। বিভিন্ন প্রকারের ছন্দের প্রয়োগে তাঁর স্বভাবসুলভ নৈপুণ্য দেখা যায়। মোসেল্-নদীর দীর্ঘ ও মনোগ্রাহী বর্ণনা দিয়ে তিনি যে-কবিতা লেখেন সেটিকেই সাধারণত তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা গণ্য করা হয়। তাঁর ভাষা ধ্রুপদী ঢঙের,

কিন্তু ভূদৃশ্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ অনেকাংশে রোম্যান্টিক। তাঁর পত্নীর উদ্দেশে একটি কবিতায় তিনি লেখেন—

'প্রিয়তমা, যেভাবে আমরা এত দিন কাটিয়েছি সেইভাবেই আমরা যেন বাঁচতে পারি; প্রথম পরিণয়ের মুহূর্তে যে-নামে আমরা পরস্পরকে ডেকেছি সে-নাম যেন আমরা ধরে থাকতে পারি। কাল যেন আমাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন না আনতে পারে, আমি যেন তোমার নওলকিশোরই থাকতে পারি, আর তুমি আমার বালিকা-বধূ।...কোনো দিনই বার্ধক্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যেন না ঘটে; বছরগুলি গণনা করার প্রয়োজন নেই, তাদের প্রতিটির যা উপহার তা যেন আমরা গ্রহণ করতে পারি।'

'দিনপঞ্জী' কবিতায় আমরা আউসোনিয়াসের দৈনন্দিন জীবনের পরিচয় পাই। পাখির ডাকে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়, তারপর তিনি তাঁর ভৃত্যকে পোশাক ও জল নিয়ে আসতে বলেন। ধূপ-ধুনা-আগুন এসবের তাঁর প্রয়োজন নেই; এই সব পৌত্তলিক উপচার ছাড়াই তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে পারবেন।

পলিনাস (জন্ম আ. ৩৫৩ খ্রীস্টাব্দে) তদানীন্তন রোমক জগতের সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও অভিজাত পরিবারগুলির একটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ধনসম্পত্তি ছিল অগাধ, তাঁর পত্নী থেরাসিআও ছিলেন ঐশ্বর্যশালিনী। পলিনাস আউসোনিআসের ছাত্র ছিলেন এবং আশা করা গিয়েছিল তিনি পার্থিব জগতে প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জন করবেন কিন্তু হঠাৎ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করার পরে তিনি প্রতিষ্ঠার আশায় জলাঞ্জলি দেন এবং তিনি ও তাঁর পত্নী সমস্ত সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ করেন। এই সংবাদে স্বভাবতই অশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এমন কি, নামে মাত্র খ্রীস্টান আউসোনিআস্ চিঠির মাধ্যমে তাঁকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন। এর পরেও পলিনাস্ তাঁর সংকল্প থেকে বিচ্যুত হন নি, যদিও প্রাক্তন শিক্ষাগুরু ও অন্তরঙ্গতম সুহৃদের প্রতি তাঁর দরদ ও কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। তাঁর একটি কবিতায় তিনি লেখেন—

'জীবনে যত রকম পরিবর্তনই আসুক না কেন, ভাগ্যচক্রের সব আবর্তনের মধ্যেও যতদিন এই দেহপিঞ্জরে আমি আছি, তত দিন, তোমার আমার মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর ব্যবধান থাকলেও আমি তোমাকে ধরে থাকব, সমস্ত শিরা-উপশিরার সঙ্গে জড়িয়ে।'

সন্ত ও প্রাণোৎসর্গীদের বন্দনামূলক রচনার প্রবর্তক পলিনাস্। প্রথম খ্রীস্টীয় বিবাহ-স্তোত্র পলিনাস্ই রচনা করেন; বিয়োগ-ব্যথায় খ্রীস্টীয় সান্ত্বনা-গাথার প্রথম রচয়িতাও তিনি (এটা অবশ্য প্রচলিত রীতিতে লেখা হয়েছিল)।

আদিযুগের খ্রীস্টীয় কবিদের মধ্যে প্রুডেন্‌শিআস্ (জন্ম ৩৮৪ খ্রীস্টাব্দে) শীর্ষস্থানীয়। অহং-ভাবও তাঁর মধ্যে সবার চেয়ে কম। (দান্তে তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদা কেন দেন নি সেটা দুর্বোধ্য।) আইন-ব্যবসায়ে কিছু দিন লিপ্ত থাকার পরে তিনি দেবসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন ও ধর্মমূলক কবিতা রচনায় মনোনিবেশ

করেন। প্রুডেন্‌শিআসের সমসাময়িক ও পৌত্তলিক যুগের শেষ বড় ল্যাটিন কবি ক্লডিয়ান্‌-এর সঙ্গে প্রুডেন্‌শিআসের বৈসাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। এঁরা দু'জনেই অগস্‌টীয় যুগের লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। শব্দচয়নে ও ছন্দপ্রয়োগে প্রুডেন্‌শিআসের উপর হরেসের প্রভাব স্পষ্ট কিন্তু কবিতার বিষয়বস্তুর প্রতি প্রুডেন্‌শিআসের নিষ্ঠা তাঁর কবিতাকে পরবর্তীকালের পাঠকদের কাছে অনেক বেশি রমণীয় করে তুলেছিল।

প্রুডেন্‌শিআসের দু'টি দীর্ঘতম রচনা হচ্ছে 'ক্যাথেমেরিনন্‌' (দিনের বিভিন্ন সময়ের জন্য খ্রীস্টীয় স্তোত্রের চয়ন) ও 'পেরিস্‌টেফানন্‌' বা 'প্রাণোৎসর্গীদের মালা' (উল্লেখযোগ্য প্রাণোৎসর্গীদের মৃত্যুর বিবরণ)। ল্যাটিন ভাষায় গীতিকবিতার ক্ষেত্রে হরেসের পরে প্রুডেন্‌শিআসের দানই সর্বাধিক। তাঁকে খ্রীস্টীয় হরেস' বলা হয়; অবশ্য তাঁকে 'খ্রীস্টীয় লুক্রিশিআস্‌'ও বলা হয়ে থাকে।

তবে প্রুডেন্‌শিআস্‌ একাধারে 'খ্রীস্টীয় ভার্জিল'ও বটেন। তাঁর 'হৃদয়দ্বন্দ্ব,' প্রথম উল্লেখযোগ্য খ্রীস্টীয় রূপক, মধ্যযুগের বহু লেখক ও শিল্পীর প্রেরণার উৎস। অন্তর্দ্বন্দ্বকে এই কাব্যে মহাকাব্যোচিত কয়েকটি সংগ্রামে রূপায়িত করা হয়েছে। 'প্রাণোৎসর্গীদের মালা'র চোদ্দটি কবিতার মধ্যে মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের প্রচলিত রীতির সমন্বয় পরবর্তীকালের গাথাসঙ্গীতের সূচক।

একটি প্রভাতসঙ্গীতে প্রুডেন্‌শিআসের অন্তরের ভক্তি উৎসারিত হয়ে উঠেছে—

বিভ্রান্তি ও আতঙ্কের মূলে সর্বনাশী
নিশাচর যত আঁধার ও মেঘের রাশি,
দূরে সরে দাঁড়া; আকাশেতে প্রভাতের বাঁশী,
আলো পড়ে ঝরে, দাঁড়ায়েছে খ্রীস্ট আজি আসি।

খ্রীস্টীয় ল্যাটিন লেখকগণের মধ্যে মহত্তম যাঁরা, সন্ত জেরোম্‌ (আ. ৩৪৮-৪২০ খ্রীস্টাব্দ) তাঁদের একজন। রোমক সাহিত্যের প্রাচীন যুগের প্রতি তাঁর অনুরাগ এত গভীর ছিল যে, তিনি যৌবনে স্বপ্ন দেখেছিলেন, ঈশ্বরের সিংহাসনের কাছে বলা হল তিনি খ্রীস্টপন্থী নন, সিসারোপন্থী। অসীম ছিল তাঁর কর্মশক্তি, দৃপ্ত তেজ ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ক্রোধ ও অনুরাগ, দুই-ই ছিল চড়া সুরে বাঁধা।

জেরোমের চিঠিগুলি থেকে অনেক কিছু জানা যায়। তাঁর 'ইতিবৃত্ত' ঐতিহাসিকদের কাছে বিশেষভাবে মূল্যবান্‌। কিন্তু পরবর্তী সমস্ত যুগকে তিনি তাঁর যে-গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত করেছেন সেটি হচ্ছে 'ভাল্‌গেট্‌'—ল্যাটিন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ। মথি-লিখিত সুসমাচারের উপর তাঁর টীকার নিম্নলিখিত উক্তিতে বাইবেলের প্রতি তাঁর অনুরাগ বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে—'সুসমাচারের উপদেশগুলিতে শব্দের সঙ্গে মর্মের সর্বদাই যোগ রয়েছে; যেটাই প্রথম-দৃষ্টিতে নির্জীব মনে হয়, একবার তুমি যদি স্পর্শ করো, প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে।'

খ্রীস্টীয় ল্যাটিন লেখকদের মধ্যে যাঁর আসন সর্বোচ্চে তিনি সন্ত অগাস্‌টিন (৩৫৪-৪৩০ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁর মতো প্রতিভাশালী লেখক সমগ্র ল্যাটিন সাহিত্যে

কমই আছেন। তাঁর জন্ম উত্তর আফ্রিকায়, তাঁর বাবা প্যাট্রিকিআস্ ছিলেন পৌত্তলিক, কিন্তু তাঁর মা মণিকা ছিলেন খ্রীস্টান। বত্রিশ বছর বয়সে অগাস্টিন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। অগাস্টিন্ ছিলেন সুপণ্ডিত; তিনি প্রথমে কার্থেজে ও পরে মিলানে অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। মিলানেই তিনি সন্ত অ্যাম্‌ব্রোস্ দ্বারা প্রভাবিত হন। অনেকদিন ধরে তিনি এমন এক ধর্মের সন্ধান করছিলেন যেটা তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করতে পারবে, বিশেষ করে অমঙ্গলের অস্তিত্বের ব্যাপারে। যে-অন্তর্দ্বন্দ্বের উত্তরণে প্রথমে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ও পরে তাঁর বাসনা খ্রীস্টধর্মে শান্তি খুঁজে পেয়েছিল তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা অগাস্টিন তাঁর 'স্বীকারোক্তি'তে দিয়েছেন।[১] এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরের উদ্দেশে সন্ত অগাস্টিনের বিশ্ব-বিশ্রুত উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে—

'তুমি আমাদের তোমার জন্যই সৃষ্টি করেছ, আর আমাদের হৃদয় শান্তি পেতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার মাঝে সে তার বিরাম খুঁজে পাচ্ছে।' (Fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te.'— 'স্বীকারোক্তি', প্রথম খণ্ড, প্রথম অধ্যায়।)

অগাস্টিনের জীবনে ব্যক্তিগত প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে তাঁর মা মণিকার। অগাস্টিনের ধর্মান্তর গ্রহণের অল্প কিছুদিন পরেই মণিকার মৃত্যু হয়। অগাস্টিনের লেখা তাঁর জননীর অন্তিম দিনগুলির বিবরণ ল্যাটিন সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ্। অগাস্টিন আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন করেন ও যখন হিপো বন্দর পরিভ্রমণে যান তখন সেখানকার অধিবাসীরা জোর করে তাঁকে সেখানকার ধর্মযাজকের পদে প্রতিষ্ঠিত করে (সেখানে একজন ধর্মযাজক ইতিপূর্বেই ছিলেন)।

এর পরে অগাস্টিন আফ্রিকান গির্জার অবিসংবাদিত অধিনায়করূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর রচনার প্রাচুর্য তাঁর নিজের যুগে ও পরবর্তীকালে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। নতুন রূপ ও নতুন প্রকাশভঙ্গীর প্রবর্তন করে অগাস্টিন ল্যাটিন ভাষার যে নব-কলেবর দান করেন তা মধ্যযুগের খ্রীস্টধর্মের পক্ষে যথোপযুক্ত হয়েছিল। প্রাচীন সাহিত্য ও মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যে অগাস্টিনই ছিলেন যোগসূত্র।

অগাস্টিনের রচনাবলীর মধ্যে 'ঐশী নগরী' ও 'স্বীকারোক্তি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলির জনপ্রিয়তা এখনও অটুট রয়েছে। প্রথমোক্ত গ্রন্থটিতে খ্রীস্টান সমাজের আদর্শ ও বাস্তব-সম্পর্কিত গভীর আলোচনা রয়েছে। 'স্বীকারোক্তি' বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনমূলক গ্রন্থের অন্যতম। সরল, অনাড়ম্বর সত্যভাষণে লেখক নিজের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবন পাঠকের কাছে অনাবৃতভাবে তুলে ধরেছেন। অন্তরের গহনে স্বার্থের সংঘাত, ভালো ও মন্দের নৈতিক দ্বন্দ্ব, ঐশী প্রেমের জন্য

১ 'তখন আমি সেই মহামূল্য মুক্তার সন্ধান পেয়েছি যেটা আমার সর্বস্বের বিনিময়ে আমার কেনা উচিত ছিল, কিন্তু আমি ইতস্তত করেছিলাম।' 'স্বীকারোক্তি', অষ্টম খণ্ড, প্রথম অধ্যায়।

চিত্তের আকৃতি—অগাস্টিনের আত্মজীবনীতে এ সব-কিছুই প্রতিবিম্বিত। জীবনের পথে তাঁর যাত্রার মধ্যে বিশ্বমানবের পথ চলার সুর তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে।

এই সুর বোইঠিআস্‌ও (আ. ৪৭৫-৫২৫ খ্রীস্টাব্দ) ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁর 'দর্শনের সান্ত্বনা' গ্রন্থে। কারান্তরালে মৃত্যুর প্রতীক্ষারত অবস্থায় এই অমর গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। পরবর্তী কালের লেখক ও দার্শনিকদের উপর এই গ্রন্থের প্রভাব অপরিসীম। ঐতিহাসিক গিবন্‌ যথার্থই মন্তব্য করেছেন—'a golden volume not unworthy of the leisure of Plato or of Tully'।

কবিগুরু দান্তে

Onorate l'altissimo poeta. *Inferno*, iv. 80
'শ্রেষ্ঠ কবিকে শ্রদ্ধা জানাও।'

পাশ্চাত্ত্য জগতের যে-তিনজন সাহিত্যিক মানুষের মনে সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগাতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে ইতালির কবি-সার্বভৌম দান্তে অন্যতম্। হোমার প্রতীচীর আদি কবি; তাঁর রচনার অবাধ বিস্তার ও মর্মস্পর্শী আবেদন দান্তের রচনায় পাওয়া যায় না। শেক্স্পিয়রের অন্তহীন বৈচিত্র্যও দান্তের কাব্যে দুর্লভ। কিন্তু দান্তের অর্থগৌরব ও গভীরতা তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি 'কমেদিয়া'কে (যা 'দিভাইনা কমেদিয়া' নামে সুপরিচিত) এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

চতুর্দশ শতাব্দীতে 'কমেদিয়া'র বহুল পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল; এর সম্বন্ধে বহু টীকা ও সমালোচনাও লেখা হয়েছে। তারপর কিছুদিন ক্ষীয়মাণ থাকার পরে 'কমেদিয়া'র খ্যাতি আবার বাড়তে থাকে ও উনবিংশ শতাব্দীতে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়। সে খ্যাতি আজও অম্লান। পরবর্তী কালে দান্তের প্রভাব যথেষ্ট পড়েছে, বিশেষত কাব্যসাহিত্যে। সমালোচনা-সাহিত্যে, ধর্মচিন্তায়, ললিতকলায় (যেমন বটিচেলি ও ব্লেকের ছবিতে), এবং সঙ্গীতে, সর্বত্রই দান্তের প্রভাব পরিস্ফুট। এ প্রভাব ইতালির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ইতালির বাইরে বিশ্বের প্রতিটি দেশে পরিব্যাপ্ত। চসার, মিল্টন্, শেলি, টেনিসন, এলিঅট প্রমুখ ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবিদের লেখায় দান্তের প্রভাব লক্ষণীয়। দান্তের যাঁরা প্রশস্তি রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অসংখ্য কবি ও মনীষী রয়েছেন। মার্কিন কবি লংফেলো (যিনি 'কমেদিয়া'র অনুবাদও করেছিলেন) তাঁর একটি সনেটের শেষ পঙ্‌ক্তিতে লিখেছেন—Ne'er walked the earth a greater man than he. এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের প্রবন্ধ এবং মধুসূদনের সনেটের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মধুসূদনের সনেটটির নাম 'কবিগুরু দান্তে' ও তিনি এই কবিতাটি ইতালির রাজা ভিক্তর ইমানুএলকে উপহাররূপে প্রেরণ করেন। এর শেষ দু'টি ছত্র হচ্ছে:

যশের আকাশ হতে কভু কি হে খসে
এ নক্ষত্র? কোন্ কীট কাটে এ কোরকে?

১২৬৫ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে (তারিখটা ৭ই ছিল কিনা জানা নেই) আর্নো নদীর তীরে অবস্থিত দ্রাক্ষাকুঞ্জে সমাকীর্ণ ফ্লরেন্স নগরীতে অভিজাত অথচ আর্থিক দিকে বিড়ম্বিত আলিগিয়েরি-পরিবারে দান্তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা ছিলেন গেল্ফ্। তাঁর বাল্য ও কৈশোর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না; তবে মনে করা হয়,

তিনি সুপণ্ডিত ও সুলেখক ব্রুনেটো ল্যাটিনির কাছে অধ্যয়ন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১২৭৪ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে নয় বছর বয়সে দান্তে ফ্লরেন্সের এক বিশিষ্ট নাগরিকের কন্যা বিয়াত্রিচে পার্টিনারিকে প্রথম দেখেন। বিয়াত্রিচেরও তখন একই বয়স। প্রথম দর্শনেই দান্তে বিয়াত্রিচেকে ভালোবাসেন। এই দেখা সম্পর্কে দান্তে লিখেছেন—

'ইতিপূর্বে আমার জন্মের পর নয় বার জ্যোতিঃস্বর্গ যেন একই স্থানে ফিরে এসেছে, এমন সময় আমার চোখের সামনে আবির্ভাব হল আমার মনের অধীশ্বরীর। যারা তাকে কি নামে ডাকবে জানে না তারা তাকে 'বিয়াত্রিচে' বলত। ইতিপূর্বেই সে সংসারে এতদিন কাটিয়েছে যে তার নবম বর্ষের আরম্ভে আমার সামনে তার আবির্ভাব হল, আর আমি তাকে দেখলাম আমার নবম বর্ষের শুরুতে। সেইদিন তার পোশাকের বর্ণ ছিল মহীয়ান্—মৃদু অথচ সুন্দর—উজ্জ্বল রক্তবর্ণে সুপ্ত সুনীল আভা। তার সুকুমার বয়সের সঙ্গে সবচেয়ে যা ভালো মানায় সেই রকম ছিল তার পরিধানের রীতি ও মেখলা বাঁধার ভঙ্গী। সেই মুহূর্তে আমি যথার্থই দেখলাম যে, হৃদয়ের একান্ত গোপন অন্তঃপুরে যে প্রাণশক্তির বাস সেই শক্তি এত প্রবলভাবে আন্দোলিত হতে লাগল যে আমার শরীরের ক্ষুদ্রতম ধমনীও প্রকম্পিত হল। আর সেই কম্পনের মধ্যে সেই শক্তি এই কথা উচ্চারণ করল—"আমার চেয়ে প্রবলতর এক দেবতার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করো, আর এর কাছে আমি পরাভূত হব।"'

এর নয় বছর বাদে বিয়াত্রিচে দান্তের সঙ্গে প্রথম কথা বলেন এবং ফলে দান্তের কবিমানসের বিকাশ ঘটে। বিয়াত্রিচের অন্যত্র বিবাহ হওয়ার পরেও দান্তে দূর থেকে তাঁকে ভালোবেসে গেছেন—সারা জীবন তাঁকে ভালোবেসেছেন, দেবীর মতো পূজা করেছেন। চব্বিশ বছর বয়সে যখন বিয়াত্রিচের মৃত্যু হয় (১২৯০ খ্রীস্টাব্দ) সেই মর্মান্তিক ঘটনা দান্তেকে নিদারুণ হতাশায় অভিভূত করে ফেললেও তাঁর প্রেমকে এতটুকু মলিন করতে পারে নি। খুব স্বল্প কয়েকবার দান্তে বিয়াত্রিচেকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন আরও কম। অথচ কি গভীর রূপান্তর না তাঁর জীবনে এই মেয়েটি ঘটিয়েছেন, দান্তের ভাষায় যাকে 'জন্মান্তর' বা 'নবজন্ম' ('vita nuova') বলা যায়। দান্তের না-বলা-বাণী বিয়াত্রিচে কোনোদিন অন্তরের শ্রবণে শুনেছিলেন কিনা আমরা জানি না। কেন দান্তে তাঁর হৃদয়ের গোপন কথা প্রণয়িনীর কাছে ভাষায় ব্যক্ত করেন নি সে রহস্য অনুদ্‌ঘাটিত। হয়তো তাঁর লাজুক স্বভাবের জন্য, কারণ দান্তে ছিলেন রাশভারী ও চাপা প্রকৃতির মানুষ। কিংবা হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, বিয়াত্রিচে এত সাধ্বী ছিলেন ও এত দূরের জগতের যে পার্থিব, প্রেমের অনুপযুক্ত। দান্তে নিজেই বলেছেন—'আমার আশা আছে, আমি তাঁর সম্বন্ধে যা লিখব তা ইতিপূর্বে কোনো নারী সম্বন্ধে লেখা হয় নি।'

ফ্লরেন্স নগরীর নৈসর্গিক সৌন্দর্য সেখানকার অধিবাসীদের মনে খুব রেখাপাত করেছিল বলে মনে হয় না। অন্তত তাদের উদ্দামতা প্রশমিত হয় নি। নিজেদের মধ্যে নানারকম বাদ-বিসংবাদ ও হানাহানিতে তারা সর্বদা লিপ্ত থাকত। তাদের মধ্যে নানা দল ও উপদল ছিল ; পরস্পরের বিরুদ্ধে সক্রিয় ষড়যন্ত্র চলত। একবার নগরীর শাসনভার এক দল হস্তগত করত : কিছুদিন পরে আর এক দল এসে বল-প্রয়োগ করে আগের দলকে ক্ষমতাচ্যুত করত। ইতালির দুই প্রধান গোষ্ঠীর (গেল্‌ফ্‌ এবং গিবেলাইন্‌) মধ্যে শতাধিক বছর ধরে সংগ্রাম চলছিল। যদি আমরা মনে করি কবি দান্তের এসব ভালো লাগত না তা হলে আমরা ভুল করব। তিনি রাজনৈতিক জীবনের ওঠা-পড়া ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। (এ দিক থেকে তিনি প্রথম ইলিজাবেথের যুগের ইংরাজ কবি স্পেন্সারের সঙ্গে তুলনীয়।) আজকের দিনে অবশ্য আমরা ঠিক বুঝতে পারব না কি ভাবে দান্তের মতো কল্পলোকের কবি, যাঁর দৃষ্টি 'দিব্যোন্মাদঘূর্ণিত', ইতালীয় রাজনীতির রুধির-মলিন আবর্তে নিজেকে নিমজ্জিত করতে পেরেছিলেন।

১২৮৯ খ্রীস্টাব্দে দান্তে গেল্‌ফ্‌দের হয়ে গিবেলাইন্‌দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দেন ও তাঁর নিজের দলকে জয়যুক্ত করেন। ফ্লরেন্সের যে দল 'রিয়াঞ্চি' বা শ্বেত-পক্ষ (নরমপন্থী) বলে পরিচিত ছিল দান্তে সেই দলের একজন নেতা নির্বাচিত হন (১৩০০ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁর শত্রুপক্ষকে 'নেরি' বা কৃষ্ণ-পক্ষ (চরমপন্থী) বলা হত। গেল্‌ফ্‌দের মধ্যেই এই দুটি উপদলের সৃষ্টি হয়।

যাই হোক, দান্তে সব সময় রাজনীতি নিয়ে থাকতেন না। সুন্দর সুন্দর কবিতা তিনি লিখতে আরম্ভ করেন। বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনা ছিল তাঁর অধ্যয়নের বিষয়। এঁদের মধ্যে হোমার, অ্যারিস্টট্‌ল্‌ ('ইনফার্নো' চতুর্থ সর্গে দান্তে এঁকে পণ্ডিতকুলচূড়ামণি আখ্যা দিয়েছেন), বাইব্‌ল্‌-সংক্রান্ত রচনার লেখকেরা, সিসেরো, ভার্জিল, হরেস, বিঠিআস্‌, টমাস অ্যাকুইনাস্‌ প্রভৃতি রয়েছেন। দান্তের লেখায়, বিশেষত 'কমেদিয়া'তে, এঁদের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

দান্তের ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার পর ফ্লরেন্সের এক বিশিষ্ট অভিজাত পরিবারের জেমিনা দোনাতি নাম্নী এক মহিলা তাঁর বাগ্‌দত্তা হন ও পরে ১২৮৫ খ্রীস্টাব্দে এঁর সঙ্গেই তাঁর বিবাহ হয়। দান্তের তিন পুত্র ও দুই কন্যা।

১৩০১ খ্রীস্টাব্দে শ্বেতপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের এক প্রবল সংঘর্ষে কৃষ্ণপক্ষীয়েরা জয়-লাভ করে এবং শ্বেতপক্ষীয়েরা (এঁদের মধ্যে দান্তেও ছিলেন) ফ্লরেন্স থেকে নির্বাসিত হন। এই নির্বাসনের ব্যথা দান্তের বুকে দুঃসহ হয়ে বেজেছিল ও তিনি আর কোনো দিন ফ্লরেন্সে ফিরে আসেন নি। জীবনের বাকী কুড়ি বছর তিনি এক নগর থেকে অন্য নগরে ঘুরে বেড়ান। অনেক প্রতিপত্তিশালী লোক তাঁকে নিয়োগ করার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু নির্বাসনের কারণে তাঁর মনে শান্তি ছিল না। 'অন্যের খাদ্য কত লবণাক্ত লাগে ও অন্যের সিঁড়িতে ওঠা-নামা কত কঠিন'

('পারাদিসো', সপ্তদশ সর্গ, ৫৮-৬০), অর্থাৎ 'পরধর্মো ভয়াবহঃ', এ কথা দান্তে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। ১৩২১ খ্রীস্টাব্দের ১৩/১৪ই সেপ্টেম্বর র‍্যাভেনাতে তাঁর মৃত্যু হয়। ইতিপূর্বে রাজনৈতিক মতবাদের দিক্‌ থেকে তিনি ঘোর গিবেলাইন্‌ হয়ে উঠেছিলেন।

৪

দান্তের রচনাবলীর মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ একত্রিশটি গীতিকবিতার সংকলন 'নতুন জীবন' *Vita nuova* (সম্ভবত ১২৯২-৯৩ খ্রীস্টাব্দে রচিত)। এই-গুলি বিভিন্ন সময়ে লেখা এবং অধিকাংশের বিষয়বস্তু বিয়াত্রিচের প্রতি দান্তের অনুরাগ। প্রচলিত রীতির অনুসরণ করে দান্তে এগুলির একটি টীকা যোগ করেন। টীকাটিতে কবিতাগুলির ব্যাখ্যা ছাড়াও দান্তের প্রেমের বিকাশের সঙ্গে কিভাবে কবিতাগুলির বিকাশ হয়েছে তার ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। কাব্যে ও গদ্যের সর্বত্র গীতিকাব্যের সুর শোনা যায়। বিয়াত্রিচের মূর্তি কাব্যলক্ষ্মীরূপে সমগ্র গ্রন্থটিকে উদ্‌ভাসিত করে রেখেছে। ইতালীয় ভাষায় এত সুললিত কবিতা এর আগে লেখা হয় নি, এত সুলিখিত ও ছন্দোময় গদ্যের তুলনা তখন পাশ্চাত্ত্য জগতের 'আধুনিক' কোনো ভাষায় খুঁজে পাওয়া যায় নি।

প্রথম দশটি কবিতায় বিয়াত্রিচের সৌন্দর্য কিভাবে দান্তেকে আকৃষ্ট করেছিল তার বিবরণ আছে। বিয়াত্রিচের প্রাণশক্তির সমুজ্জ্বল দ্যুতিতে যে-অবিস্মরণীয় অঘটনগুলি ঘটেছে তা দ্বিতীয় দশটি কবিতায় লিপিবদ্ধ। শেষাংশে রয়েছে বিয়াত্রিচের মৃত্যু ও দান্তের স্মৃতিচারণ। কাব্যের অন্তে বিয়াত্রিচে অনৈসর্গিক বা আধ্যাত্মিক প্রেমের প্রতিমূর্তিরূপে প্রকাশোন্মুখ। (বিয়াত্রিচে শব্দটির অর্থ, যে-নারী দেবাশিস্‌-ধন্যা।) এই প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়েছে 'কমেদিয়া'র শেষ গ্রন্থ 'পারাদিসো'তে।

ল্যাটিন ভাষায় লেখা *De Vulgari Eloquentia* (১৩০৩-৪) দান্তের অসমাপ্ত রচনা। দৈনন্দিন ভাষায় ল্যাটিন ভাষার ধ্বনিমাধুর্য কিভাবে সঞ্চারিত করা যায় দান্তে লেখকদের তা শেখাতে চেয়েছিলেন। ভাষা সম্পর্কে সাধারণভাবে এখানে আলোচনা করা হয়েছে এবং ইতালীয় ভাষার কোন্‌ রূপ মহত্তম গীতিকাব্যের উপযোগী সে কথা বিবৃত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ছন্দের আলোচনাও রয়েছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইতালীয় উপভাষাগুলি আলোচনার সূত্রপাত করেন দান্তে। পাশ্চাত্ত্য ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যতত্ত্বের ইতিহাসে এই গ্রন্থটি যুগান্তকারী এবং দান্তের কাব্য পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অপরিহার্য।

Convivio (১৩০৪-৭) গ্রন্থে দান্তের উদ্দেশ্য ছিল পরবর্তী কালে ইংরাজী পত্রিকা *The Spectator*-এর প্রবর্তক অ্যাডিসনের উদ্দেশ্যের অনুরূপ। তাঁর পত্রিকার দশম সংখ্যায় অ্যাডিসন লিখেছিলেন, 'It was said of Socrates, that he brought

Philosophy down from heaven, to inhabit among men ; and I shall be ambitious to have it said of me, that I have brought Philosophy out of closets and libraries, schools and colleges, to dwell in clubs and assemblies, at tea-tables and in coffee-houses.' দান্তে তাঁর নিজের যুগে দর্শন-শাস্ত্রকে সাধারণ লোকের করায়ত্ত করানোর এই কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের নামেও এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সর্ব-সাধারণের জন্য তিনি 'ভোজসভা'র আয়োজন করেছেন এবং বড় বড় দার্শনিকদের ভোজ্যথালি থেকে টুকিটাকি উদ্বৃত্ত নিয়ে পরিবেষণ করবেন মনস্থ করেছেন। গ্রন্থের প্রথম পর্বে দান্তে তাঁর নিজের ভাষার স্বপক্ষে বলেছেন ও বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডন করেছেন।

De Monarchia (আ. ১৩১৩) নামক ল্যাটিন গদ্যগ্রন্থে দান্তে রাষ্ট্রের পার্থিব ও অপার্থিব দুই দিক পৃথক্ করা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থটি তিন পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে দেখানো হয়েছে, বিশ্বের মঙ্গলের জন্য পার্থিব সম্রাটের প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে বলা হয়েছে, রোমান্ যারা তারা দিব্যানুশাসন অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। তৃতীয় পর্বের বক্তব্য, সম্রাটেরা তাঁদের অধিকার স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করেন, পোপের কাছ থেকে নয়।

'কমেদিয়া' দান্তের বিজয়-বৈজয়ন্তী। কবি এখানে নিজেকে অন্তরঙ্গভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর অন্যান্য সব লেখায় তিনি খণ্ডিত, আংশিক ; 'কমেদিয়া'তে তিনি পূর্ণ-প্রকাশিত। 'কমেদিয়া'র পূর্ববর্তী রচনাগুলি যেন এই মহাকাব্য লেখার প্রস্তাবনামাত্র। এটি তিনি সম্ভবত আ. ১৩০৭-১০ খ্রীস্টাব্দে আরম্ভ করেন (কেউ কেউ মনে করেন ১৩১০-১৪ খ্রীস্টাব্দে)। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্বে তিনি কাব্যটি সমাপ্ত করেন। এটি তিনটি প্রধান পর্বে বিভক্ত—'ইন্‌ফার্নো' (নরক), 'পুর্গাতারিও' (শুচীকরণ-মণ্ডল) এবং 'পারাদিসো' (স্বর্গ)। প্রতিটি পর্বে তেত্রিশটি সর্গ আছে। এ ছাড়া একটি উপোদ্‌ঘাত আছে 'ইন্‌ফার্নো'র প্রথমে। সুতরাং মোট সর্গসংখ্যা এক শত। নাটকীয়তার দিক থেকে, ভাবাবেগের তীব্রতার দিক থেকে, তিনটি পর্বের মধ্যে 'ইন্‌ফার্নো' শ্রেষ্ঠ। এই দিক্ থেকে শেক্‌স্‌পিয়রের ট্র্যাজেডিগুলির সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু অবিমিশ্র কাব্যের গভীর রূপ যদি বিচারের মাপকাঠি হয়, তা হলে 'পারাদিসো'কে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে এবং এই দিক থেকে এটি শেক্‌স্‌পিয়রের শেষ লেখাগুলির সঙ্গে তুলনীয়। তবে শেক্‌স্‌পিয়রের শেষ নাটকগুলির শ্রেষ্ঠত্ব যেমন অবিসংবাদিত নয়, 'পারাদিসো'র শ্রেষ্ঠত্বও অনেকে অস্বীকার করেছেন।

বহিরঙ্গের দিক থেকে দেখলে দান্তের মহাকাব্যের মূল বিষয় হচ্ছে নরক, 'পার্গেটরি' ও স্বর্গ এই তিন লোকে দান্তের পরিক্রমা। কিন্তু এর নিগূঢ়ার্থ হচ্ছে, মানুষের কর্মের জন্য তার নিজের নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে এবং দিব্যন্যায়াধীশের বিচারালয়ে তার কর্ম অনুসারে সে ফল পাবে। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, দর্শন সব কিছু 'কমেদিয়া'তে একীভূত হয়েছে। তবু এর গৌরব অন্য কিছুর জন্য ততটা নয় যতটা এর কাব্যত্বের জন্য, রচনাশৈলীর প্রসাদগুণের জন্য। প্রগাঢ় আন্তরিকতা, গভীর অনুভূতি, অনবদ্য আঙ্গিক ও মনোহর রচনাশৈলীই শুধু যে 'কমেদিয়া'তে আছে তা নয়, আছে মানবচরিত্রের গহনে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং মধ্যযুগীয় দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁর চিন্তাজগতে কোনো সংঘাতের সৃষ্টি করে নি। তিনি এদের সমন্বয় করে কাব্যিক সুষমায় প্রকাশ করেছেন। তবু তাঁর কাব্যে আত্মনিষ্ঠতা দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে। ওয়র্ডসোয়র্থের 'প্রেলিউড্'-এর মতো 'কমেদিয়া'ও দান্তের নিজের আত্মিক বিকাশের কাহিনী।

'কমেদিয়া' রূপক-কাব্য ও কাব্যের বিষয়বস্তু এমন যে, দান্তে তখনকার সমাজ-সংসার সমালোচনা করার সুযোগ পেয়েছেন। তদানীন্তন কালের দুর্নীতিগুলি তিনি অনাবৃত করে দিয়েছেন—প্রথা ও প্রতিষ্ঠান, নগর ও ব্যক্তি, কেউ তাঁর বিচারের কশাঘাত এড়াতে পারে নি। কি ভাবে মানুষ নিজেদের উদ্ধার করতে পারে ও খ্রীস্টের নির্দেশিত আদর্শ সমাজে পৌঁছতে পারে সেটা দেখানোর জন্য দান্তে প্রয়াসী। ব্রাউনিঙের ভাষায়, 'Dante, who loved well because he hated, / Hated wickedness that hinders loving.'

মৃত্যুর পর মানবাত্মার ভাগ্যবর্ণনায় দান্তে এক প্রচলিত রীতির অনুবর্তন করেছেন যেটা মধ্যযুগে বেশ লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তবে পূর্ববর্তী বিবরণগুলির সঙ্গে দান্তের বিবরণের পার্থক্য লক্ষ করার মতো। তদানীন্তন নরক-বর্ণনার বেশি উৎকট দিকগুলি ও স্বর্গ সম্বন্ধে ঐহিক প্রেয়োবাদী সাধারণ ধারণা দান্তে পরিহার করেছেন। তবে গভীর প্রভাব বিচার করতে হলে যে-গ্রন্থের নাম করতে হবে সেটা মরণোত্তর জীবন সম্বন্ধে কোনো মধ্যযুগীয় বিবরণী নয়, সেটা ভার্জিলের 'ঈনিড্'। পরিক্রমাকালীন পথপ্রদর্শক ভার্জিলই দান্তের সত্যকারের গুরু এবং এ কথা স্বীকার করতে দান্তে কখনো কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু ভার্জিলের উদার মানবতাবাদ দান্তে অবিমিশ্রভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। অ্যারিস্টট্লের 'নীতিশাস্ত্র' ও অ্যাকুইনাস্-কৃত তার ব্যাখ্যায় যে নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যেটা সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত নয়, সেই নীতি দান্তে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করেছেন। অ্যারিস্টট্লের গ্রন্থ অনুসারেই নরকের পাপগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে এবং পার্গেটরির গঠন-কৌশল অ্যাকুইনাসের বিবরণ থেকে নেওয়া। স্বর্গের বিভিন্ন ভাগগুলি অবশ্য প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা থেকে গৃহীত। এই শাস্ত্রে নয়টি বিভিন্ন মণ্ডলের কথা বলা হয়েছে। পর পর প্রতিটি মণ্ডল পূর্ণতার দিকে ক্রমশ উচ্চতর ধাপ।

দান্তের পরিক্রমার মধ্য দিয়ে আত্মার পরিক্রমণ দেখান হয়েছে। পথনির্দেশ করা হয়েছে মানবাত্মা তার লুপ্ত নৈতিক গরিমা কিভাবে ফিরে পাবে সে দিকে। নরক থেকে মানবাত্মার স্বর্লোকে উত্তরণ, মাঝপথে পাপক্ষালনের বৈতরণী অতিক্রম করার পর। নরকের দ্বারদেশে লেখা আছে, 'যারা এখানে প্রবেশ করবে তারা সব আশায় জলাঞ্জলি দাও।' দিশাহারা ও বিপদে উদ্‌ভ্রান্ত আত্মাকে দুঃখ-বেদনার রাজ্যে ন্যায়বুদ্ধি (অর্থাৎ ভার্জিল) পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর বিভিন্ন ভয়াবহ শাস্তিভোগ প্রত্যক্ষ করে উন্নীত ও পবিত্রীভূত আত্মা ধর্মতত্ত্বের (এখানে বিয়াত্রিচের) নির্দেশে স্বর্গধামের নয়টি প্রদেশে পরিভ্রমণ করবে। দান্তে নিজে শেষ পর্যন্ত স্বর্গে পৌঁছেছেন কিন্তু সে তাঁর নিজের পুণ্যবলে নয়, ঈশ্বরের করুণায়। অনেকগুলি সঙ্কেতের দুটি বা তিনটি ব্যাখ্যা করা যায়—নীতির দিক থেকে, ধর্মের দিক থেকে, ইতিহাসের দিক থেকে। কয়েকটি সাঙ্কেতিক প্রয়োগ অবশ্য এখন বেশ দুর্বোধ্য মনে হয়। অনেক ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক চরিত্র বিভিন্ন দোষ ও গুণের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। দান্তে তাঁর শত্রুদের নরকে বা পার্গেটরিতে যন্ত্রণাভোগরত অবস্থায় দেখিয়ে তাঁদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছেন। অবশ্য এঁদের জন্য তিনি অনুকম্পাও অনুভব করেছেন। আবার তাঁর বন্ধু ও শুভার্থীদের তিনি স্বর্লোকের সুখৈশ্বর্যের মধ্যে দেখিয়ে তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।

'কমেদিয়া' মহাকাব্য, কিন্তু 'ইলিয়াড্' বা 'রামায়ণ' যেভাবে ঐতিহ্য ও প্রচলিত কাহিনীর সঙ্কলন সে ধরনের নয়। 'ইলিয়াড' বা 'রামায়ণে' হোমার বা বাল্মীকি ততটা প্রণেতা নন যতটা সম্পাদক। 'কমেদিয়া' সম্পূর্ণভাবে দান্তের নিজস্ব সৃষ্টি, যেমন 'প্যারাডাইস্ লস্ট্' মিল্টনের কিংবা 'মেঘনাদবধ কাব্য' মধুসূদনের। 'কমেদিয়া'কে 'ঈনিডের' মতো জাতীয় মহাকাব্যও বলা যাবে না, কারণ এর নায়ক (দান্তে স্বয়ং) বিশেষ এক রাষ্ট্রের জাতীয় গুণাবলীর আধার নয়। তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সংঘাত-বহুল ইতালীয় জনজীবনের যে-পূর্ণাঙ্গ রূপ এখানে চিত্রিত হয়েছে সে কথা ভেবে 'কমেদিয়া'কে হয়তো জাতীয় মহাকাব্য বলা যেতে পারে। 'কমেদিয়া' মধ্যযুগের মহাকাব্য। মৃত্যুর পরে নবজীবনের জন্য প্রস্তুতি এর বিষয়বস্তু। এই ছিল মধ্যযুগের মানুষের প্রধান ভাবনা।

৬

Epistle to Can Grande-এ (খুব সম্ভব এটি দান্তের নিজের লেখা) লেখক বলেছেন, 'কমেদিয়া' একটি রূপক এবং সেই রূপককে আগাগোড়া চার ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে—আক্ষরিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও অতীন্দ্রিয়। সমস্ত 'কমেদিয়া'কে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এইভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এ কথা অনেক সময় সমালোচকেরা ভুলে যান, ফলে তাঁদের সমালোচনা একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট হয়।

'ইন্‌ফার্নো'কে রাজনৈতিক স্তরে, 'পুর্গাতারিও'র বেশির ভাগ অংশ নৈতিক স্তরে ও 'পারাদিসো'কে অতীন্দ্রিয় স্তরে ব্যাখ্যা করার দিকে একটা প্রবণতা প্রায়ই লক্ষ করা যায়।

'কমেদিয়া'র আক্ষরিক অর্থ একটাই কিন্তু একাধিক রূপক অর্থ রয়েছে। কাব্যের প্রথমাংশ থেকে উদাহরণ দেখা যেতে পারে। 'এক অন্ধকার অরণ্য' ও তার মাঝখানে দান্তে স্বয়ং। এর আক্ষরিক অর্থ, এক পথিক বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এর নানা ধরনের রূপকার্থ করা যেতে পারে। ধর্মতত্ত্বের দিক-থেকে : ভগবানের কাছ থেকে আমরা-যে অনেক দূরে চলে এসেছি এবং আধ্যাত্মিক কোনো যোগাযোগ রাখি নি, অন্ধকার অরণ্য সেই ব্যবধানের প্রতীক। রাজনৈতিক দিক থেকে : দান্তের যুগের ইতালির উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকাশ। নৈতিক দিক থেকে : অসত্য ও দুর্নীতির পথ, সভ্য মানুষের অগম্য। মনস্তত্ত্বের দিক্ থেকে : অবচেতন মনের সীমাহীন রহস্যের অতল পারাবার।

দান্তের মহাকাব্যে তাঁর অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সর্বত্র পরিস্ফুট। দান্তে কিন্তু পণ্ডিতদের চিত্তবিনোদনের জন্য 'কমেদিয়া' লেখেন নি। তিনি সাধারণ মানুষের জন্য লিখেছিলেন। জ্ঞানরাজ্যের অন্তঃপুরে যারা প্রবেশের অধিকার পায় নি তাদের মধ্যে তিনি জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এইজন্য তিনি যে-ভাষা ও রচনাশৈলী ব্যবহার করেছেন তাকে কাঠিন্যের বর্মে আবৃত করেন নি। সহজ, অনাড়ম্বর শৈলীতে লেখা বলেই, যদিও এই ভাষায় ও শৈলীতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে, দান্তে এর নাম দিয়েছিলেন 'কমেদিয়া'। (গ্রন্থের সুখসমাপ্তি-যে নামকরণের জন্য একেবারে দায়ী নয় সে কথা জোর দিয়ে বলা চলে না।) 'কমেদিয়া'কে কঠিন কাব্যগ্রন্থ মনে হওয়া অবশ্য অস্বাভাবিক নয় ; তবে বিংশ শতাব্দীর কোনো কোনো কবির মতো দান্তে নিজে একে দুর্বোধ্য করে তোলার কোনো পরিকল্পনা করেন নি। দান্তের উদ্দেশ্য যদি না জানা থাকে ও তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকে তা হলে 'কমেদিয়া' সুবোধ্য মনে না-ও হতে পারে।

বিষয়বস্তু এবং ভাষা ও ছন্দের উপর দান্তের অসামান্য দখল ছিল এবং প্রতিটি শব্দ তিনি সযত্নে চয়ন করেছেন। তাই তাঁর লেখায় অত সুললিত সারল্য আনা সম্ভব হয়েছে। তাঁর কথাগুলি আমাদের স্মৃতিকে এমনভাবে দোলা দেয় যে, সেগুলি অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে। টি. এস্. এলিঅট তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন : 'the great master of the simple style'। দান্তের বিশেষ ছন্দ, যা 'তের্জা রিমা' নামে পরিচিত (প্রতি পঙ্‌ক্তিতে এগারটি সিলেব্‌ল্ এবং তিন লাইনের এক একটি স্তবক), তারও উদ্ভাবক দান্তে স্বয়ং। ইতালীয় ভাষার ফ্লরেন্সে প্রচলিত রূপই দান্তে মোটামুটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রয়োগ ইতালীয় ভাষার স্থায়ী সাহিত্যিক রূপ-নির্ণয়ে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

কাব্যের চিত্রকল্প সম্বন্ধে সহজ ভাষায় বলা যায়, শব্দের সাহায্যে ছবি আঁকা। দান্তের 'কমেদিয়া'র চিত্রকল্প সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর সে কথা বলা যায়। দান্তে

এমনভাবে শব্দের ব্যবহার করেছেন যাতে আমাদের চোখের সামনে একটা ছবি ফুটে ওঠে। এই ছবি অনেক সময় এমন জিনিসের যা আমরা বাস্তবজীবনে বহুবার দেখেছি, যেমন, বাগানের পথে মন্থরগতি শম্বুক। কিন্তু বহুবার দেখেছি বলেই সেগুলির সব সৌন্দর্য আমাদের কাছে লুপ্ত হয়ে গেছে। দান্তের লেখনীতে যখন সেই জিনিসই চিত্রময় হয়ে ওঠে তখন তাতে আমরা অনাস্বাদিত সৌন্দর্যের সন্ধান পাই। আবার অনেক জিনিসের ছবি দান্তে আমাদের জন্য এঁকেছেন যা মানুষের অভিজ্ঞতার গণ্ডির মধ্যে আগে কোনো দিন আসে নি, যেমন, নরকের জ্বলন্ত বালুকণার অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে ধাবমান পাপাত্মাদের 'ঝলসানো' গাত্রচর্ম, কিংবা নীহারিকাপুঞ্জ থেকে আসা অনৈসর্গিক জ্যোতিতে ভাস্বর নন্দনের দিব্য গোলাপ। তুলির সাহায্যে ছবিও দান্তে এঁকেছেন, কিন্তু তাঁর সে ছবি আমাদের জন্য নয়। ব্রাউনিঙের 'ওআন্ ওয়র্ড্ মোর্' কবিতায় কবি তাঁর প্রণয়িনীকে বলছেন—

> Dante once prepared to paint an angel ;
> Whom to please ? You whisper 'Beatrice'.

দান্তের বর্ণনা-রীতির সঙ্গে মিল্টনের বর্ণনা-রীতির তুলনা করা যেতে পারে। 'প্যারাডাইস্ লস্ট্'-এ নরকের বর্ণনা করার সময় মিল্টন মোটামুটি, স্থূলভাবে বর্ণনা করেছেন ; এর ফলে কবিকল্পনার এক অপূর্ব ওজস্বিতার উন্মেষ ঘটেছে। দান্তের নরক-বর্ণনা সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খ, ফলে প্রত্যক্ষ বাস্তব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মিল্টন বিমূর্ত ও অস্পষ্ট, দান্তে রূপানুগ ও বিশদ। দৃষ্টির স্বচ্ছতার দিক থেকে বিচার করলে দান্তের সমকক্ষ কবি বিশ্বসাহিত্যে বিরল।

ওজোগুণান্বিত শৈলী সৃষ্টি করার কোনো পূর্বপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে দান্তে লেখেন নি এবং এ বিষয়ে কোনো কৃত্রিমতার আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেন নি। ভার্জিলের সারগর্ভ, ধ্বনিময় ভাষা (কিছুটা যাকে আমরা সংস্কৃত কবি ভারবির ক্ষেত্রে 'অর্থগৌরব' বলি) দান্তের লেখাকে প্রভাবিত করে নি এমন নয়। ধর্মতত্ত্বে প্রচলিত পারিভাষিক শব্দাবলী এবং প্রতীকের নানাবিধ সূক্ষ্ম প্রয়োগও দান্তে শিখেছেন। কিন্তু তাঁর পরিণত শৈলীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক আশ্চর্য সমতা।

দান্তের কাব্যে নাটকীয় গুণও যথেষ্ট রয়েছে। তাঁর চিন্তার মধ্যে শক্তি ও সূক্ষ্মতা রয়েছে ; তার সঙ্গে রয়েছে মানুষের জন্য দরদ আর নীতির প্রতি অবিচল আস্থা। আর এই সমস্তকে বিচ্ছুরিত করে রয়েছে তাঁর অসাধারণ প্রখর কল্পনাশক্তি। নানা মানুষের চরিত্র তাঁর কাব্যপটে ভীড় করে আছে। এদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ ও বিচ্ছেদের টানা-পোড়েনে নাটকীয়ত্ব গ্রথিত হয়েছে এবং সমগ্র 'কমেদিয়া' প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। আর সমস্ত কিছু মথিত করে বারংবার ধ্বনিত হয়েছে কবির অপরাজিত চিত্ত থেকে উৎসারিত মূর্ছনা, কখনও আনন্দমুখর, কখনও বিষাদকরুণ।

দান্তের মহাকাব্য 'কমেদিয়া' যে সাধারণ মানুষের জন্য লেখা, বিশেষ কোনো বিপশ্চিৎ-গোষ্ঠীর জন্য নয়, সে কথা মনে রাখার প্রয়োজন আছে। অবাস্তব নিয়ে দান্তের বেসাতি, তিনি ধর্মতত্ত্বের কচকচিতে মশগুল, এবং দৈনন্দিন জীবনে তাঁর কাব্যের কোনো সার্থকতা নেই, এসব উক্তি অজ্ঞতা-প্রসূত। যদিও, আক্ষরিকভাবে, মৃত্যুর পর মানবাত্মার অবস্থা কি হয় তা তিনি দেখাতে চেয়েছেন, তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায় স্বতন্ত্র। ইহজীবনে যারা দুর্দশাগ্রস্ত তাদের সুখের সন্ধান দেওয়া দান্তের মূল লক্ষ্য। আর এই জীবনে যারা দুঃখভোগ করে তারা কোনো বিশেষ শতাব্দীর বা বিশেষ দেশের মানুষ নয়। তারা সর্বকালের, সর্বদেশের মানুষ। দান্তে যে স্বর্গ-নরকের বর্ণনা করেছেন, এক দিক থেকে দেখলে তা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন মানসিক অবস্থা ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার চিত্র। নরক-যন্ত্রণা আমরা এখানেই ভোগ করি, স্বর্গসুখও ধূলার ধরণীতে সম্পূর্ণ দুর্লভ নয়। সকল দেশের সকল মানুষের জন্য 'কমেদিয়া'র গভীর তাৎপর্য রয়েছে। আধুনিক কালের মানুষ তাই 'কমেদিয়া'কে উপেক্ষা করতে পারে না। ঐহিক জীবনের জটিলতা এ যুগে অনেক বেড়েছে, অশান্তিও ঘনীভূত হয়েছে। দান্তের নির্দেশিত পথ আমাদের মুক্তির পথ। বাসনার ও ভোগের গোলকধাঁধার মধ্যে দুর্নীতি, শঠতা ও স্বার্থপরতার মায়াজালের মধ্যে এ পথের নিশানা নেই। সে পথ সু-নীতির পথ, কর্তব্যের পথ, ত্যাগের পথ; সর্বোপরি, প্রেমের পথ। প্রেম সর্বোত্তম। 'পারাদিসো'র শেষ ছত্রে দান্তে যে-প্রেমস্বরূপের কথা বলেছেন, যে-দিব্য প্রেমশক্তির প্রভাবে সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-তারকা সঞ্চালিত (l'amor che move il sole e l'altre stelle), সেই মহান্ প্রেমের কাছে, যিনি রাজার রাজা তাঁর কাছে, আমাদের নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করতে হবে, কারণ 'তাঁর ইচ্ছাতেই আমাদের শান্তি' (e la sua volontate e nostra pace, 'পারাদিসো', ৩।৮৫)।

পেত্রার্কা ও রেনেসাঁস

পাশ্চাত্ত্য জগতে যে-রেনেসাঁস মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক যুগের সূচনা করে এবং ইউরোপ মহাদেশের ইতালিতে প্রথম যার সূত্রপাত, ফ্রান্‌চেস্‌কো পেত্রার্কা সেই নবজাগৃতির অন্যতম প্রাণপুরুষ। তাই সপ্তকাণ্ড 'ইতালীয় রেনেসাঁসের ইতিহাস'-এর লেখক কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেন নি, যখন তিনি এই কথাগুলি লেখেন পেত্রার্কা সম্পর্কে—'আধুনিক জগতের জন্য তিনি যে-কীর্তি অর্জন করেছেন তা শুধু তাঁর ইতালীয় অনুকরণকারীদের জন্য অনবদ্য শিল্পসুষমায় মণ্ডিত অনন্য গীতিকাব্যের অক্ষয় উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া নয়। এর চেয়ে অনেক বড় জিনিস হচ্ছে, ইউরোপের জন্য তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন চিন্তাভাবনার নতুন দিগন্ত। মধ্যযুগের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি আধুনিক মানবাত্মার জনপদ নিরীক্ষণ করেছেন, এবং জ্ঞানানুশীলনে তাঁর অসীম অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি সেই বিষয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, যাকে আমরা বলে থাকি বিদ্যাচর্চার পুনরভ্যুদয়।' অন্যান্য ঐতিহাসিক ও সমালোচকেরাও এই মত পোষণ করেন বলেই পেত্রার্কাকে তাঁরা বলেছেন 'প্রথম হিউম্যানিস্ট,' 'প্রথম আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রের পথিক', 'বিদ্যাচর্চার পুনরভ্যুদয়ের প্রথম প্রবর্তক' এবং 'আধুনিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা'। তাঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়, গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং সাধারণভাবে বিদ্যাচর্চায় প্রভূত উৎসাহ প্রভৃতির কথা মনে রেখে পেত্রার্কাকে রেনেসাঁস-এর প্রধান হোতারূপে গণ্য করা হয়।

নতুন নতুন স্থান আবিষ্কার ও ভ্রমণ করার উদ্দীপনা রেনেসাঁসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পেত্রার্কাও ছিলেন সুদূরের পিয়াসী। ভ্রাম্যমাণ কবির যে-বাইরের রূপ আমরা দেখি তার সঙ্গে তাঁর অন্তর্লোকের অন্তরঙ্গ যোগ রয়েছে। যে-তুলনাহীনা লরার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে তিনি ব্যর্থ প্রণয় সঙ্গোপনে নিজের হৃদয়ে লালন করেছিলেন, তাঁকে খানিকটা ভুলে থাকার প্রয়াস তাঁর ভ্রমণের নেশার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এর কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা তাৎপর্য আছে; সেটা অজানাকে জানার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ১৩৩৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে যখন পেত্রার্কা দেশে দেশে বেড়ানো আরম্ভ করলেন এবং ইতালি, ফ্রান্স ও জার্মানির নগরে নগরে পরিক্রমা করলেন, তখন তিনি নিজেই তাঁর প্রেরণার কথা ব্যক্ত করেছেন—মানুষের সামাজিক রীতিনীতি সযত্ন পর্যবেক্ষণের বাসনা এবং নব নব দেশ আবিষ্করণ ও পরিক্রমণের জন্য ব্যাকুলতা; তাঁর নিজের লাতিন ভাষায়, 'contemplatus

solicite mores hominum cuncta circumspiciens videndi cupidus exploradique.' এই উক্তিতে যে-মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে সেটা স্থাণু মধ্যযুগের নয়, বরং চির-অনুসন্ধিৎসু ও সদাচঞ্চল নবজাগরণের যুগের। অভিযাত্রী পেত্রার্কার পর্বতারোহণের আগ্রহ এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। ১৩৩৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি আভীনিওন্ শহরের নিকটবর্তী ভেন্ত পর্বতে আরোহণ করেন এবং শুধু আনন্দলাভের জন্য পর্বতারোহণের এটাই সম্ভবত প্রথম লিপিবদ্ধ দৃষ্টান্ত।

প্রথম জীবনে পেত্রার্কার প্রিয় গ্রন্থগুলির মধ্যে শুধু সিসেরো ও ভার্জিলের রচনাবলীই ছিল না, সেন্ট্ অগস্টিন্-এর 'স্বীকারোক্তি'ও ছিল। (তাঁর আধ্যাত্মিক-প্রবণতা ইতিমধ্যেই পরিস্ফুট হয়েছে।) এই বইটির একটি ছোট সংস্করণ তিনি সব সময় নিজের সঙ্গে রাখতেন এবং পর্বতারোহণের সময়ও এর অন্যথা হয় নি। পর্বত-শীর্ষে উঠে তিনি যখন এই বইটি প্রথম খুললেন পড়ার জন্য, তখন হঠাৎ বইটির একটা জায়গায় তাঁর চোখ পড়ল, যেখানে লেখা আছে যে, অভিযাত্রী মানুষদের অভিজ্ঞতা পর্বতের শীর্ষদেশ ছাড়িয়ে যায় এবং নক্ষত্রপুঞ্জের পথে পরিক্রমা করে; কিন্তু তারা নিজেদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। এই আকস্মিক যোগাযোগ পেত্রার্কার অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করে।

নিজের সম্বন্ধে উদাসীন পেত্রার্কা অবশ্য কোনোদিনও ছিলেন না। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সার্ টমাস্ ব্রাউনের মতো, 'যেসব আশ্চর্য জিনিস আমরা আমাদের বাইরে খুঁজি সেগুলি নিজেরাই সঙ্গে নিয়ে বেড়াই; সমস্ত অ্যাফ্রিকা ও তার সব বিচিত্র কিছু আমাদের মধ্যে রয়েছে।' তাই তিনি শুধু বহির্জগতেই অভিযান করেন নি, নিজের হৃদয়ের গহনলোকেও তিনি অভিযাত্রী। লরার উদ্দেশে লেখা অবিস্মরণীয় প্রেমের কবিতাগুলিতে তিনি নিজের অন্তরকে অনাবৃত করে মেলে ধরেছেন, প্রকাশ করেছেন নানা সূক্ষ্ম, জটিল অথচ মর্মস্পর্শী অনুভূতি। গানের সহস্রধারায় উৎসারিত হয়েছে তীব্র ভাবাবেগ। তাঁর গীতবিতান তাই প্রেমের বিশ্বকোষ হয়ে উঠেছে এবং তাঁর অন্যান্য সব রচনা আজ উপেক্ষিত হলেও তাঁর অনুরাগের রাগিণী আজও দেশে-বিদেশে ঝঙ্কৃত। এই আত্মানুসন্ধানের স্পৃহা রেনেসাঁস্-এর মহৎ বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম, তাই এ যুগের মানুষ মনে করে—'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।'

মধ্যযুগে একজন লোককে বিশেষ একজন ব্যক্তিরূপে দেখা হত না, কারণ তখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্য দেওয়া হত না; নিজের স্বতন্ত্র সত্তা মানুষ যাতে ভুলে যায় খ্রীস্টীয় মঠ থেকে সেই শিক্ষাই লোককে দেওয়া হত। কি সাহিত্যে, কি বিজ্ঞানে, কি শিল্পকলায়, কি ধর্মে, কি অভিযান ও আবিষ্করণে—রেনেসাঁস্-এর কাহিনী ব্যক্তি-সত্তার পুনরভ্যুদয়ের কাহিনী। মানুষ নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে যখন নতুন করে আবিষ্কার করল তখনই মানব-ইতিহাসে নবজাগরণের সূচনা হল। এই নতুন আবিষ্কার মানুষের প্রতিভাকে নব নব বিকাশের দিকে নিয়ে গেল, আর সেইজন্যই

এ যুগের মানুষ 'এক সমগ্র মানুষ' ('l'uomo universale') হওয়ার স্বপ্ন দেখল। Symonds-এর ভাষায় বলা যায়—

The metaphor of the Renaissance may signify the entrance of the European nations upon a fresh stage of vital energy in general, implying a fuller consciousness and a freer exercise of faculties than had belonged to the mediaeval period.

তাই একজন লেওনার্দো দা ভিঞ্চিকে আমরা লেখক, বৈজ্ঞানিক, শারীরস্থানবিদ্, যন্ত্রবিশারদ, ভাস্কর এবং চিত্রশিল্পীরূপে পাই, একজন স্যর্ ফিলিপ্ সিড্নিকে পাই সুযোগ্য সভাসদ্, বরেণ্য সাহিত্যিক ও সাহসী যোদ্ধারূপে। পেত্রার্কা মানুষের মহত্ত্বকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং বারংবার তাঁর রচনায় মানুষের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। তিনি যে মানব-বন্দনার সূচনা করলেন তার পরিণতিই আমরা এক শতাব্দী পরে পেত্রার্কার ভাবশিষ্য ও তরুণ ইতালীয় হিউম্যানিস্ট্ পীকো দেল্লা মীরান্দোলার মানুষের মহত্ত্ব-সম্পর্কিত প্রখ্যাত ভাষণে পাচ্ছি। এতে ঈশ্বরকে দিয়ে মানুষের উদ্দেশে বলানো হয়েছে—'কোনো বিধিনিষিধের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত তুমি নিজে নিজের স্বভাবের সীমা নির্দিষ্ট করবে···নিজের স্রষ্টা ও রূপকার হিসাবে যে-রকম খুশি সেই রকম মূর্তিতে তুমি নিজেকে গড়তে পারবে। জীবনের নিম্নতর ধাপে অর্থাৎ জন্তুদের শ্রেণীতে অধঃপতনের শক্তি তোমার থাকবে। তোমার আত্মা ও বিচারবুদ্ধি থেকে উদ্ভূত সেই শক্তিও তোমার থাকবে যাতে তুমি উচ্চতর অর্থাৎ দিব্য শ্রেণীতে নবজন্ম লাভ করতে পারো।'

এই উচ্চতর ক্রমে উন্নীত হতে গেলে মানুষকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে এবং পেত্রার্কার ধারণা ছিল গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য থেকেই এই মন্ত্র আসবে। এই সাহিত্যই মানুষের মনকে সংকীর্ণতার গণ্ডি থেকে মুক্তি দিতে পারবে ; কারণ এই সাহিত্যে রয়েছে মহান্ মানবাত্মার অখণ্ড প্রকাশ। তাই সারা জীবন পেত্রার্কা ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের পঠন-পাঠনে নিজেকে উৎসর্গ করেন এবং এর প্রচারে তিনি ছিলেন অক্লান্ত অতন্দ্র। তিনি বহু ল্যাটিন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার, সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেন, যেগুলির মধ্যে রয়েছে সিসেরোর দুটি ভাষণ এবং আত্তিকুস্কে লেখা সিসেরোর চিঠিপত্র। প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহেও পেত্রার্কা যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। বন্ধু বোক্কাচিওকে তিনি গ্রীক ভাষা, ল্যাটিন ভাষা শিখতে উৎসাহিত করেন। তিনি এঁর 'দেকামেরোন্' গ্রন্থের শেষ গল্পটির ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন, যার 'গ্রিসেল্দা'র কাহিনীটি হয় বিশ্ববিশ্রুত। তাঁর গ্রন্থ-সংগ্রহে এত অমূল্য ও দুর্লভ গ্রন্থাদি ছিল যে, ভেনিস্-নগরীতে তাঁর বাসগৃহের ব্যবস্থা করা হয় এই শর্তে যে, তাঁর লাইব্রেরি তিনি পরে এই নগরীকে দিয়ে যাবেন। মূল গ্রীক ভাষায় লেখা হোমারের রচনা তিনি নিজে পড়তে অসমর্থ হলেও সেটিকে তিনি সযত্নে তাঁর গ্রন্থশালায় সংরক্ষণ করেন। ইতালীয় ভাষায় অসংখ্য অসাধারণ গীতিকবিতা রচনা করার পরেও তাঁর ধারণা ছিল তাঁর প্রকৃত সাহিত্যকর্ম—তাঁর ল্যাটিন রচনাগুলি—তাঁকে অমর

করে রাখবে। তাই তাঁর মহাকাব্য তিনি ল্যাটিনে লিখতে আরম্ভ করেন ('অ্যাফ্রিকা')। যদিও অনেকে মনে করেন এই অসমাপ্ত মহাকাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য অসামান্য হলেও কাব্যমূল্য সামান্য, এবং এঁদের মধ্যে রয়েছেন 'Die Kultur der Renaissance in Italien' গ্রন্থের লেখক সুইস্ ঐতিহাসিক Jacob Burckhardt, যিনি 'অ্যাফ্রিকা'কে 'অপাঠ্য' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর চিঠিপত্রের মাধ্যমেও তিনি ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতির প্রচারের প্রচেষ্টা চালান এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করার সময়ও তাঁর এই উদ্দেশ্য তিনি বিস্মৃত হন নি।

অবশ্য ইতালির প্রতি তাঁর প্রীতির কোনো অভাব ছিল না। দেশপ্রেম তো রেনেসাঁসের অন্যতম লক্ষণ। একই দিনে যখন পেত্রার্কাকে প্যারী ও রোম নগরী থেকে রাজকবি-পদে বরণ করার প্রস্তাব আসে, তখন তিনি রোমের রাজকবি হওয়াই অধিকতর কাম্য মনে করেন। আর তাঁর হাতে ইতালীয় ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়—ভাষায় সংযোজিত হয় এক অভিনব নমনীয়তা ও সংগীতের ঝংকার, যেটা মনে রেখে মধুসূদন তাঁর 'উপক্রম'-শীর্ষক দ্বিতীয় সনেটে লেখেন—

…বাক্‌দেবী-বরে
বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল-ধন,
রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণবীণা করে।

তাই দান্তে এবং বোক্কাচিওর মতো পেত্রার্কাও 'ইতালীয় ভাষার জনক'। দেশ ও দেশবাসীর প্রতি তাঁর অনুরাগ 'Italia mia' কবিতায় দৃপ্তসুরে ধ্বনিত হয়েছে—

'এই কি সেই ভূমি নয় যা আমি প্রথম স্পর্শ করেছি? এ কি আমার
নীড় নয় যেখানে এত সুন্দরভাবে আমি লালিত হয়েছি? এ কি
আমার পরম বিশ্বাসের স্থান জন্মভূমি নয়, করুণাময়ী, সাধ্বী জননী,
যে আমার মাতা-পিতা দুজনকেই আবৃত করে রয়েছে? ঈশ্বরের দোহাই,
এতে অন্তত যেন তোমাদের হৃদয় টলে…
কারণ ইতালীয়দের অন্তঃকরণে পুরাকালের সাহস এখনও মরে নি।'
('che l' antico valore
nell' italici cor non e ancor morto'.)

ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ অথচ নিজের ভাষাতে অন্তহীন আগ্রহ, এই যে দ্বৈতভাব এটা পেত্রার্কার জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখা যায়। একদিকে তিনি সংসারকে ভালোবাসেন, অন্যদিকে তিনি জাগতিক বাসনা থেকে পরিত্রাণ পেতে চান। তাঁর মানসী লরাকে তিনি যতই দিব্য প্রেমের প্রতিমা ও প্রতীকরূপে প্রণতি জানান, সে যে মানবী এবং অসামান্য লাবণ্যময়ী মানবী এ কথা তিনি কোনোদিন একেবারে ভুলতে পারেন নি। তাই তিনি যেমন বলেন,

Non era l' andar sua cosa mortale
Ma d' angelica forma
('তার ললিত গতিভঙ্গিতে নশ্বর কিছু ছিল না, ছিল স্বর্গের সুষমা'),

তেমনই এও বলেন—

Lieti fiori, e felici e ben nate erbe,
Che Madonna passando premer sole
('কত উজ্জ্বল ও সুখী ওই ফুলেরা, ধন্য লতাপাতা
যাদের ওপর আমার প্রিয়ার চরণ পড়ে') ।

ঐহিক আকর্ষণ পেত্রার্কার জীবনের শেষের দিকে ক্রমশ মন্দীভূত হয়ে এসেছে। সারা জীবন পেত্রার্কা ভক্তিমান্ খ্রীস্টান ছিলেন ; জীবনের পথে যত এগিয়েছেন তত তাঁর আধ্যাত্মিক আর্তি তীব্রতর হয়ে উঠেছে। রেনেসাঁসের যুগে একদল যেমন 'পেগ্যানিজম্' বা ভোগবাদের দিকে ঝুঁকেছে, দ্বিতীয় একদল যেমন সব রকম নীতিকে জলাঞ্জলি দিয়েছে, তৃতীয় আর একদল তেমনি বোক্কাচ্চিও, ইরাস্‌মাস্ ও টমাস্ মোর্-এর মতো সৎ খ্রীস্টান হতে চেয়েছে। পেত্রার্কা ছিলেন এই শেষোক্ত গোষ্ঠীতে। এক সময় যিনি যশের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন, তাঁরও অন্য এক সময় মনে হয়েছে—

E del mio vaneggiar vergogna e l' frutto
E 'l pentirsi, e 'l conoscer chiaramente,
Che quanto piace al mondo e breve sogno.
('কত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে গান গেয়েছি
তা ভাবলে আজ আমার লজ্জা হয়—
জগতের খ্যাতি আজ মনে হয় নিশার স্বপন') ।

'অগাস্টিনের সঙ্গে সোক্রাতেস্' শীর্ষক কাল্পনিক কথোপকথনগুলিতে পেত্রার্কা তাঁর অন্তর্জীবনের অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ করেছেন। একদিকে যে-রকম তাঁর যশের জন্য ও সাংসারিক সুখভোগের জন্য আদিম আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, অন্যদিকে রয়েছে মধ্যযুগ-সুলভ ত্যাগের আদর্শ, যার একটা রূপ আমরা পেয়েছি অনেক পরবর্তী কালের লেখক গ্যেটের Entbehrung-তত্ত্বের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পেত্রার্কা সংশয় ও অনিশ্চয়তা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন। রেনেসাঁসের যুগধর্ম চরম পরিণতি লাভ করেছে সর্বকালের পরম বিশ্বাসে। পেত্রার্কা মনোনিবেশ করেছেন সেই শাশ্বতকালে যা আসছে, যখন সমস্ত রূপান্তরের শেষ হবে এবং এই দ্রুত সঞ্চরণশীল চক্র শান্তভাবে থেমে যাবে ; তখন কোনো গ্রীষ্ম জ্বলে উঠবে না, কোনো শীত জমে যাবে না। এবং ভবিষ্যতে কিছু ঘটবে না, অতীতে কিছু থাকবে না। শুধু এক শাশ্বত বর্তমান চিরকালের জন্য থেকে যাবে।

শেক্‌স্‌পিয়রের নায়ক-নায়িকা

১

যদি মার্জনা করা হয় তো বলতে পারি, ঈশ্বরের পরে শেক্‌স্‌পিয়রের মতো এত বড় স্রষ্টা আর দ্বিতীয় নেই। তাঁর মতো কবিসার্বভৌম সম্পর্কেই বলা চলে 'কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ'। অন্য লেখকের কাছে শেক্‌স্‌পিয়রের ঋণের প্রসঙ্গে এমার্সন আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন ল্যাণ্ডর-এর উক্তি—'Yet he was more original than his originals. He breathed upon dead bodies and brought them into life.'

শেক্‌স্‌পিয়রের সৃষ্ট নর-নারী শুধু প্রাণবন্ত নয়, তারা অবিস্মরণীয়। এই কারণে দেখা যায় শেক্‌স্‌পিয়র-সমালোচনায় চরিত্রাঙ্কনের উপর অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ড্রাইডেন, পোপ, ডক্টর জনসন সকলেই অবশ্য শেক্‌স্‌পিয়রের অসামান্য চরিত্র-চিত্রণ লক্ষ করেছেন, কিন্তু তাঁরা কেউ তাঁদের সমালোচনায় চরিত্রকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন নি। এ দিক থেকে প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা মরিস্‌ মর্গ্যান-এর 'অ্যান্‌ এসে অন্‌ দ্য ড্রামাটিক ক্যারেক্টার অফ্‌ জন্‌ ফল্‌স্টাফ্‌' (১৭৭৭)। এই সঙ্গে আরম্ভ হল চরিত্রকেন্দ্রিক সমালোচনার জয়যাত্রা, কারণ এর অল্পকাল পরেই রোম্যান্টিক যুগের পূর্ণবিকাশ ঘটে এবং চরিত্র-সংক্রান্ত সমস্যার, বিশেষত হ্যাম্‌লেট্‌-চরিত্রের,—রোম্যান্টিক সমালোচকদের যা প্রধান আলোচ্য।

রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। রোম্যান্টিক যুগের দুজন বিশিষ্ট সমালোচক হলেন হ্যাজ্‌লিট্‌ ও কোল্‌রিজ্‌। হ্যাজ্‌লিট্‌-এর শেক্‌স্‌পিয়র সমালোচনা-সংক্রান্ত প্রধান গ্রন্থের নামকরণ থেকেই তাঁর আলোচনার মুখ্য বিষয়-বস্তু স্পষ্ট হয়ে ওঠে—'দ্য ক্যারেকটার্স্‌ অফ শেক্‌স্‌পিয়র্স প্লেজ' (১৮১৭)। ভিক্‌টোরীয় যুগেও এই ধারার অনুসরণ করা হয়। এই ধারার চরম পরিণতি ও চরিত্রাভিমুখী সমালোচনার শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল এ. সি. ব্র্যাড্‌লী'র 'শেকস্‌পিরিয়ান্‌ ট্র্যাজেডি' (১৯০৪)। পরে এই ধারার বিরুদ্ধে গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ইতিহাসাশ্রয়ী শেক্‌স্‌পিয়র-সমালোচনায়, বিশেষত স্টোল্‌ ও শুয়েকিং-এর রচনায়। এই প্রতিক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য পরিণতি এল্‌. সি. নাইটস-এর প্রবন্ধ—'হাউ মেনি চিলড্রেন্‌ হ্যাড লেডি ম্যাক্‌বেথ ?' (১৯৩৩)। ইতিহাসাশ্রয়ী সমালোচকরা নাটকের পাত্র-পাত্রীকে নাটক থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখেন না, তাঁদের প্রেক্ষাপট সমগ্র যুগকে নিয়ে। ইদানীং আবার চরিত্রাভিমুখী আলোচনার দিকে সমালোচকদের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। শেক্‌স্‌পিয়রের চরিত্রাঙ্কন এত নিপুণ ও মর্মগ্রাহী যে, তাঁর সৃষ্ট নরনারীকে এক-একজন মানুষ হিসাবে বিচার করার প্রয়োজন আমরা স্বাভাবিকভাবে অনুভব করি।

শেক্‌স্‌পিয়রের বিচিত্র সৃষ্টিশালায় অনেক নর-নারীর ভিড়। এদের মধ্যে কেউ মহান্‌, কেউ নীচ, কেউ পণ্ডিত, কেউ মূর্খ, কেউ রানী, কেউ দাসী। তিনি সমান নিষ্ঠার সঙ্গে সকলকে এঁকেছেন, সূর্য যেমন গোলাপফুল ও ঝাঁটিফুলকে সমান তাপ

দিয়ে ফুটিয়ে তোলে। তাই ইমোজেন্-এর মতো সাধ্বীর চরিত্রসৃষ্টিতে শেক্স্‌পিয়র যে যত্ন নিয়েছেন, ইয়াগোর মতো পাষণ্ডের ক্ষেত্রেও সেই রকমই। ভালো অভিনেতার কাছে যেমন, ভালো নাট্যকারের কাছেও তেমনি কোনো চরিত্রই তুচ্ছ নয়। শেক্স্‌পিয়র নিজে ছিলেন একাধারে অভিনেতা ও নাট্যকার। আর অন্য বড় চরিত্রস্রষ্টার মতো শেক্স্‌পিয়রও কোনো দুটি চরিত্রকে এক রকমের সৃষ্টি করেন নি। একেবারে এক ধরনের চরিত্রযুগল যেখানে রয়েছে, যেমন হ্যাম্‌লেট্-নাটকে রোজেন্‌ক্রান্‌জ ও গিলডেন্‌স্টার্ন, সেখানেও দুজনের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট, যেমন পার্থক্য স্পষ্ট কালিদাসের 'শকুন্তলা'-নাটকের দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার মধ্যে।

অন্যান্য চরিত্রের গুরুত্ব যত বেশিই হোক না কেন, নায়ক-নায়িকার তুলনায় অনেক কম। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, শেক্‌স্‌পিয়র যে-যুগে লিখেছিলেন সে-যুগের সাহিত্যে নায়কের 'মৃত্যু' বা নায়িকার 'অপমৃত্যু' ঘটে নি। সে-যুগের সাহিত্যে নায়ক-নায়িকা শুধু জীবিতই নয়, তারা নাটকের কেন্দ্রস্থল। প্রধান চরিত্রের এই ভূমিকার গুরুত্ব কখনো কখনো এত ব্যাপক যে, নাটকটি সেই বিশেষ চরিত্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। তাই শিবহীন যজ্ঞের ইংরাজী অনুরূপোক্তি হচ্ছে "ডেন্-রাজকুমারের ভূমিকা-বিহীন 'হ্যাম্‌লেট্' নাটক"।

কমেডি, ট্র্যাজেডি ইত্যাদি প্রচলিত নাট্য-বিভাগ শেক্স্‌পিয়রের নাটকের ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত না হলেও আলোচনার সুবিধার জন্য সেই শ্রেণীবিভাগ মোটামুটি ভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

শেক্স্‌পিয়রের কমেডিগুলির তুলনায় ট্র্যাজেডিগুলি মহত্তর নাট্যসৃষ্টি—এই হল সাধারণ মত। যাঁর সাধারণ বুদ্ধি অসাধারণ, সেই ডক্টর জন্‌সন্ কিন্তু এই মত গ্রহণ করেন নি। (প্রসঙ্গত বলা যায়, জন্‌সনের মতে শেক্স্‌পিয়রের নাটকগুলি 'mingled' বা মিশ্র-প্রকৃতির, তাই তাঁর উক্তি—Shakespeare's plays are not in the rigorous and critical sense either tragedies or comedies, but compositions of a distinct kind.) তাঁর মতে, ট্র্যাজেডিতে শেক্স্‌পিয়র সব সময় হাস্যরসের অবতারণা করার সুযোগ খুঁজেছেন, কিন্তু কমেডিতে তিনি যেন অবসরবিনোদন করেছেন, কিংবা সে-ক্ষেত্রে তিনি স্বচ্ছন্দচারী। তাঁর ট্র্যাজেডির দৃশ্যগুলিতে সর্বদা কিসের যেন একটা অভাব অনুভূত হয়, কিন্তু তাঁর কমেডি প্রায়ই আমাদের আশাতীতভাবে তৃপ্ত করে। তাঁর কমেডি ভালো লাগে ভাবধারা ও ভাষার জন্য, ট্র্যাজেডি অধিকাংশ সময়ই ভালো লাগে বিশেষ কোনো ঘটনা কিংবা ঘটনা-পরম্পরার জন্য। শেক্স্‌পিয়রের ট্র্যাজেডি মনে হয় দক্ষ হাতের কাজ, তাঁর কমেডি মনে হয় সহজাত।

ডক্টর জন্‌সন্ যে অত্যুক্তি করেছেন, সেটা স্পষ্ট ; কিন্তু তিনি যে কথা বলেছেন সেটা একেবারে অমূলক নয়। শেক্‌স্‌পিয়রের কমেডি 'সহজাত' মনে হওয়া স্বাভাবিক, কারণ, এখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তুলনায় অনাবিল হাস্যরসের প্রাধান্য বেশি। শেক্‌স্‌পিয়র নির্লিপ্ত বা বিরক্ত দর্শকের আসন থেকে জীবননাট্য নিরীক্ষণ করেন নি। মানুষের জন্য তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে। তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষের চেয়ে কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন না। তিনি যখন স্মিতাননে মানুষের ত্রুটি, দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতা বিচার করেছেন তখন নিজেকেও বাদ দেন নি। নাট্যকারের এই বৈশিষ্ট্য অন্য লেখকের কমেডিতে দুর্লভ, বিশেষত কমেডি অফ্ ম্যানার্স-এ বা বিদ্রূপাত্মক কমেডিতে। তাই 'আ মিডসামার-নাইটস্ ড্রীম্' নাটকে রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে থেসিউস্-এর উক্তি শুধু শেক্‌স্‌পিয়রের নাটকেই সম্ভব। 'পিরামাস্ ও থিস্‌বি' নাটিকাটিতে বটম্-এর অঙ্গভঙ্গি দেখে হিপ্পোলাইটা যখন বিরক্তভাবে বলে, 'This is the silliest stuff that ever I heard', তখন থেসিউস্ তার উত্তরে বলে, 'The best in this kind are but shadows ; and the worst are no worse, if imagination amend them.' এই উক্তিকে আমরা শেক্‌স্‌পিয়রের কমেডির মর্মবাণীরূপে গ্রহণ করতে পারি।

শেক্‌স্‌পিয়রের কমেডিতে নায়কের চেয়ে নায়িকার আকর্ষণ, মর্যাদা ও গুরুত্ব বেশি। নায়কদের কখনো কখনো বেশ গ্রাম্য মনে হয়। তারা সন্দিগ্ধ প্রকৃতির ও অস্থিরচিত্ত। নায়িকাদের একনিষ্ঠতা প্রগাঢ়, এমন কি মাঝে মাঝে এ ব্যাপারে একটু বাড়াবাড়িও দেখা যায়। 'টুয়েলফ্‌থ্ নাইট' নাটকে অর্সিনো নারী-পুরুষের মানসিক পার্থক্য বিশ্লেষণ করেছে—

> Our fancies are more giddy and unfirm,
> More longing, wavering, sooner lost and won,
> Than women's are.

নিকৃষ্ট-চরিত্র নায়কদের মধ্যমণি 'টু জেন্‌টল্‌মেন্ অফ্ ভেরোনা' নাটকের তথাকথিত ভদ্র-যুগলের অন্যতম প্রোটিউস্। সে তার নিজের ও পরবর্তী কালের নায়কদের জন্য চতুরভাবে মার্জনা চেয়ে নিয়েছে—

> O heaven, were man
> But constant, he were perfect ; That one error
> Fills him with faults ; makes him run through all the sins.

এই প্রসঙ্গে 'মাচ্ অ্যাডু অ্যাবাউট নাথিং' নাটকে—ক্লডিয়ো-কে যার নায়ক বলা যেতে পারে—সেই 'দিব্য' সংগীতের কথা মনে পড়বে, যেখানে বক্রোক্তির আভাস রয়েছে—

> Sigh no more, ladies, sigh no more,
> Men were deceivers ever,
> One foot in sea and one on shore,
> To one thing constant never.

তবে নায়কের এই নিকৃষ্টতা শেক্স্‌পিয়রের ইচ্ছাকৃত, এ কথা মনে করার কারণ নেই। শেক্স্‌পিয়র খানিকটা নিরুপায় যেহেতু তিনি যে সমস্ত রোম্যান্টিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে তাঁর কমেডি লিখেছেন সেগুলিতে নায়কদের এই পরিচয়ই স্বীকৃত। তিনি যখন নিজে চরিত্র সৃষ্টি করার স্বাধীনতা পেয়েছেন তখন কিছুটা শুধরে নিয়েছেন।

শেক্স্‌পিয়রের নায়িকারা অধিকাংশই মাতৃহীনা। এরও একটা কারণ, তাঁর নাটকের কাহিনীগুলি মৌলিক নয়। শুধু চারজন নায়িকার মা রয়েছেন—জুলিয়েট ('রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট'), অ্যান্ পেজ্ ('দ্য মেরি ওয়াইভ্‌স্ অফ্ উইন্‌সর'), পার্ডিটা ('দ্য উইন্‌টার্স টেল্') এবং মারিনা ('পেরিক্লীজ')। এদের মধ্যে শেষোক্ত দু'জন আবার বড় হয়ে উঠেছে নিজেদের মাতৃহীনা জেনে। মা-মেয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার দিকে শেক্স্‌পিয়রের কোনো প্রবণতা লক্ষ করা যায় না। নায়িকাদের পিতার কথাও বিশেষ শোনা যায় না, কারণ অধিকাংশ নায়িকাই পিতৃমাতৃহীনা। জর্জ গর্ডন্ পরিহাসচ্ছলে বলেছেন, পিতাকে না রাখা বা দূরে রাখা নাট্যকারের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ নায়িকাদের প্রণয়-ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা স্বাভাবিক ; আর প্রণয় না থাকলে নায়িকার 'নায়িকাত্ব' কি রইলো ?

শেক্স্‌পিয়রের নাটকে নায়ক-নায়িকার মধ্যে কোনো ঘনিষ্ঠ প্রেমের দৃশ্য নেই। তাদের অন্তরঙ্গ অনুভূতি কোনো বিশেষ মুহূর্তে নিবিড় আবেগে স্পন্দিত হয়ে ওঠে নি। কমেডিতে নায়ক-নায়িকা সব সময় সতর্ক, রঙ্গ-ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ তরবারি তাদের রক্ষাকবচ। ট্র্যাজেডিতে নায়ক ও নায়িকার একান্ত-দৃশ্য দুর্লভ হলেও অবিস্মরণীয় —যেমন, রোমিও যখন জুলিয়েটকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, ওথেলো যখন ডেস্‌ডেমোনাকে হত্যা করছে। অ্যান্টনি ও ক্লিওপাট্রাকে কখনো পৃথক কোনো দৃশ্যে দেখানো হয় নি। শেক্স্‌পিয়রের রঙ্গমঞ্চে নায়িকার ভূমিকা বালক-অভিনেতার দ্বারা অভিনীত হত। নাটকে নরনারীর প্রেমের অন্তরঙ্গতা ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ যথাসম্ভব বর্জন করা ভিন্ন শেক্স্‌পিয়রের উপায়ান্তর ছিল না।

শেক্স্‌পিয়রের নাট্যরচনার প্রথম যুগের লেখাগুলির মধ্যে 'লাভ্‌স্ লেবার্স লস্ট্' বিশেষ ভাবে চিত্তাকর্ষক, যদিও হ্যাজলিট বলেছেন, শেক্স্‌পিয়রের কোনো কমেডি যদি আমাদের ছাড়তে হয় তা হলে সেটি হবে এই নাটক। এই কমেডিতে শেক্স্‌পিয়র চরিত্রাঙ্কনে বেশি নৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি ; পূর্বসূরী লিলি'র (Lyly) পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি ইতস্তত শব্দের ফুলঝুরি ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর কোনো নাটকে তিনি এমন কথার খেলায় মেতে ওঠেন নি—

Taffeta phrases, silken terms precise,
Three-piled hyperboles, spruce affectation,
Figures pedantical.

সুনির্দিষ্টভাবে এই নাটকের নায়ক-নায়িকা নিরূপণ করা কঠিন। ন্যাভারের রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও তাঁর তিন রসিক বন্ধু, বিরূন, লঙ্যাভিল্ ও দিউমেন্, এরাই নাটকের প্রধান পুরুষচরিত্র। এরা ঠিক করেছিল, তিন বছর অধ্যয়নে মনোনিবেশ করবে ও নারী-ভূমিকা-বর্জিত জীবন যাপন করবে। সব উল্টে গেল ফরাসী রাজ-কন্যা ও তাঁর তিন সখীর—রজালীন, মারায়া ও ক্যাথারীন-এর—আগমনের ফলে। এরাই নাটকের প্রধান নারী-চরিত্র। চারটি পুরুষ চারটি নারীর প্রতি আকৃষ্ট হল। অধ্যয়নের আদর্শ-ভঙ্গ ঘটে নি, কারণ যুবকদের পক্ষে রমণীর মনের চেয়ে পাঠাভ্যাসের জন্য প্রিয়তর বিষয় আর কি হতে পারে? এদেশে আচার্য শঙ্করের যুগ থেকে আমরা জানি, 'তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ'! তবে এ নাটকের নায়ক-নায়িকাদের চরিত্র অনেকাংশে কৃত্রিম। বরং কস্টার্ড-এর মতো বিদূষকের মধ্য দিয়ে বাস্তব জীবনের আভাস পাওয়া যায়।

'দ্য কমেডি অফ এরর্স' প্লট-সর্বস্ব নাটক; কমেডি না বলে প্রহসন বললেও অত্যুক্তি হবে না। অ্যান্টিফোলাস্-ভ্রাতৃদ্বয়ের নায়কোচিত গুণ বিশেষ নেই; অ্যাড্রিয়ানা ও লুসিয়ানা দুই বোনের চরিত্রেও নায়িকাসুলভ বৃত্তির অভাব, যদিও এরা দু'জনে দুটি ভিন্ন ধরনের চরিত্র। অধীর-প্রকৃতির অ্যাড্রিয়ানা ঈর্ষায় ক্ষিপ্ত; স্থির লুসিয়ানা শান্ত সৌন্দর্যে আবিষ্ট।

'দ্য টেমিং অফ দ্য শ্রু'ও কাহিনী-প্রধান নাটক। পেট্রুকিও এবং ক্যাথারীনার চরিত্র আমাদের বিশেষ আকৃষ্ট করে না, কিন্তু নায়ক কিভাবে নায়িকাকে জব্দ করলো সেটা আমরা উপভোগ করি।

রোমান্স ও রিয়্যালিজম্-এর যে সুচারু সংমিশ্রণ শেক্‌স্‌পিয়রের অনেক পরিণত কমেডির বৈশিষ্ট্য, তার প্রথম সার্থক প্রয়োগ দেখা যায় 'দ্য টু জেন্‌টল্‌মেন্ অফ ভেরোনা' নাটকে। এখানে কমেডির অনেক উপাদান রয়েছে যেগুলি শেক্‌স্‌পিয়র পরবর্তী কমেডিগুলিতে ব্যবহার করেছেন; এই নাটকের ছকে পরবর্তী নাটক-গুলি সাজানো হয়েছে। নায়িকার (যেমন জুলিয়ার) বালকের ছদ্মবেশ-ধারণ, নায়িকার (যেমন সিল্‌ভিয়ার) অরণ্যে আশ্রয়-গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনা একাধিক পরবর্তী কমেডিতে দেখা যাবে; সিল্‌ভিয়া যত চিত্তহারিণী হোক, জুলিয়ার নিষ্ঠা যতই আন্তরিক হোক, তারা আমাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে না। নায়ক দু'জনের সম্পর্কেও এ কথা বলা চলে। ভ্যালেন্‌টাইনের চরিত্রের কিছু প্রশংসনীয় দিক থাকলেও বন্ধুত্বকে প্রণয়ের চেয়ে বড় করে দেখা বেশ বিসদৃশ মনে হয়। প্রোটিয়াস্-এর বিশ্বাসঘাতক স্বভাব তার নামের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে। নতুন কমেডি নিয়ে শেক্‌স্‌পিয়রের প্রথম পরীক্ষামূলক নাটক 'দ্য টু জেন্‌টলমেন্ অফ

ভেরোনা'। উৎকর্ষ ও অপকর্ষ এখানে পাশাপাশি থেকে গেছে। প্রোটিয়াসের ভাষায় বলা চলে, এ নাটকে রয়েছে—

The uncertain glory of an April day,
Which now shows all the beauty of the sun,
And by and by a cloud takes all away.

পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালা শেষ করে শেক্স্‌পিয়র প্রথম পরিণত কমেডি রচনা করলেন 'আ মিডসামার-নাইটস্ ড্রীম্' নাটকে ; এ নাটকে পরীরা রয়েছে, সুতরাং ম্যাজিকের প্রাচুর্য ; কিন্তু নাটকের সব চেয়ে বড় ম্যাজিক শেক্স্‌পিয়রের কবিত্ব ও কলাকৌশল। চাঁদের আলোর বাঁধ ভেঙেছে আর এই চন্দ্রালোকপ্লাবিত জগতে অতনুদেবের দৌরাত্ম্য চলেছে—'Lord, what fools these mortals be!' এথেন্স-এর ডিউক থেসিউস অ্যামাজন্-মহিষী হিপ্পোলাইটা'র বাগ্‌দত্ত, লাইস্যাণ্ডার ভালোবাসে হার্মিয়াকে, ডিমেট্রিয়াস্ ভালোবাসে হেলেনাকে, যদিও ডিমেট্রিয়াস্ প্রথমে হার্মিয়ার প্রতি আকৃষ্ট—তিন জন নায়ক তিন জন নায়িকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরীদের রাজা ওবেরন ও পরীদের রানী টিটানিয়া। কাহিনা-বৈচিত্র্যে, প্লটের বিভিন্ন রসের মিশ্রণে, রোম্যান্স, খেয়ালখুশী ও হাস্যরসের সংযোগে নাটকটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। নায়ক-নায়িকাদের চেয়ে তাঁতী বটম্-এর আকর্ষণ কিছু কম নয়,—যে সব অবস্থাতেই মাথা ঠিক রেখে নিজেকে চালাতে পারে (যখন মাথাটা গাধার, তখনও) এবং আমাদের হাসাতে পারে। সে একাধারে নাট্য-প্রযোজক, অভিনেতা ও বিদূষক।

'দ্য মার্চেন্ট অফ্ ভেনিস্' নাটকের নায়িকা পোর্শিয়া অসাধারণ চরিত্র। মরক্কো-রাজের মন্তব্যে অত্যুক্তি থাকলেও তা সর্বৈব মিথ্যা নয়—

...all the world desires her ;
From the four corners of the earth they come,
To kiss this shrine, this mortal-breathing saint.

ব্যাসানিও'র যখন কাস্কেট-নির্বাচনের পালা, তখন পোর্শিয়ার উৎকণ্ঠা থেকে আমরা বুঝতে পারি তার মধ্যে দেবীর সৌন্দর্য থাকলেও নারীর হৃদয় আছে। রসবোধের সঙ্গে পরিমিতি, সাহসের সঙ্গে সংযম এবং বুদ্ধির সঙ্গে সাংসারিক জ্ঞানের যে সমন্বয় আমরা পোর্শিয়ার মধ্যে পাই, বিশেষত বিচার-দৃশ্যে যার জলন্ত সাক্ষ্য রয়েছে, তার তুলনা শেক্স্‌পিয়রের নরনারীর মধ্যেও দুর্লভ। অসামান্য পরিহাসপ্রিয়তা, চাপল্য অথচ অন্তর্নিহিত স্থিরতার সমাবেশ দেখা যায় বেল্‌মন্টের উদ্যানে, যখন ভোর হতে আর দেরি নেই। ব্যাসানিও-তে নায়কোচিত গুণাবলীর প্রাচুর্য নেই ; নাটকে তার প্রধান ভূমিকা পোর্শিয়ার পাণিপ্রার্থীরূপে। তার অকারণে বিষণ্ণ বন্ধু অ্যান্টনিও বরং আমাদের অনেক বেশি আকৃষ্ট করে ; হয়তো শেক্স্‌পিয়রকেও করেছিল,—যার ফলে, তিনি নাটকের নামকরণের সময় তাকে

স্মরণ করেছেন। শাইলক্‌-কে কেউ কেউ এ নাটকের মুখ্য চরিত্ররূপে বর্ণনা করেছেন, তবে এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। শাইলক্‌-এর ভূমিকা অবশ্য নাটকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শেক্‌স্‌পিয়র তার চরিত্রের মানবিক দিক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। রাজা লীয়র-এর মতো সেও **'more sinned against than sinning'.**

'মাচ্‌ অ্যাডু অ্যাবাউট্‌ নাথিং' এবং 'অ্যাজ ইউ লাইক্‌ ইট্‌' অনেকাংশে সমগোত্রীয় নাটক। প্রথম নাটকের বিয়াট্রিস্‌ ও দ্বিতীয় নাটকের রজালিণ্ড্‌ দুই নায়িকাই **'pleasant-spirited'**, এবং অনেক সময়ই তাদের কথাবার্তা ছুরির ফলার মতো বেঁধে। তবে চুম্বকের মতো তাদের আকর্ষণ এবং বেনেডিক্‌ ও অর্ল্যাণ্ডোর সাধ্য কি যে আকৃষ্ট না হয়, যদিও নারীবিদ্বেষী বেনেডিক্‌ এর আগে দুই তিনবার মদনের ধনুর্ছিলা ছিন্ন করেছে। এই দুই নাটকে নায়িকাদের বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ আমাদের জর্জ মেরিডিথ্‌-এর কমেডি-সংক্রান্ত ধারণার কথা মনে করিয়ে দেয়। 'টুয়েল্‌ফ্‌থ্‌ নাইট্‌' নাটকের ভায়োলা জনচিত্তজয়ী নায়িকা, তার কথাবার্তাতেও বুদ্ধির দীপ্তি; তার পাশে অলিভিয়াকে নিষ্প্রভ মনে হয়, যদিও কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন নাটকের প্রকৃত নায়িকা অলিভিয়া।

শেক্‌স্‌পিয়রের যে-কমেডিগুলিকে 'ডার্ক কমেডি' বলা হয়, সেগুলিকে 'প্রবলেম্‌ প্লে' বা সমস্যামূলক নাটকও বলা যেতে পারে। জ্যাকোবীয় যুগের আরম্ভে যে নিরানন্দের সুর শোনা গেল তারই প্রকাশ শেক্‌স্‌পিয়র-এর এই নাটকগুলিতে। ইলিজাবেথের যুগের উচ্ছ্বাস প্রশমিত, অন্তর্হিতও বলা যেতে পারে। পিউরিট্যান অ্যাংলিক্যান্‌দের বিরোধ তীব্রতর হয়ে উঠছিল। নাটক ক্রমশই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে রাজসভার দিকে ঝুঁকছিল। নৈরাশ্যের সর্বব্যাপী পরিবেশকে হয়তো শেক্‌স্‌পিয়র রূপ দিতে চেষ্টা করছিলেন এই সব নাটকে, কবি ডান্‌ একটি পঙ্‌ক্তিতে যেটা প্রকাশ করেছেন—**'And new philosophy calls all in doubt.'**

'অলস্‌ ওয়েল্‌ দ্যাট্‌ এন্‌ড্‌স্‌ ওয়েল্‌' নাটকের নায়িকা হেলেনাকে কোল্‌রিজ্‌ 'লাভ্‌লিয়েস্ট্‌ ক্যারেক্টার' বলেছেন, কিন্তু আধুনিক সমালোচকেরা তাকে নানা কটূক্তিতে ভূষিত করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা হেলেনাকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করি। আমরা বার্নার্ড শ-এর নায়িকা অ্যান্‌-এর সঙ্গে তার তুলনা করি; এতে তার উপর অবিচার করা হয়। প্রেমিককে লাভ করার জন্য প্রেমিকার প্রচেষ্টা তো অনাদিকাল থেকেই চলে আসছে; কালিদাসের নায়িকা পার্বতী শঙ্করকে লাভের জন্য কঠোর তপশ্চর্যা বরণ করে নিয়েছিলেন। বার্টার্ম-এর

পরিবর্তনও ইলিজাবেথের যুগের মনস্তত্ত্ব-শাস্ত্র অনুসারে কিছু অদ্ভুত নয়, সুতরাং নায়কের এই পরিবর্তনের জন্য নাট্যকারকে দোষারোপের কোনো প্রয়োজন নেই।

'মেজার ফর মেজার' নাটকে প্রধান পুরুষচরিত্র এন্‌জেলোর স্বভাব বার্টার্ম-এর চেয়ে নিকৃষ্টতর, কিন্তু তার পরিবর্তন একই রকম আকস্মিক এবং তা কম আন্তরিক নয়। আর নায়িকা ইসাবেলারও তো পরিবর্তন কম হয় নি। সন্ন্যাসিনী হবার দৃঢ় সংকল্প বিসর্জন দিয়ে ডিউক-এর গৃহিণী হবার বাসনা দর্শকের কাছে খানিকটা অপ্রত্যাশিত।

'ট্রয়লাস্ অ্যাণ্ড্ ক্রেসিডা' সমস্যামূলক তো বটেই, কিছুটা দুর্বোধ্যও। ট্রয়লাস্ রোমিওর মতো রোম্যান্টিক প্রেমিক, কিন্তু সে নিজেকে বিকিয়ে দিল একজন ভ্রষ্টা নারীর কাছে। ক্রেসিডা নারীজাতিরই একজন, যে-নারীজাতি হ্যাম্‌লেটের কাছে 'ফ্রেল্‌টি'র (frailty) সমার্থক মনে হয়েছিল! ডায়োমিডিস-এর বাহুলগ্না ক্রেসিডাকে দেখে ট্রয়লাস্ কিছুতেই ভাবতে পারল না যে, এই সেই ক্রেসিডা যে ছিল ট্রয়লাসের সঙ্গিনী; তাই তার মনে হল—**If there be rule in unity itself,/This is not she.**

শেক্‌স্‌পিয়রের বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে রচিত। এই ধরনের নাটক তখনকার দিনে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। ইতিপূর্বেই পীল তাঁর 'প্রথম এড্‌ওয়ার্ড', মার্লো তাঁর 'দ্বিতীয় এড্‌ওয়ার্ড' এবং গ্রীন্ তাঁর 'চতুর্থ জেম্‌স্' রচনা করেছিলেন। শেক্‌স্‌পিয়র যে এই সব 'ইউনিভার্সিটি উইট'দের অনুসরণ করবেন, এটা স্বাভাবিক। প্রথম ইলিজাবেথের রাজত্বকালের শেষ পনের বছরে ইংল্যাণ্ডের রঙ্গমঞ্চে ঐতিহাসিক নাটক বেশ জমে উঠেছিল। আর্মাডার ব্যাপারে দেশপ্রেমের প্লাবন এলে সেই আবহাওয়ায় এটাই ছিল প্রত্যাশিত। অতীতে বিদেশী শত্রু ও অভ্যন্তরীণ কলহের বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম ইংরেজদের করতে হয়েছে, সেটা পরবর্তী কালের ইংরেজদের কাছে বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ মনে হল। রাষ্ট্রীয় চেতনার নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে অতীতের স্মৃতির যথেষ্ট তাৎপর্য মানতেই হয়।

এক দিক থেকে দেখলে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস নিয়ে শেক্‌স্‌পিয়রের লেখা নাটক-গুলির নায়ক ইংল্যাণ্ড স্বয়ং। দেশের অতীত গৌরব ও মহান্ ঐতিহ্য এ সব নাটকে বিচিত্র বর্ণে উদ্‌ভাসিত। 'কিং জন্' নাটকে বলা হয়েছে—এই ইংল্যাণ্ড কোনো দিন বিজয়ী শক্তির পদানত হয় নি, কোনো দিন হবেও না, যদি সে নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করে। আর 'রিচার্ড দ্য সেকেণ্ড' নাটকে ইংলণ্ডের প্রশস্তি অগ্নিময় অক্ষরে উজ্জ্বল—

This royal throne of kings, this scepter'd isle,
This earth of majesty, this seat of Mars,
This other Eden, demi-paradise ;
This fortress, built by nature for herself,
Against infection, and the hand of war ;
This happy breed of men, this little world.

শেক্‌স্‌পিয়রের ঐতিহাসিক নাটকগুলি সম্বন্ধে শ্লেগেলের উক্তি—'রাজদর্পণ'—বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমালোচক ডাউডেন্ দেখিয়েছেন যে, এই সব নাটকে শেক্‌স্‌পিয়র ইংলণ্ডেশ্বরের ছ'টি পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি আমাদের উপহার দিয়েছেন ('অষ্টম হেন্‌রী' নাটকটিকে যদি আমরা কোনো বিশেষ উপলক্ষে রচিত মনে করে বাদ দিই এবং চতুর্থ এডওয়ার্ডের চরিত্র সামান্য যেটুকু পাই সেটা যদি না ধরি, তা হলে এই ছয় সংখ্যাটাই দাঁড়াচ্ছে)। এই ছ'টিকে আবার দু' ভাগে ভাগ করতে পারি, এক ভাগে রাজকীয় দুর্বলতার ছবি, আর এক ভাগে রাজকীয় পরাক্রমের। একটি ভাগে জন্, দ্বিতীয় রিচার্ড ও ষষ্ঠ হেনরী এবং অন্য ভাগে চতুর্থ হেন্‌রী, পঞ্চম হেন্‌রী ও তৃতীয় রিচার্ড।

জন্ রাজকীয় অপরাধী, তাঁর দুর্বলতা অপরাধ-জনিত। তাঁর মহত্ত্ব শক্তি, বা অন্য কোনো রাজোচিত গুণ নেই। তিনি এতই দুর্বল যে, কাপুরুষ ও নীচ হতে পেরেছেন, কিন্তু নিষ্ঠুর হতে পারেন নি। তাঁর মধ্যে আমরা সরলতার পরিবর্তে পাই কুটিলতা। তাই তাঁর চরিত্র আমাদের মনে যতটা ঘৃণার উদ্রেক করে, ততটা সম্ভ্রমের নয়। রাজমাতা এলিনরের সম্পর্কেও একথা বলা চলে। তিনি সব সময় জন্‌কে প্ররোচনা দিয়েছেন। আর একটি মুখ্য নারীচরিত্র কন্‌স্ট্যান্স-এর। তিনি জন্-এর দাদা জেফ্রে'র বিধবা, এবং পুত্র আর্থার যাতে সিংহাসন পায় সে-জন্য এই উচ্চাভিলাষিণী নারীর প্রচেষ্টার অন্ত নেই। ফরাসী-রাজকেও তিনি স্বমতে আনতে পেরেছেন।

ষষ্ঠ হেন্‌রী রাজকীয় সন্ত। তাঁর দুর্বলতা সাধুতা-জনিত। তাঁর কোমল হৃদয় কোনো নৃপতির উপযুক্ত নয়; তাঁর রাজমুকুটের সঙ্গে তাঁর ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গতি নেই। 'His champions are the prophets and apostles, his weapons holy saws of sacred writ, his study is his tiltyard, and his loves are brazen images of canonized saints'—শেক্‌স্‌পিয়রের ভাষাতেই তাঁর এই পরিচিতি। বরং তাঁর রানীর চরিত্রে রাজকীয় শৌর্যবীর্যের যথেষ্ট লক্ষণ রয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব শুধু সৌন্দর্যে নয়, নেতৃত্বেও। রাজা, রাজ্য এবং সৈন্য—এ সবই তাঁকে চালনা করতে হয়েছে। তাই তাঁকে বলা হয়েছে 'ক্যাপটেন্ মার্গারেট', বলা হয়েছে 'she-wolf of France'। 'হেন্‌রী দ্য সিক্‌স্‌থ্' নাটকের প্রথম খণ্ডে জোন্ অফ আর্ক-এর চরিত্রও রয়েছে; কিন্তু যদিও ফরাসীদের

কাছে তিনি দেবী, ইংরাজদের কাছে তিনি দানবী—'railing Hecate', 'damned sorceress', 'a vile fiend and a shameless courtesan'। আমরা যারা বার্নার্ড শ-এর 'সেন্ট জোন্' কিংবা আনুই-এর 'লালুয়েৎ' নাটক পড়েছি, তাদের কাছে শেক্‌স্‌পিয়রের জোন্-চরিত্রচিত্রণ বীভৎস মনে হবে। তবে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, শেক্‌স্‌পিয়র তখনকার দিনের প্রচলিত ধারণার অনুবর্তন করেছেন মাত্র। তদানীন্তন 'দেশপ্রেমিক' ইংরাজদের পক্ষে এটা ভাবা অসম্ভব ছিল যে, ডাইনী না হয়ে একটা বিদেশী চাষার মেয়ে তাদের 'This England'-এর মতো দেশকে কোনো দিন যুদ্ধে হারাতে পারে!

দ্বিতীয় রিচার্ড রাজকীয় ভাবুক, তাঁর দুর্বলতা ভাবপ্রবণতা-জনিত। তিনি নৃপতি হওয়ার চেয়ে নৃপতির ভূমিকায় অভিনয় করতেই যেন বেশি ভালোবাসেন এবং তাঁর চালচলনে অনেক সময় একটা নাটুকে ভাব দেখা যায়। কল্পনাবিলাসী রাজা অনেক সময় নিজের দুঃখ-যন্ত্রণাকেও তাঁর বিলাসের উপকরণ মনে করেছেন। বেদনা যেন কোনো সুন্দরী নারী, রাজপুরুষের বাহুপাশে যার প্রকৃত শোভা। মাঝে মাঝে অভিনেতা রাজা আবার দর্শকের ভূমিকাও গ্রহণ করেছেন মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে ঘটনাপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে। তাই জীবনের এক নিদারুণ সন্ধিক্ষণে হঠাৎ তিনি একটা আয়না চেয়ে বসলেন যাতে নিজের মুখ দেখতে পারেন, তারপর আয়নাটা ভেঙে ফেললেন বেশ নাটকীয়ভাবে—

> A brittle glory shineth in this face :
> As brittle as the glory is the face...

অন্য শ্রেণীভুক্ত তৃতীয় রিচার্ড রাজকীয় অপরাধী, অপরাধই তার শক্তির উৎস। সে একাধারে নায়ক ও দুর্বৃত্ত, নৃপতি ও খুনী। তাই তার সম্পর্কে অন্যান্য চরিত্রের অভিমত কঠোর ও তিক্ত হওয়াই স্বাভাবিক—'hell's black intelligencer', 'that foul defacer of God's handiwork', 'that bottl'd spider, that foul hunch-back'd toad.' দ্বিতীয় রিচার্ডের মতো সেও অভিনেতা, কিন্তু শখের অভিনেতা নয়। অভিনয় তার দুশ্চরিত্র জীবনের হাতিয়ার, যার জোরে হত্যাকারী সে, শোকযাত্রা থামিয়ে নিহত ব্যক্তির স্ত্রীকে প্রেম নিবেদন করতে সাহস পায়। আর যে সুন্দরী অ্যান্-এর কাছে কুব্জ রিচার্ড ছিল স্বামিহন্তা নারকীয় কীট, সেই অ্যান্ও শেষ পর্যন্ত তার দিকে ঝুঁকলো, এমনই তার অভিনয়-নৈপুণ্য!

চতুর্থ হেন্‌রীর শক্তির উৎস তাঁর কূটবুদ্ধিতে। তিনি বলপূর্বক রাজসিংহাসন অধিকার করেছেন বলে তাঁকে অনেকবার বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছে, যদিও তিনি নিপুণ শাসক। বিবেকের দংশনে তিনি পীড়িত ও দুর্বল; অনিদ্রা তার সাথী। নাটকের দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁর বয়সের সঙ্গে দুর্বলতাও বেড়েছে। রাজপুত্র হ্যাল্ বাইরে হাসিখুশী ও খেয়ালী হলেও আদর্শ রাজার অনেক গুণাবলী তার

রয়েছে। নাটকের দ্বিতীয় খণ্ডে এটা আরও ভালোভাবে বোঝা যায়। ফল্‌স্টাফ্‌ ও অন্যান্য ভবঘুরে আমুদেদের সঙ্গে মিশলেও কোথায় যেন হ্যাল্‌ একটা দূরত্ব বজায় রেখেছিল। তারপর দেখা গেল, দ্বিতীয় খণ্ডে সে নিজেকে ক্রমশ সরিয়ে নিয়েছে। রাজপুত্র রাজাতে রূপান্তরিত হতে চলেছে। ফল্‌স্টাফ্‌-এর প্রতি তার হৃদয়হীনতা ক্ষমা করা শক্ত, কিন্তু হ্যাল্‌ যে ভবিষ্যতের আদর্শ রাজা এটা অনুমান করা কঠিন নয়।

'হেন্‌রী দ্য ফোর্থ' নাটকের দ্বিতীয় অংশের নায়ক ফল্‌স্টাফ্‌। এই ফল্‌স্টাফ্‌ এক বিচিত্র চরিত্র—'This sanguine coward, this bed-presser, this horseback-breaker, this huge hill of flesh' তার অন্যতম পরিচয়। অথচ শেক্‌স্‌পিয়রের চরিত্র-চিত্রণের কৌশলে এই বুড়ো, মোটা, মিথ্যাবাদী, ভীরু, মদ্যপ লম্পট কত মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে। সে শুধু নিজেই রসিক নয়, সে রসস্রষ্টা, অফুরন্ত হাস্যরসের উৎস। তাই যদি শেক্‌স্‌পিয়রের এই নাটককে আমরা 'কমেডি' রূপে চিহ্নিত করি, তা হলে সেটা ভুল হবে না। হ্যাল্‌ ও ফল্‌স্টাফের একেবারে বিপরীত প্রকৃতির চরিত্র হল সার্থক-নামা হট্‌স্পার। নাটকের তৃতীয় অংশের নায়ক সে। অন্তহীন তার সাহস ও বীরত্ব; 'ফ্যাকাশে চাঁদের কাছ থেকে জলজলে যশ কেড়ে আনার জন্যে উঁচুতে লাফ দেওয়া' তার কাছে অনায়াস-সাধ্য। দু-দশটা শত্রু মারা তার কাছে কোনো কাজই নয়—He kills me some six or seven dozen Scots at a breakfast, washes his hands, and says to his wife, 'Fie upon this quiet life! I want work.'

'হেন্‌রী দ্য ফোর্থ' শুধু ইতিহাস নয়; সমস্ত ইংল্যাণ্ড—যে দেশকে শেক্‌স্‌পিয়র ভালোবাসতেন—এই নাটকে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ইংল্যাণ্ডেরই প্রতিকৃতি এই দুই খণ্ডের নাটক। প্রতিকৃতি হয়তো বাস্তবানুগ নয়। তবে এখানে জাতীয় জীবনের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা বাস্তবের চেয়ে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক। নাটকের নাটকীয়তা ছাপিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মহাকাব্যের পরিধি ও বিশালতা। ঐতিহাসিক মূল্য নিয়ে ইতিহাসবেত্তারা বিচার করুন; সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শেক্‌স্‌পিয়র সর্বকালের দর্শক ও পাঠকদের চিত্ত জয় করে নিয়েছেন, একথা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই।

'হেন্‌রী দ্য ফিফ্‌থ্‌' নাটকে আদর্শ রাজার চরিত্রে শেক্‌স্‌পিয়রের ঐতিহাসিক নাটকের পূর্ণ পরিণতি। রাজপুত্র হ্যাল্‌ এখন খেয়ালী তরুণ নন, রাষ্ট্রের কর্ণধার। তিনি 'the mirror of all Christian kings' হয়েও যথেষ্ট বাস্তববাদী এবং সাহসী যোদ্ধা। তাঁর শক্তির প্রকৃত উৎস তাঁর অমলিন স্বভাব। একদিকে তিনি বজ্রসম কঠিন, অন্য দিকে কুসুমের মতো কোমল। নাট্যকার তাঁকে লোকোত্তর রাজ-চরিত্রের উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে সৃষ্টি করেছেন। আদর্শ রাষ্ট্রের তিনি আদর্শ নায়ক।

বায়রন তাঁর *Childe Harold* কাব্যের চতুর্থ সর্গে রোম নগরীকে 'city of the Soul' আখ্যা দিয়েছেন। শেক্‌স্‌পিয়রের নাটকে রোমকে এক বিশেষ অর্থে 'city of the Soul' বলা যায়। মানুষের মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব শেক্‌স্‌পিয়রের রোমান্ নাটকগুলির মুখ্য বিষয়। এটা স্বাভাবিক, কারণ এ নাটকগুলি সবই ট্র্যাজেডি। ঐতিহাসিক নাটক ও কমেডি নিয়ে শেক্‌স্‌পিয়র ব্যস্ত ছিলেন ; তারপর তাঁর ট্র্যাজেডি লেখার ঝোঁক হয় এবং তিনি রোমের ইতিহাস থেকে কাহিনী নির্বাচন করেন। তাঁর নিজের নায়ক অ্যান্টনির সঙ্গেই তাঁর তুলনা করা চলে ; ক্লিওপাট্রার ভাষায়—

He was disposed to mirth, but on the sudden
A Roman thought hath struck him.

সব পথই এক জায়গায় শেষ হয়, এক লক্ষ্যে এসে মিলে যায়। আগে হোক, পরে হোক, সকলকে একবার রোম হয়ে যেতে হয় ; শেক্‌স্‌পিয়রকেও যেতে হয়েছিল।

তাঁর ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস-আশ্রিত নাটকগুলিতে শেক্‌স্‌পিয়র যেমন অতীতের এক অধ্যায়কে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন, রোমক নাটকগুলিতেও তাই। বিগত দিনগুলি তাঁর নাটকের পাতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিও তাই। তারা রক্ত-মাংসের মানুষের মতো সজীব। এইসব করার জন্য শেক্‌স্‌পিয়র তাঁর প্রয়োজন মতো ইতিহাসের কিছু কিছু পরিবর্তন করতে দ্বিধা করেন নি। তবে ইংরাজী ঐতিহাসিক নাটকগুলির তুলনায় রোমক নাটকগুলিতে এ পরিবর্তন অনেক কম। তার একটা কারণ, শেক্‌স্‌পিয়র ইংরাজী ঐতিহাসিক নাটকের প্লট সাধারণত হলিন্‌শেড্ প্রমুখ ইতিবৃত্তকারগণের আখ্যায়িকা থেকে গ্রহণ করেছেন। এঁদের শুষ্ক ঘটনাপঞ্জীর মধ্যে কাব্যের রস খুঁজে পাওয়া যাবে না—নাটকীয় মদিরা তো নয়ই। প্লুটার্ক কিন্তু ছিলেন সাহিত্যশিল্পী ; তাঁর রচনা নাটকীয় গুণে সমৃদ্ধ। তাই প্লুটার্ক শেক্‌স্‌পিয়রের কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস নিয়ে লেখা শেক্‌স্‌পিয়রের নাটকগুলিতে ট্র্যাজেডি ঘনীভূত হয়ে উঠতে পারে নি। সেগুলি ঐতিহাসিক নাটকই থেকে গেছে। রোমক নাটকগুলি মূলত ট্র্যাজেডি। মহৎ-চরিত্র নায়কের বহির্জীবনে পরাজয় নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু, যদিও কেউ কেউ বলেছেন—'রোমই শেক্‌স্‌পিয়রের রোমক নাটকগুলির নায়ক।' (তবে 'শকুন্তলা' নাটকে তপোবন ও 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট্' নাটকে আর্ডেন্ বনের মতো এ নাটকগুলিতে রোম-নগরের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, একথা অস্বীকার করা চলে না।) শেক্‌স্‌পিয়রের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিগুলির সঙ্গে রোমক নাটকগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। হ্যাম্‌লেট ও ব্রুটাস্, এই উভয় চরিত্রের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। এদের দুজনের সম্বন্ধেই বিশেষভাবে বলা যায়—'with himself at war'—এই কথাগুলি।

প্রথম রোমক নাটক 'জুলিয়াস্ সীজার' শেক্‌স্‌পিয়রের জনপ্রিয় নাটকগুলির অন্যতম। নামে জুলিয়াস সীজার নাটকের নায়ক হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি শুধু নাটকের রাজনৈতিক দিকের নায়ক। এ নাটকের যে ট্র্যাজিক দিক, সে দিকের নায়ক ব্রুটাস্, কারণ প্রধানত এ ব্রুটাসেরই ট্র্যাজেডি। এই দ্বৈত নায়কের বিভ্রান্তি এড়াবার একটা উপায় নাটকটিকে 'নায়কহীন' রূপে বর্ণনা করা। তবে এই সমাধান অক্ষমতার সমাধান—গ্রন্থি মোচন করতে না পেরে ছেদন করতে যাওয়ার মতো।

সীজারের দুর্বলতা, তাঁর ত্রুটিবিচ্যুতি শেক্‌স্‌পিয়র দেখিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সীজারের মহত্ত্বও নাটকের চরিত্রাঙ্কনে পূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে। যাঁরা প্রথম দিকটা শুধু দেখেন, দ্বিতীয় দিকটা দেখেন না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিরপেক্ষ বিচারের শক্তি হারিয়েছেন। শেক্‌স্‌পিয়রের দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও প্রসার কোনো বিশেষ মতবাদ কোনো দিন আচ্ছন্ন করতে পারে নি। তাই তাঁর নাটক পড়ার সময় আমরা যদি মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে পড়তে পারি, তা হলে আমরা মহাকবির শিল্প-সৃষ্টিকে প্রকৃত মর্যাদা দিতে পারবো।

ব্রুটাসের চরিত্রও শেক্‌স্‌পিয়র নিপুণ হাতে এঁকেছেন। তার হৃদয়ে নীচতার লেশমাত্র নেই, কিন্তু তার বুদ্ধিবৃত্তিতে মালিন্য এসেছে। তার বিচারশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। সীজার তার ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ বন্ধু—সীজারকে সে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে ; কিন্তু রাষ্ট্র ব্রুটাসের কাছে ব্যক্তিগত জীবনের চেয়ে অনেক বড়, যেহেতু সে আদর্শবাদী। তার ধারণা, রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য সীজারকে হত্যা করা ছাড়া আর পথ নেই। সেই পথই সে বেছে নিয়েছে। অমঙ্গলের ভাবী আশঙ্কাকে যে গুরুত্ব সে দিয়েছে, তা আমরা তার মতো দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর লোকের কাছে আশা করি না। তবু তাকে **'the noblest Roman of them all'** বললে খুব মিথ্যা বলা হবে না।

ক্যাসিয়াস্ (**'the last of all the Romans'**) ও সুচতুর অ্যান্টনি এ নাটকের অন্য দুটি প্রধান চরিত্র। নারীর স্থান এ নাটকে সামান্য হলেও ব্রুটাসের জীবনে তার সহধর্মিণী পোর্শিয়ার স্থান সামান্য ছিল না। পোর্শিয়া সীজারের স্ত্রী ক্যালপার্ণিয়ার মতো 'শুধু স্ত্রী' ছিল না। সে ছিল ব্রুটাসের প্রকৃত জীবনসঙ্গিনী—ইন্দুমতীর মতো 'গৃহিণী, সচিব ও সখী'।

'জুলিয়াস সীজার' নাটকে শেক্‌স্‌পিয়র অসামান্য কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু এ দিক থেকে 'অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপাট্রা' নাটকে তাঁর সাফল্য আরও বিস্ময়কর। এ নাটকের পরিধিও বিশাল। শুধু রোম নয়, বিশাল রোমক সাম্রাজ্যই এখানে নাটকের ঘটনাস্থল। এক দিকে এশিয়া, আর এক দিকে আফ্রিকা। 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের মতো এখানেও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। এখানেও শক্তিধর পুরুষদের মধ্যে বাদ-বিসংবাদ—অক্টেভিয়াস, অ্যান্টনি ও লেপিডাস।

ঘটনার প্রাচুর্য থাকাতে নাটকীয়তা কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছে, কিন্তু রোমের শক্তি ও প্রাচ্যের ঐশ্বর্যের কী বর্ণবহুল চিত্রই না শেক্স্‌পিয়র তুলে ধরেছেন!

'অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপাট্রা' নাটকেরও দুটি দিক—রাজনৈতিক দিক ও ট্র্যাজিক দিক। তবে এ ট্র্যাজেডি প্রেমভিত্তিক। সর্বজয়ী, সর্বগ্রাসী এ প্রেম। অ্যান্টনি মিশরে এসে মিশর-সাম্রাজ্ঞী ক্লিওপাট্রার প্রতি আকৃষ্ট হল। এ আকর্ষণ পরিণত হল প্রেমে, যে প্রেমের জন্য বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর অ্যান্টনি তার সাম্রাজ্যকে মৃৎপাত্রের চেয়ে তুচ্ছ মনে করেছে। রাজ্য, সিংহাসন সব মূল্যহীন। মূল্য আছে শুধু ক্লিওপাট্রার আলিঙ্গনের। রোম টাইবারের জলে ভেসে যাক—অ্যান্টনির জন্য ক্লিওপাট্রার অধরস্পর্শই যথেষ্ট।

ক্লিওপাট্রা অনুরোগের মূর্ত প্রতীক—অনন্তযৌবনা সে। বাসনার দীপ্তি তার সর্বাঙ্গে।

> তোমার মদির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারি ভিতে,
> মধুমত্ত ভৃঙ্গ-সম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে
> উদ্দাম সংগীতে।

নাটকের প্রথম দিকে আমরা ক্লিওপাট্রাকে যেভাবে দেখি, তাতে তাকে মাঝে মাঝে স্বৈরিণী মনে করা অস্বাভাবিক হবে না। নাটকের শেষাংশের ক্লিওপাট্রা কিন্তু অন্য নারী। সেখানে সে মহীয়সী—আপন প্রেমের দ্যুতিতে শুভ্র সমুজ্জ্বল।

'করিওলেনাস্‌' নাটকের নায়ক বীরেন্দ্রকেশরী কাইয়াস্‌ মার্কিয়াস্‌। নারীর প্রেমের চেয়ে তার কাছে বেশি মূল্যবান আপন শক্তির অহংকার। জীবনে বীরভোগ্যা এই বসুন্ধরাতে সে বাহুবলকে সর্বোচ্চ আসন দিয়েছে। 'সর্বোচ্চ' বলা বোধ হয় ঠিক হবে না, কারণ তার জননী ভলাম্‌নিয়ার স্থান ছিল সবার উপরে। ভলাম্‌নিয়া শুধু করিওলেনাসের জননীই নয়, সে রোমের জননী-রূপ, রোমের চিরন্তনী প্রকৃতি। তাই স্বাধিকার-প্রমত্ত করিওলেনাসকে এই নারীশক্তির কাছেই পরাজিত হতে হল।

গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলির মধ্যে এমন নাটক রয়েছে যেগুলি নায়িকাপ্রধান। এ প্রসঙ্গে সফোক্লীজের 'অ্যান্‌টিগনি' এবং ইউরিপিডিসের 'মিডিয়া' উল্লেখযোগ্য। অ্যান্‌টিগনির তেজ ও মিডিয়ার ক্রোধের জলন্ত প্রকাশ এই দুই নাটকে। ফরাসী নাট্যকার রাসীন্‌-এর ট্র্যাজেডিতেও নায়িকাদের প্রাধান্য দেখা যায়। শেক্স্‌পিয়র কিন্তু তাঁর কোনো ট্র্যাজেডিতেই নায়িকাকে সার্বভৌমত্ব দেন নি। তাঁর কমেডিতে আমরা অবশ্য ঠিক এর বিপরীত জিনিস দেখি। সেখানে নায়িকাই প্রধান আকর্ষণ,

নাটকের কেন্দ্রবিন্দু। কমেডিতে নায়িকার ঔজ্জ্বল্যের কাছে নায়ককে বেশ ম্লান মনে হয়। 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটকের কথা ধরা যাক। সেখানে রজালিণ্ডের পাশে অর্লাণ্ডোকে মাঝে মাঝে অপোগণ্ডের মতো মনে হয়। একবার অবশ্য চমকপ্রদ উত্তরে অর্লাণ্ডো জেকওয়েসকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল (তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য):

Jaques. I do not like her [Rosalind's] name.
Orlando. There was no thought of pleasing you when she was christened.
Jaques. What stature is she of?
Orlando. Just as high as my heart.

কমেডির কথা মনে করেই রাসকিন্ মন্তব্য করেছিলেন, শেক্‌স্‌পিয়রের নাটকে নায়িকা আছে মাত্র, নায়ক নেই। (এই মন্তব্য কালিদাসের নাটক সম্পর্কেও অত্যুক্তি হবে না।)

শেক্‌স্‌পিয়রের যে ট্র্যাজেডি প্রেমমূলক, সেখানে অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই নায়িকাকে শেক্‌স্‌পিয়র নায়কের সমান মর্যাদা দিয়েছেন। প্রথম দিকে লেখা 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' এবং পরিণত বয়সের রচনা 'অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপাট্রা' সম্পর্কে এ কথা বলা যায়। নরনারী দু-জনকে ঘিরে প্রেম বিকাশ লাভ করে, দুজনেরই সমান গুরুত্ব। এদের একজনকে অন্য জনের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ প্রেমের অমর্যাদা। সে ভুল শেক্‌স্‌পিয়র অন্তত করবেন না। তবে শেক্‌স্‌পিয়রের এই দুই ট্র্যাজেডিতেও আমরা শুধু নায়ক ও নায়িকাকে খুব কম সময়ই পাই। সব সময় অন্য কোনো-না-কোনো চরিত্র তাদের সঙ্গে রয়েছে। রোমিও যখন জুলিয়েটকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তখন শুধু তাদের একত্র দেখি; অ্যান্টনি ও ক্লিওপাট্রাকে কোনো সময়ই এক সঙ্গে দেখি না। এর একটা কারণ, শেক্‌স্‌পিয়রের নায়িকার ভূমিকা বালক-অভিনেতাদের দ্বারা অভিনীত হত। প্রেমের আবেগ প্রকাশের ক্ষমতা তাদের সীমিত। শেক্‌স্‌পিয়রের ক্লিওপাট্রার নিজের উক্তি স্মরণীয়—

...I shall see
Some squeaking Cleopatra *boy* my greatness
I' the posture of a whore.

ক্লিওপাট্রা এমন এক নারী—কাল যার লাবণ্যকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না, বহু পরিচয়েও যার অনন্ত বৈচিত্র্য ক্লিষ্ট হয় না। তার দানে নেই দীনতার লেশ, যত পাওয়া যায় তত অন্তহীন। করিওলেনাসের স্ত্রী ভার্জিলিয়ার মৃদুতা তার কাছে আশা করতে পারি না। বরং করিওলেনাস্-জননী ভলাম্‌নিয়ার দৃপ্ত অহংকার তার মধ্যে পাই। ভলাম্‌নিয়ার গর্ব বীর পুত্রের জন্য, ক্লিওপাট্রা যৌবন-মদ-মত্তা।

তার উন্মাদক রূপ অ্যান্টনিকে অভিভূত করেছে; তাই তার মৃত্যুর মুহূর্তেও সে বলছে—

I am dying, Egypt, dying ; only
I here importune death awhile, until
Of many thousand kisses the poor last
I lay upon thy lips.

কিন্তু জুলিয়েট ? তার অপরূপ সৌন্দর্যে রোমিও মুগ্ধ হলেও (রোমিওর মনে হয়েছে, মশালের আলো জুলিয়েটের রূপের দ্যুতিতে লজ্জা পায়; 'বুঝি বা সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া ওই আঁখি দুটি'), জুলিয়েট ক্লিওপাট্রার মতো অপূর্ব-শোভনা বা অনন্তরঙ্গিণী নয়। তার কটাক্ষাঘাতে ত্রিভুবন কোনো দিন যৌবনচঞ্চল হয়ে উঠবে না। অন্য দিকে সে কিন্তু কারও চেয়ে কম নয়। সাগরের মতো সীমাহীন তার বদান্যতা, তার প্রেম সাগরতুল্য গভীর। শেক্‌স্‌পিয়রের প্রথম জীবনের সৃষ্টি সে; তার অনুরাগের বর্ণনায় শেক্‌স্‌পিয়র তাই উচ্ছ্বসিত।

শেক্‌স্‌পিয়রের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিগুলির যারা নায়ক তাদের কারও চরিত্রই ত্রুটিহীন নয়। এক বিন্দু বিষ যেমন বিরাট আধারের সমস্ত পানীয়কে নষ্ট করে ফেলে, একটি ক্ষুদ্র দোষ তেমনি সমস্ত চরিত্রকে এক অর্থে নষ্ট করে দিচ্ছে। চাঁদের আলোয় কলঙ্কের মতো, অনেক গুণের সন্নিপাতে সে দোষ অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে না। এই দোষ নায়কের স্বভাবের যেসব ক্ষতি করছে, তার অন্যতম হচ্ছে সে নারী-চরিত্র বোঝার শক্তি হারিয়ে ফেলছে। তাই নায়িকার প্রতি সে অবিচার করছে—চূড়ান্ত অবিচার। নায়িকা নিজেও নায়কের এই ভুল বোঝার জন্য খানিকটা দায়ী। তবু নায়কের দায়িত্ব থেকেই যায়।

কেন যে 'হ্যাম্‌লেট্' নাটকের নায়িকার নাম অফিলিয়া হয়েছিল, সে-কথা আমরা জানি না। নামের নির্বচন বিচার করলে অর্থ হবে 'ভুজঙ্গিনী', কিন্তু সর্পের কুটিলতা, নিষ্ঠুরতা বা বিষ কিছুই আমরা তার মধ্যে পাই না। সে শান্তিস্বরূপিণী। সাংসারিক বুদ্ধির তার অভাব আছে মানলেও মেস্‌ফীল্‌ডের ভাষায় তাকে 'doll without intellect' বলা সত্যের অপলাপ। ডেস্‌ডেমোনা ও কর্ডেলিয়ার মতো সে শান্তস্বভাব, মৃদুভাষী ও স্বল্পবাক্। তাদের মতো তার জীবনের মূলমন্ত্র—'Love and be silent'। তাই প্রেমাস্পদকে সে বুঝিয়ে দিতে পারল না যে, সব মেয়েই হ্যাম্‌লেটের মায়ের মতো নয়। 'ফ্রেল্‌টি' ও নারীত্বের সমীকরণ করে হ্যাম্‌লেট্ যে পর্বতপ্রমাণ ভুল করেছে, অফিলিয়া তা ভাঙতে পারল না। বিভ্রান্ত হ্যাম্‌লেট্ অফিলিয়া ও গার্ট্রুডের প্রকৃতির মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পেলো না। নাটকের শেষের দিকে হ্যাম্‌লেট্ বলেছে—

I loved Ophelia : forty thousand brothers
Could not with all their quantity of love
Make up my sum.

হ্যাম্‌লেট্‌ সত্যই অফিলিয়াকে গভীরভাবে ভালোবাসতো, কিন্তু তার প্রতি অফিলিয়ার ভালোবাসা এর চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। তার অপরিমেয় ভালোবাসার কি মূল্য অফিলিয়া পেল ?

হ্যাম্‌লেট্‌ তার স্বপনচারিণীকে চিনতে পারল না। অফিলিয়াও হ্যাম্‌লেটের মর্মবেদনা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে নি। সুতরাং তার কল্যাণ-স্পর্শ দিয়ে হ্যাম্‌লেটের সব গ্লানি ধুয়ে মুছে দেওয়ার চেষ্টাই সে করে নি। হ্যাম্‌লেটের সঙ্গে সে স্বর্গ-খেলনা গড়তে পারত, পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে বাসরশয্যা রচনা করতে পারত (গার্ট্রুডের দেওয়া ফুল এই বাসরশয্যার শোভা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করত)। কিন্তু হ্যাম্‌লেটের পাশে দাঁড়িয়ে ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মতো শক্তি তার কোথায় ? ব্রুটাসের সহধর্মিণী পোর্শিয়ার মতো নারীর কাছ থেকে সেটা আমরা আশা করতে পারি। হ্যাম্‌লেট্‌ ওথেলোর মতো প্রত্যক্ষভাবে তার প্রণয়িনীকে হত্যা করে নি, তাকে অপ্রত্যক্ষভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে তাকে আমরা দেখি পাগল অবস্থায়। গান আর ফুল দিয়ে নিজেকে সে ভোলাবার চেষ্টা করছে। জলে ডুবে তার মৃত্যু। অফিলিয়ার ব্যক্তিত্বের প্রধান আকর্ষণ তার পেলব সৌন্দর্য। গান, ফুল, জল—জীবনে যা কিছু মৃদু যা কিছু সুকুমার ও কোমল, সেই সবই তার প্রতীক। তাই অফিলিয়ার শেষ জীবনের পরিণতি শেক্‌স্‌পিয়র যা দেখিয়েছেন, তাতে তাঁর গভীর শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। অফিলিয়ার মর্মন্তুদ মৃত্যুর পর শেক্‌স্‌পিয়রের অন্যত্র ব্যবহৃত ভাষায় আমাদের বলতে ইচ্ছা যায় (যে ভাষা টমাস্‌ হার্ডি তাঁর মানসকন্যা টেস্‌-এর জন্য ব্যবহার করেছেন)—

Poor, wounded name,
My bosom as a bed shall lodge thee.

শেক্‌স্‌পিয়রের আর কোনো নায়িকার মৃত্যুতে যদি আমাদের এই কথাগুলি বলতে ইচ্ছা হয়, তাহলে সে নায়িকা ডেস্‌ডেমোনা। আমরা ধরে নিতে পারি, অফিলিয়া আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু ডেস্‌ডেমোনাকে হত্যা করা হয়েছে। আর হত্যাকারী তার স্বামী ওথেলো, যে-ওথেলোকে পাওয়ার জন্য ডেস্‌ডেমোনা তার সর্বস্ব ত্যাগ করেছিল। কেন সে ওথেলোকে ভালোবেসেছিল সে কথা সে নিজেই বলেছে—

I saw Othello's visage in his mind.

ওথেলো মহান্‌, তার চরিত্রের অনেক গুণ, তার মনের উদারতা ও মহত্ত্ব সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওথেলোর এই মনের মধ্যেই বিষের বীজ লুকিয়েছিল। ডেস্‌ডেমোনার তা জানবার কথা নয়। ওথেলো নিজেই কি তা জানত ? (ইয়াগোর অবশ্য এটা জানা ছিল।) কোন ট্র্যাজিক নায়কই প্রথম দিকে জানতে পারে না। শেষ পর্যন্ত যখন নিজেকে জানতে পারে, তখন চূড়ান্ত দেরী হয়ে যায়, তখন আর কিছু করার থাকে না। চরম বিপর্যয় রোধ করা যায় না।

কর্ডেলিয়ার ভালোবাসা এত গভীর যে, তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। আর এমনিতেই সে স্বল্পবাক্—যেটা শেক্‌স্‌পিয়রের ট্র্যাজিক নায়িকাদের বৈশিষ্ট্য। তবে তাঁর সব নায়িকাদের মধ্যে কর্ডেলিয়াকেই বোধ হয় আমরা সব চেয়ে কম সময়ের জন্যে দেখি ও সে-ই সব চেয়ে কম কথা বলেছে। তার মৃদুতা অগ্নিগর্ভ শমীশাখার মতো—ভিতরে তেজের স্ফুলিঙ্গ লুকিয়ে আছে। এত স্বল্পতার মধ্য দিয়ে এত গভীরতা ও শক্তির পরিচয় দেওয়া শুধু শেক্‌স্‌পিয়রের নায়িকার পক্ষেই সম্ভব। তার সরল ভালোবাসায় ছলনার কোনো সম্পর্ক নেই; সে তার পিতাকে ভালোবাসে এ কথা সে সহজভাবে লীয়রকে জানিয়েছে। লীয়র বার্ধক্যের আতিশয্যে মোহগ্রস্ত—তার 'দ্বিতীয় বাল্যাবস্থা'। বয়স তার জেদকে বাড়িয়ে দিয়েছে মাত্র। সে কর্ডেলিয়াকে ভুল বুঝে নিজের উত্তরাধিকার থেকে কন্যাকে বঞ্চিত করল। বিস্মিত হয়ে সে কর্ডেলিয়া সম্বন্ধে ভাবে—'এত তরুণ, অথচ এত অকরুণ!'

কর্ডেলিয়া আর একটু যদি নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা করত, যদি পিতার জরা-জনিত মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করত, তা হলে হয়তো ট্র্যাজেডি এড়ানো যেত। কিন্তু লীয়রের জেদের একটু আভাস কর্ডেলিয়ার মধ্যে থেকে গেছে। তাই কর্ডেলিয়া অভিমান জয় করতে পারে নি।

অ্যান্‌টিগনির মধ্যে কর্ডেলিয়ার তেজ আমরা পাই, কিন্তু কর্ডেলিয়ার মাধুর্য তার নেই। কর্ডেলিয়ার সত্য-নিষ্ঠা, কর্ডেলিয়ার কর্তব্যপরায়ণতা, কর্ডেলিয়ার স্নেহপ্রবণতা—এসবের তুলনা বিরল। তার স্বভাব-মাধুর্যে সবাই মুগ্ধ। ফ্রান্সের রাজা তাকে বিবাহ করার জন্য কোনো যৌতুকের অপেক্ষা করে নি; যে নারীহৃদয় সে লাভ করেছে তাই হবে তার শ্রেষ্ঠ যৌতুক। লীয়র সব মেয়ের মধ্যে কর্ডেলিয়াকে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। কেন্ট কর্ডেলিয়ার জন্য জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত,—শেষ পর্যন্ত নির্বাসন বরণ করেছে। আর বিদূষক? কর্ডেলিয়া ফ্রান্সে চলে যাওয়ার পর লীয়রের বিদূষক ক্রমশ শীর্ণ ও বিবর্ণ হয়ে গেছে।

পিতা-পুত্রীর মিলনের যে দৃশ্য শেক্‌স্‌পিয়র অঙ্কন করেছেন, তা মর্মস্পর্শী। লীয়র যখন বলেন—'**Thou art a soul in bliss**', তখন আমাদের মনের কথাই শেক্‌স্‌পিয়র লীয়রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। শ্লেগেলের মতো সমালোচক কর্ডেলিয়ার কথা বলতে গিয়ে ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন—'কর্ডেলিয়ার হৃদয়ের স্বর্গীয় সৌন্দর্য সম্পর্কে আমি কিছু বলতে সাহস করব না।'

ট্র্যাজেডির অন্যান্য নায়িকার মধ্যে নারীর যে কল্যাণী-রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তা আমরা লেডি ম্যাক্‌বেথের মধ্যে পাই না। লেডি ম্যাক্‌বেথ স্বতন্ত্র প্রকৃতির নারী। তার স্বামীও অন্যান্য ট্র্যাজিক নায়ক থেকে স্বতন্ত্র—**hero-villain**। সে বিখ্যাত বীর, কৌশলী যোদ্ধা, কিন্তু স্ত্রৈণতা থেকে সে মুক্ত নয়। লেডি ম্যাক্‌বেথ যে অসাধারণ মনোবল ও দৃঢ়তার অধিকারিণী তা নারীসুলভ নয়,

পুরুষোচিত। অশুভ উচ্চাভিলাষ তাকে অলক্ষ্মী করে তুলেছে। একবার কর্মপন্থা ঠিক করে নেবার পর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে অবিচল।

লেডি ম্যাক্‌বেথের অপরাধ গুরুতর, কিন্তু তার অটুট মনোবলের তুলনা কোথায়? তাকে আমরা ঘৃণা করি ঠিকই, কিন্তু রিগ্যান্, গনেরিল বা অন্য কোনো দুষ্ট-চরিত্রা নারীকে যেভাবে ঘৃণা করি সেভাবে নয়। লেডি ম্যাক্‌বেথের প্রতি আমাদের যে-ঘৃণা তার মধ্যে সম্ভ্রমের ভাব রয়েছে। সে পুরুষে রূপান্তরিত হতে চেয়েছে যাতে কোনো মৃদুভাব, কোনো কোমলতা তার মনকে দুর্বল করে না দেয়। ম্যাক্‌বেথের মানসিক দুর্বলতা দূর করার জন্য সে বারবার সচেষ্ট। তার স্বামী হয়ে ম্যাক্‌বেথ কি ভাবে কাপুরুষ হতে পারে এটা সে ভেবে পায় না, তাই ম্যাক্‌বেথকে তীব্র ভর্ৎসনা করে তার সাহস ও শক্তিকে সে পূর্ণভাবে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছে। সামান্য একটু জলে যে কাজের ছাপ ধুয়ে যাবে, সে কাজে ম্যাক্‌বেথের ভয় কেন?

অশুভ ও অমঙ্গলের মূর্ত প্রতীক রূপে আমরা লেডি ম্যাক্‌বেথকে শেক্স্পিয়রের নাটকে দেখলেও তার নারীত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন। হঠাৎ যখন আমরা শুনি—

> ...Had he not resembled
> My father as he slept, I had done it!

তখন সব কোলাহল স্তব্ধ হয়ে আসে। লেডি ম্যাক্‌বেথের সঙ্গে নাটকের তিন ডাকিনীর যে আমূল পার্থক্য আছে, সে যে নারী, তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তার একটা আসুরিক দিক আছে ঠিকই, কিন্তু সে নীচ নয়। তার দৃপ্ত তেজ, অদম্য শক্তি পাপের পথ বেছে নিয়েছে, কিন্তু তা ঘটেছে শুধু আকাশচুম্বী উচ্চাশার তাড়নায়। তার সঙ্গে ইস্‌কাইলাসের ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রার তুলনা করলে তার উপর অবিচার করা হবে। ক্লাইটেম্‌নেস্ট্রা হত্যাকারিণী শুধু নয়, ব্যভি-চারিণী; তার জননী-রূপও স্বাভাবিক বলা চলে না। মিডিয়ার সঙ্গে বরং লেডি ম্যাক্‌বেথের সাদৃশ্য অনেক বেশি।

শেক্স্পিয়রের শেষ যুগের নাটকগুলিকে কোনো প্রচলিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন। এগুলি বিয়োগান্ত নয় ঠিকই, কিন্তু কমেডিতে যে-ধরনের লালিত্য ও চপলতা পেয়ে থাকি, তা এই নাটকগুলিতে নেই। এগুলিকে অনেক সময় 'রোম্যান্স' বা 'ড্রামাটিক রোমান্স' আখ্যা দেওয়া হয়। কখনো কখনো ট্র্যাজেডি ও কমেডির মিশ্ররূপ ধরে নিয়ে 'ট্র্যাজিকমেডি'ও বলা হয়।

'সিম্‌বেলিন' নাটকে নায়িকা ইমোজেন্‌-এর বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী; তার চরিত্র শেক্‌স্‌পিয়রের শ্রেষ্ঠ নারীচরিত্রগুলির অন্যতম। তার সম্পর্কে নাটকের মধ্যেই বলা হয়েছে যে সে **'more goddess-like than wife-like'** এবং এই উক্তি অতিরঞ্জিত নয়।

'দ্য উইন্‌টার্স টেল্‌' নাটকের সিসিলিয়া-রাজ লেওন্‌টিস কেন ঈর্ষায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, তা পরিষ্কার নয়। রানী হার্মিওনি মহীয়সী নারী—**'a precious creature'**। বিপদে সে ধৈর্য ধরতে জানে। তাদের হারিয়ে যাওয়া মেয়ে পার্ডিটা শেক্‌স্‌পিয়রের অপূর্ব কিশোরী নায়িকা—**'the queen of curds and cream'**—'সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ'।

'দ্য টেম্‌পেস্ট' নাটকে প্রস্‌পেরো ঐন্দ্রজালিক এবং তার ইন্দ্রজালের জাদু দর্শক ও পাঠকের হৃদয়ে সহজেই সঞ্চারিত। তার কন্যা মিরাণ্ডা নিসর্গ-সুন্দরী, 'স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা' তিলোত্তমা—**'the top of admiration...so perfect and so peerless...created of every creature's best.'** তার সঙ্গেও শকুন্তলার সাদৃশ্য স্পষ্ট।[১]

শেক্‌স্‌পিয়রের শেষ লেখায় এক নতুন রাগিণী ধ্বনিত হয়েছে—এ রাগিণী মৈত্রী ও মার্জনার, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার। জীবনে ভালো-মন্দ দুই-ই আছে—কিন্তু মন্দই শেষ কথা নয় এবং মন্দের মধ্যেও ভালো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। শেক্‌স্‌পিয়রের শেষ যুগের নাটকের নায়ক-নায়িকারা এই সত্য উপলব্ধি করেছে।

১ মিরাণ্ডার সঙ্গে শকুন্তলার তুলনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মিরাণ্ডার প্রতি কিছুটা অবিচার করেছেন। বর্তমান লেখকের **'Tagore as a Shakespearean Critic'** ***(Aspects of Literature)*** প্রবন্ধে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মহাকবি মিল্‌টন

জন্ মিল্‌টন 'মহাকবি' একাধিক অর্থে। আধুনিক ইংরাজী ভাষায় প্রথম সার্থক মহাকাব্যের রচয়িতা তিনি; কিন্তু তাঁর এর চেয়ে বড় পরিচয় তিনি মহান্ কবি। গ্রীসের অহঙ্কার হোমারকে নিয়ে, রোমের দাবি ভার্জিল। মিল্‌টন, অনেকে মনে করেন, একাধারে হোমার ও ভার্জিল। হোমারের উত্তুঙ্গ চিন্তার সঙ্গে ভার্জিলের মহিমা মিলিত হয়েছে মিল্‌টনের মধ্যে। তাই মিল্‌টনের মহত্ত্ব আমাদের কাছে 'স্বর্গীয়' মনে হওয়া বিচিত্র নয়। ওয়র্ডসোয়র্থ তাঁর '**Excursion**' কাব্যে সেই কথাই বলেছেন—

> **That mighty orb of song,**
> **The divine Milton.**

এই ওয়র্ডসোয়র্থ তাঁর 'লণ্ডন, ১৮০২' শীর্ষক একটি প্রখ্যাত সনেটে আশা প্রকাশ করেছেন যে, ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন দুর্দিনে মিল্‌টনের মতো লোকের প্রয়োজন, যে-মিল্‌টনের চিত্ত ছিল নক্ষত্রের মতো দূরস্থিত, যাঁর কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হত সমুদ্রের শব্দ, যিনি ছিলেন অনাবৃত আকাশের মতো পবিত্র দৃপ্ত স্বতন্ত্র।

'পবিত্র, দৃপ্ত, স্বতন্ত্র'—মানুষ মিল্‌টনের এই বড় পরিচয় এবং এ কথা কবি মিল্‌টনের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তাই তিনি বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্য স্থানের অধিকারী। তাঁর মৃত্যুর পর তিন শতাব্দী অতিক্রান্ত তবু তাঁর উচ্চাসনে তিনি অটল। আজকের মানুষ অনেকেই মানুষের বা কবির চারিত্রিক শুচিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে না; কিন্তু শুচিতাকে উপেক্ষা করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই যুগে—কাফ্‌কার ভাষায় যেটাকে 'চিতাবাঘের যুগ' বলা যায়—মিল্‌টন জনপ্রিয় নন; মিল্‌টনের মতো কবি বোধ হয় কোনো যুগেই সাধারণ অর্থে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন না। আশার কথা এই, মিল্‌টন বিংশ শতাব্দীতে অবজ্ঞাত নন। যথেচ্ছাচার থেকে যদি কখনো আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে ফিরতে পারি, উচ্ছৃঙ্খলা থেকে সংযমে, ছন্নছাড়া ভাব থেকে ছন্দে, তখন আমরা মিল্‌টনকে তাঁর প্রকৃত মর্যাদা দিতে পারব।

৯ই ডিসেম্বর ১৬০৮ লণ্ডন শহরে মিল্‌টনের জন্ম হয়। তাঁর পিতা আইনজীবীদের সহকারীরূপে কাজ করতেন এবং সঙ্গীতে ও কাব্যে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণ করায় তাঁকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হয় কিন্তু এতে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন নি। পুত্রের অধ্যয়নের জন্য প্রথমে সেন্ট্ পল্‌স্ স্কুলে ও পরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্টস্ কলেজে ব্যবস্থা করেন। বাল্যাবস্থা থেকেই মিল্‌টন পড়াশুনায় গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন; দিনরাত বই নিয়ে থাকতেন এবং মধ্যরাত্রির আগে কোনো দিন শুতে যেতেন না। তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে

পড়ে এবং মাঝে মাঝে তিনি মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পেতেন কিন্তু এতে তাঁর পড়ার আগ্রহ বিন্দুমাত্র কমে নি। কেম্‌ব্রিজে তাঁর আশাভঙ্গ হয় কারণ অধ্যাপকদের নীরস পাঠনভঙ্গি তাঁর একেবারেই ভালো লাগে নি। তা ছাড়া এখানে মস্তিষ্কের খোরাক কিছু থাকলেও মানবাত্মার খাদ্য কিছু ছিল না। কমনীয় মুখশ্রীর জন্য মিল্‌টন কলেজে 'দ্য কেম্‌ব্রিজ লেডি' নামে পরিচিত ছিলেন।

বি. এ. ও এম. এ. পাস করার পর মিল্‌টন ধর্মযাজক হওয়ার পূর্ব পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। কাব্যচর্চা ও কবির ভূমিকায় সমাজের সেবাকে মিল্‌টন জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি হর্টনে পিতৃগৃহে ছয় বৎসর (১৬৩২-৩৮ খ্রীস্টাব্দ) মনন, অধ্যয়ন ও সাহিত্যশিল্পের অনুশীলনে নিবিষ্ট ছিলেন। হর্টনে আসবার আগে মিল্‌টন যে-সমস্ত কবিতা লেখেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'অন দ্য মর্নিং অফ্‌ ক্রাইস্‌ট্‌স্‌ নেটিভিটি' এবং 'অন্‌ শেক্‌স্‌পিয়র'। সম্ভবত হর্টনে থাকার সময়ই মিল্‌টন তাঁর কয়েকটি উৎকৃষ্ট অনতিদীর্ঘ কবিতা রচনা করেন, যেমন 'লালেগ্রো' ও 'ইল্‌ পেন্‌সেরোসো', যথাক্রমে সুখসন্ধানী ও চিন্তাপ্রবণ মানুষের গীতিময় প্রতিচ্ছবি। 'কোমাস্‌' (১৬৩৪) একটি রাখালী মুখোশ-নাট্য। 'লিসিডাস' (১৬৩৮) মিল্‌টনের কেম্‌ব্রিজের বন্ধু তরুণ কবি এড্‌ওয়ার্ড কিং-এর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত শোকগাথা। এই কবিতায় প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করে মিল্‌টন ধর্ম-যাজকদের আলস্য ও ধর্মহীনতার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তবু তাঁর শোকের প্রকাশ আমাদের অন্তর স্পর্শ করে—

But O the heavy change, now thou art gone,
Now thou art gone, and never must return!

এক বছরের বেশি সময় ইটালিতে কাটাবার পর মিল্‌টন ১৬৩৯ খ্রীস্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ক্রমশ তৎকালীন রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজতন্ত্র-বিরোধী বিপ্লবীদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দে মিল্‌টন সপ্তদশী মেরি পাওয়েল্‌-কে বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহের এক মাসের মধ্যেই মেরি পিত্রালয়ে ফিরে যান। এই সময় মিল্‌টন বিবাহ-বিচ্ছেদ-সংক্রান্ত নিবন্ধাবলী (১৬৪৩-৪৫) রচনা করেন। দুই বছর পরে মিল্‌টনের পত্নী তাঁর কাছে ফিরে আসেন। তাঁদের কন্যাসন্তানের সংখ্যা তিন। ১৬৪৪ খ্রীস্টাব্দে মিল্‌টন 'শিক্ষা-বিষয়ক' নিবন্ধ ও 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' লেখেন। 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' মুদ্রণালয়ের স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রখ্যাত গদ্য-রচনা। ওজস্বিনী ভাষায় কবি মানুষের চিন্তাকে শৃঙ্খলমুক্ত রাখবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সদ্‌গ্রন্থকে তিনি 'মহাপ্রাণ লেখকের অমূল্য প্রাণশোণিত'-রূপে বর্ণনা করেছেন। জাতির আত্মা নভোচারী বিহঙ্গের মতো; তার ঊর্ধ্বগতি যেন কখনও ব্যাহত না হয়, এই মিল্‌টনের আশা।

১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে মিল্‌টন ইংরাজ সরকারের ল্যাটিন ভাষার সচিব নিযুক্ত হন এবং নৃপতি প্রথম চার্লস-এর হত্যার সমর্থনে পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। ১৬৫২ খ্রীস্টাব্দে

মিল্‌টনের পত্নীর মৃত্যু হয় এবং মিল্‌টনের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর চতুর্দশপদী কবিতা 'অন্ হিজ্ ব্লাইণ্ডনেস্' স্মরণীয়। সনেট রচনায় মিল্‌টন ছিলেন সিদ্ধহস্ত যদিও তাঁর সনেটের সংখ্যা অল্প। সেই কারণে তাঁর রোম্যান্টিক উত্তরসূরী মিল্‌টনের সনেটগুলি সম্পর্কে লিখেছেন—

...and when a damp
Fell round the path of Milton, in his hand
The thing became a trumpet, whence he blew
Soul-animating strains—alas, too few !

একটি অনবদ্য সনেটে মিল্‌টন তাঁর প্রাণাধিকা দ্বিতীয়া পত্নী ক্যাথারীন্ উড্‌ককে 'পবিত্রা' ও 'সাধ্বী' আখ্যা দিয়েছেন। বিবাহের পনের মাস পরে সন্তান-প্রসবকালে এই মহিলার মৃত্যু হয়। তাঁকে বা তৃতীয়া পত্নী ইলিজাবেথ্ মিন্‌শাল্‌কে (ইনি মিল্‌টনের মৃত্যুর পর অনেক বছর বেঁচেছিলেন) মিল্‌টন কোনো দিন প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি।

১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তিত হওয়ার ফলে মিল্‌টনের সমস্ত আদর্শ নির্মমভাবে পদদলিত হয়। মিল্‌টনের অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। মিল্‌টন নিজে প্রাণে বেঁচে যান বটে কিন্তু তাঁকে নানাভাবে নির্যাতিত হতে হয়। এ ছাড়া পারিবারিক অশান্তি এবং অন্ধত্ব ও অন্যান্য ব্যাধির যন্ত্রণায় মিল্‌টনের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তবু তিনি চিত্তে 'অপরাজিত' থাকার প্রচেষ্টা থেকে কখনও বিরত হন নি, তেজস্বী ও সত্যনিষ্ঠ মিল্‌টনের মহত্ত্বের এটা অন্যতম পরিচয়। ১০ই নভেম্বর ১৬৭৪ তাঁর মৃত্যু হয়।

জীবনের এই দুঃখ-পীড়িত শেষ চোদ্দ বছর কিন্তু মিল্‌টনের কাব্যসৃষ্টির ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যায়ে মিল্‌টন তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করেন। শয়তানের প্রলোভনের ফলে অধঃপতন 'প্যারাডাইস্ লস্ট্' মহাকাব্যের বিষয়বস্তু। এতে এক দিকে যেমন রয়েছে বাইব্‌ল্-এর প্রভাব, অন্যদিকে হোমার, ভার্জিল ও দান্তের। বিশাল এর পরিধি এবং এর পরিক্রমা স্বর্গ থেকে নরক পর্যন্ত। আধ্যাত্মিক সুর সুস্পষ্ট ; মিল্‌টন মহাকাব্যের প্রারম্ভেই বলেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য 'মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আচরণের সত্যতা প্রতিপাদন করা'। তবে 'প্যারাডাইস্ লস্ট্' কাব্যে ভক্তিমূলক রচনার বিশ্বজনীনতার সঙ্গে বিশেষ সম্প্রদায়গত একদেশদর্শিতাও রয়েছে। তিনি যে পিউরিট্যান্ এ কথা মিল্‌টন ভুলতে পারেন নি, যেমন ভুলতে পারেন নি তিনি বিদ্রোহী। তাঁর নিজের বিদ্রোহী-স্বরূপ কিছুটা শয়তানের চরিত্রে রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং সেইজন্যই শয়তানের চরিত্রকে ঘৃণ্য দেখাবার প্রয়াস সত্ত্বেও তা বেশ আকর্ষক হয়ে উঠেছে। শয়তানের তুলনায় অ্যাডাম্-কে নিষ্প্রভ মনে হয়। চতুর্থ সর্গে ইডেন্ উদ্যানের চিত্তগ্রাহী বর্ণনা আছে। আদি-মানব অ্যাডাম্ ও আদি-মানবী ঈভ্-এর চিত্রও উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত। পরস্পরের বাহুপাশ

তাদের স্বর্গ; তাদের প্রেম হৃদয়ানুভূতির নিবিড়তায় গভীর। 'প্যারাডাইস্ লস্ট্' উদাত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত; এই ছন্দের গম্ভীর মাধুর্য কাব্যের প্রতিটি পঙ্ক্তিতে ধ্বনিত। এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলির মধ্যে অন্যতম; এর প্রভাব দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে পরিব্যাপ্ত। মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্য' লেখার সময় 'প্যারাডাইস্ লস্ট্' থেকে প্রভূত প্রেরণা লাভ করেন।

'প্যারাডাইস্ রিগেণ্ড' (১৬৭১) মহাকাব্য, কিন্তু শিল্পসুষমার অভাবের জন্য সাহিত্যের ইতিহাসে অবহেলিত। পাপকে জয় করতে না পারায় মানুষ স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়; খ্রীস্টের মধ্য দিয়ে প্রলোভন থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ও পাপকে পরাভূত করে মানুষ আবার স্বর্গ পুনরধিকার করবে।

'স্যাম্সন্ অ্যাগনিস্টিস্' (১৬৭১) নাটকটি মিল্টনের কবিজীবনের অন্তিম কীর্তি। গ্রীক ট্র্যাজেডির অনুকরণে লিখিত এই মর্মস্পর্শী নাটকের অন্ধ, ভাগ্য-বিড়ম্বিত অথচ অনমনীয়-চরিত্র নায়কের মধ্যে মিল্টনের নিজের প্রতিকৃতি পরিস্ফুট। মিল্টন 'স্যাম্সন্ অ্যাগনিস্টিস্'কে 'নাটকীয় কবিতা'রূপে বর্ণনা করেছেন। সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তিনি ক্ল্যাসিকাল নাটকের উচ্চ আদর্শের কথা জানিয়েছেন। মিল্টন নাটকটি অভিনীত হবে এ কথা ভাবেন নি, তাই 'অঙ্ক' অনুসারে কোনো ভাগ করেন নি। তবে নাটকটির পঞ্চাঙ্ক কাঠামো সহজেই চোখে পড়ে—উপোদ্‌ঘাত, মানোয়া বৃত্তান্ত, ড্যালিলা বৃত্তান্ত, হ্যারাফা বৃত্তান্ত, এবং করুণ বিপর্যয়-মূলক উপসংহার। কালগত, স্থানগত এবং ঘটনাগত 'ঐক্য'গুলি মিল্টন এ নাটকে মেনে নিয়েছেন। কোরাস্-ও তিনি নাটকে এনেছেন। নাটকের শেষে ক্ল্যাসিকাল রীতি অনুসারে চেষ্টা হয়েছে পাঠকের মনকে বিক্ষোভ থেকে প্রশান্তিতে উত্তীর্ণ করার—**'calm of mind, all passion spent'**।

তাঁর সমগ্র জীবন ও সাহিত্যে এই প্রশান্তির দিকে পৌঁছাবার একটা প্রয়াস লক্ষ করা যায়। তাই তাঁর শেষ জীবনে, 'তরী হতে তীরে' উত্তীর্ণ হবার কালে, 'স্যাম্সন্ অ্যাগনিস্টিস্' নাটকের শেষ রাগিণীতে যে-শান্ত সুর শোনা গেল এর তাৎপর্য গভীর। জীবনে তাঁকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে; স্যামসনের মতো মিল্টনও শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েও জিতে গেছেন—শেষ জয়ে বিজয়ী হতে পেরেছেন। তাঁর কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখার রয়েছে—অনেক কিছু পাওয়ারও।

সাধারণত মনে করা হয়, আধুনিক যুগের মহাকাব্যগুলির মধ্যে মিল্টনের 'প্যারাডাইস্ লস্ট্' সর্বশ্রেষ্ঠ। মিল্টনের মহাকাব্যের এই মহত্ত্বের মূলে যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বিশ্বজননীতা। বাইবল্-এর বিশেষ একটি

কাহিনী এর মূল বিষয়-বস্তু হলেও মিল্‌টন সেই কাহিনীকে উপস্থাপিত করেছেন তাঁর নিজের মতন করে। এই উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তিনি মানবের 'পতন'কে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যেখানে স্থান-কাল-পাত্র সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মিল্‌টনের মহাকাব্যের আবেদন তাই সব যুগের সব মানুষের হৃদয়-সংবেদ্য। প্রলোভন ও অধঃপতন, পাপ ও বিনাশ, অপরাধ ও শাস্তি—এ তো আমাদের সকলের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা। হোমার থেকে ডস্টয়েভ্‌স্কি, সফক্লীজ্‌ থেকে গ্রেহাম্‌ গ্রীন্‌, বাল্মীকি থেকে শরৎচন্দ্র—সকলের রচনাতেই এ সব প্রতিফলিত। যাঁরা মনে করেন মিল্‌টনের বিষয়বস্তু পৌরাণিক হওয়াতে আমাদের যুগের জন্য তাঁর মহাকাব্যের বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই তাঁদের ভুল গুরুতর। প্রাচীন বিষয়বস্তু মিল্‌টনের হাতে নবীন রূপই শুধু পরিগ্রহ করে নি, শাশ্বতিকও হয়ে উঠেছে।

ওআল্‌টার রলি 'প্যারাডাইস্‌ লস্ট্‌' কাব্যকে 'প্রাণহীন ভাবধারার স্মৃতিস্তম্ভ' রূপে বর্ণনা করেছেন। ভাবধারা নিষ্প্রাণ কি প্রাণবন্ত সেটা বড় কথা নয়। অনুভূতির সজীবতাই মুখ্য। মিল্‌টন স্বয়ং সেটা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর 'ট্র্যাকটেট্‌ অফ্‌ এডুকেশন্‌' নিবন্ধে তিনি কাব্যকে ন্যায়শাস্ত্রের তুলনায় '**more simple, sensuous and passionate**' বলেছেন। কাব্যকে তিনি ইন্দ্রিয়-সঞ্চারী যতটা ভেবেছেন বুদ্ধিগ্রাহ্য ততটা ভাবেন নি। তাই তিনি মনে করেছেন, প্রেরণার উৎস যখন হবে অলৌকিক তখন কাব্যের গতি কোন্‌দিকে যাবে কিংবা কাব্যের শক্তি কি হবে কবি নিজে সেটা নির্ণয় করতে পারবেন না। অন্যত্র ব্যবহৃত তাঁর ভাষা দিয়েই বলা যায়—

'...when God commands to take the trumpet and blow a dolorous or a jarring blast, it lies not in man's will what he shall say, or what he shall conceal.'

এই কারণে মিল্‌টনের রচনায় মতবাদ বা ভাবধারা ছাপিয়ে যেটা অনেক স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে সেটা কাব্যকলা, এবং কবির নিজেরও এটা অনাকাঙ্ক্ষিত না হওয়াই স্বাভাবিক।

মিল্‌টনের রচনা সার্বজনীন উপভোগের সামগ্রী হওয়ার অন্যতম কারণ এর অনুভূতির তীব্রতা, যেটাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'-গ্রন্থে 'হৃদয়াবেগের প্রবলতা' বলেছেন। এই প্রাবল্য, এই অতিরেক শয়তানের চরিত্রাঙ্কনে সর্বাধিক পরিস্ফুট, তাই তার চরিত্র আমাদের এত আকৃষ্ট করে—যে-কারণে মিল্‌টন সম্বন্ধে ব্লেক্‌-এর বিখ্যাত উক্তি—**'a true poet and of the Devil's party without knowing it'.** শিলার 'প্যারাডাইস্‌ লস্ট্‌' সম্পর্কে গ্যেটেকে যা লিখেছিলেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—'আধুনিক অন্য সব শিল্পকর্মের মতো এই কবিতাতেও স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা যা প্রকাশ পেয়েছে সেটাই আমাদের আগ্রহের উদ্দীপক। বিষয়বস্তু ঘৃণ্য, বাইরে থেকে বোধগম্য হলেও ভিতরে কীটদষ্ট ও শূন্য···কিন্তু যে মানুষের কণ্ঠস্বর উচ্চারিত

সে আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে···বস্তুত যে রকম গ্রন্থকারের অন্ধত্বের অবস্থা কাব্যের সুর ও বর্ণের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে সেই রকম বিমল বিপ্লবী মিল্‌টনের পক্ষে যে দেবদূতের চেয়ে শয়তানের ভূমিকা গ্রহণ করা সহজ এই অদ্ভুত ও অনন্য অবস্থা কাব্যের চরিত্রাঙ্কন ও গঠনপ্রণালীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।' (৩১শে জুলাই, ১৭৯৯)। 'বিদ্রোহ আজি, বিদ্রোহ চারিদিকে।' বিদ্রোহের উদ্দীপ্ত সুর জ্বালাময়ী বাণীতে মিল্‌টনের মহাকাব্যে ঝংকৃত—

'Better to reign in Hell, than serve in Heav'n.'

এই সুরের মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে অনেক পাঠক ও সমালোচকই মনে করেছেন যে, 'প্যারাডাইস্ লস্ট্'-এর নায়ক শয়তান ছাড়া আর কেউ নয়। তাঁদের মতে সে একাধারে দুর্বৃত্ত ও নায়ক—মার্লোর ট্যাম্‌বার্লেন্ কিংবা শেক্‌স্‌পিয়রের তৃতীয় রিচার্ড ও ম্যাক্‌বেথের মতো। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, হিব্রু 'শয়তান' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'শত্রু', 'চক্রী', এবং মিল্‌টনের মতো পণ্ডিত কবির এ তথ্য অজানা ছিল না। রেনেসাঁস্-এর শেষ মহান্ প্রতিনিধি মিল্‌টন হয়তো ইলিজাবেথীয় নাট্যকারদের দুর্বৃত্ত-নায়কদের দ্বারা অনেকটা প্রভাবিতও হয়েছিলেন।

শয়তানকে নায়ক মনে করার প্রধান কারণ তার চরিত্রের অনেক বৈশিষ্ট্য যেগুলি আমাদের প্রশংসার উদ্রেক না করে পারে না। তার অফুরন্ত প্রাণশক্তি, প্রখর উপস্থিত বুদ্ধি, অসামান্য বাগ্মিতা, অদম্য সাহস এবং জ্বলন্ত উৎসাহ যে-কোনো ধীরোদ্ধত এমন কি ধীরোদাত্ত নায়কের পক্ষে গৌরবের বিষয় হতে পারে। শয়তানকে নায়ক মনে করার আর একটি কারণ—মিল্‌টনের কাব্যে ঈশ্বর সম্ভবত যথেষ্ট মহিমান্বিত হয়ে ওঠেন নি; অন্তত অনেক বিশিষ্ট পাঠকের এইটা মনে হয়েছে। আলেক্‌জাণ্ডার পোপ্ পরিহাসচ্ছলে লিখেছেন—

In quibbles, angel and archangel join,
And God the Father turns a school-divine.

শয়তানকে যাঁরা এই মহাকাব্যের নায়ক মনে করেন তাঁরা মিল্‌টনের মহাকাব্যকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেন না—এ কথা অবশ্য অনস্বীকার্য। প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গের কাব্যোৎকর্ষ, শিল্পনৈপুণ্য ও শয়তানবাক্যের মায়াজাল তাঁদের অভিভূত করে। **'What though the field be lost?'**—বিদ্রোহী হৃদয়ের এই উদ্ধত অবজ্ঞা তাঁদের মনে বিদ্রোহের সুপ্ত স্ফুলিঙ্গকে জাগিয়ে দেয়; ফলে শুধু মিল্‌টনই নন, পাঠকেরাও শয়তানের চরিত্রের মধ্যে সহজেই নিজেদের খুঁজে পান। 'স্বর্গচ্যুতি' তাঁদের কাছে শয়তানের 'স্বর্গচ্যুতি'।

আবার মিল্‌টনের অ্যাডাম্ ও ঈভ্ যাঁদের মন জয় করেছে তাঁদের কাছে 'প্যারাডাইস্ লস্ট্'-এর চতুর্থ ও নবম সর্গই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্থ সর্গে অ্যাডাম্ ও ঈভের দাম্পত্য জীবনের যে-চিত্তগ্রাহী ছবি রয়েছে সেটা তাঁদের মুগ্ধ করে। তেমনি আবার নবম সর্গে অ্যাডামের মর্মস্পর্শী বাণী—যেখানে ঈভ্‌কে

ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে মৃত্যু অ্যাডামের কাছে শ্রেয়তর—তাঁদের গভীরভাবে বিচলিত করে।

রবীন্দ্রনাথ মিল্‌টন ও 'প্যারাডাইস্‌ লস্ট্‌'-এর মহত্ত্ব একাধিক রচনায় স্বীকার করেছেন। তবে 'তপোবন' প্রবন্ধে (এবং অন্যত্র) তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রাচ্য সাহিত্যে প্রকৃতি ও মানুষ যেভাবে ওতপ্রোত সেটা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে দুর্লভ—

'মিল্‌টনের Paradise Lost কাব্যে আদি মানব-দম্পতির স্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টি এমন যে অতি সহজেই সেই কাব্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতিসৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন, জীবজন্তুরা সেখানে হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করছে তাও বলেছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সাত্ত্বিক সম্বন্ধ নেই। তারা মানুষের ভোগের জন্যই বিশেষ করে সৃষ্ট, মানুষ তাদের প্রভু। এমন আভাসটি কোথাও পাই নে যে, এই আদিদম্পতি প্রেমের আনন্দপ্রাচুর্যে তরুলতা পশুপক্ষীর সেবা করেছেন, ভাবনাকে কল্পনাকে নদী গিরি অরণ্যের সঙ্গে নানা লীলায় সম্মিলিত করে তুলেছেন। এই স্বর্গারণ্যের যে নিভৃত নিকুঞ্জটিতে মানবের প্রথম পিতামাতা বিশ্রাম করতেন সেখানে—

> **Beast, bird, insect, or worm, durst enter none**
> **Such was their awe of Man...**

অর্থাৎ, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ কেউ প্রবেশ করতে সাহস করত না, মানুষের প্রতি এমনি তাদের একটি সম্ভ্রম ছিল।'

রবীন্দ্রনাথ মিল্‌টনের মহাকাব্যে যে ত্রুটি খুঁজে পেয়েছেন—নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ—সে সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। মিল্‌টনের চরিত্রে ও কাব্যে অন্য অনেকেও বহু ত্রুটি আবিষ্কার করেছেন। ডক্টর জন্‌সনের কবিচরিত-গ্রন্থে এর অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। সাম্প্রতিক কালের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী ইংরাজ কবি ও সমালোচক টি. এস্‌. এলিঅট স্বয়ং এককালে (১৯৩৬) মিল্‌টনের বিরুদ্ধ-সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। (এরই প্রভাবে ও অনুকরণে বুদ্ধদেব বসু তাঁর সমালোচনায় মধুসূদনকে বাঙ্‌লা সাহিত্যের 'দুর্মরতম' কুসংস্কার রূপে অভিহিত করেন।) এফ্‌. আর. লীভিস্‌ও এলিঅটের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। পরে অবশ্য এলিঅট (১৯৪৭) নিজের ভুল অকপটে স্বীকার করেছেন। যে মিল্‌টনকে তিনি একসময় মনে করেছিলেন কবিদের কাছে অগ্রহণীয় সেই মিল্‌টনকেই তিনি পরবর্তী কালে নতুন মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন।

জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রে যেমন, সাহিত্য-সমালোচনাতেও তেমনি, ফ্যাশান বদলায়। বিগত তিন শতাব্দীতে অনেক ফ্যাশান এসেছে, গেছে। মিল্‌টনকে কিন্তু তাঁর উচ্চাসন থেকে টলানো যায় নি। তাঁর মহাকাব্যের স্থান সাহিত্যের এক উত্তুঙ্গ শিখরে। তাঁর মাতৃভাষাকে তিনি যে গম্ভীর স্বরনির্ঘোষে মন্দ্রিত

করেছেন—'রাজবদ্রুন্নতধ্বনি'—তা চিরকালের মতো সেই ভাষাকে সমৃদ্ধিমণ্ডিত করেছে। আর হতভাগ্য মানুষের জন্য যে অপরিসীম দরদ তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছে তা চিরদিনের জন্য তাঁর কাব্যকে অমর করে রেখেছে। তাঁর মহাকাব্যের শেষ পঙ্‌ক্তিগুলিতে অ্যাডাম ও ঈভ-এর 'স্বর্গ হইতে বিদায়'-এর যে করুণ ও মর্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত হয়েছে বিশ্বসাহিত্যে তা অনন্য—

> Some natural tears they dropped, but wiped them soon ;
> The world was all before them, where to choose
> Their place of rest, and Providence their guide :
> They, hand in hand, with wandering steps and slow,
> Through Eden took their solitary way.

এ কি যাত্রা শেষ, না যাত্রা শুরু? মেলে নি উত্তর।

মিল্‌টন : কবিপ্রতিভার স্বরূপ

দান্তে তাঁর 'ইন্‌ফার্নো'-তে ভার্জিলকে যেমন জানিয়েছেন, মিল্‌টনকেও 'মহত্তম কবি'-রূপে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো যায়। তাঁর মহত্ত্ব অনস্বীকার্য। সে মহত্ত্ব তাঁর রচনার প্রতিটি ছত্রে মন্দ্রস্বরে ধ্বনিত। তিনি এমন-সব বিষয়ে 'মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট' করেছেন যার মধ্যে 'নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর।' তাঁর মতো কবিকে মানুষ বিনা দ্বিধায় বড়ো বলতে পারে।

জন্‌ ডান্‌-এর মৃত্যুর ত্রিশতবার্ষিকী উপলক্ষে টি. এস্‌. এলিঅট দুই শ্রেণীর লেখকের কথা উল্লেখ করেছেন। এক শ্রেণীর লেখকদের আমরা ভালোবাসি কিন্তু ভক্তি করি না, আর অন্য শ্রেণীর লেখকদের আমরা ভক্তি করি কিন্তু ভালোবাসি না। আমার মনে হয় মিল্‌টনের ক্ষেত্রে (এবং শেক্‌স্‌পিয়রের ক্ষেত্রে) এমন এক লেখকের বিরল দৃষ্টান্ত রয়েছে যাঁকে আমরা যুগপৎ ভালোবাসতে ও ভক্তি করতে পারি। এটা অবশ্য একেবারেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

মিল্‌টন শেক্‌স্‌পিয়রের চেয়ে বড়ো না শেক্‌স্‌পিয়র মিলটনের চেয়ে বড়ো এই প্রশ্ন নিয়ে অনেকে বিব্রত বোধ করেন। প্রশ্নটা খানিকটা অবান্তর ও অর্থহীন। খেলাধূলার ক্ষেত্রে কে বেশি বড়ো সেটা নির্ধারণ করতে সংখ্যাতত্ত্ব আমাদের সাহায্য করে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে রকম কোনো সুবিধা নেই। তবে শেক্‌স্‌পিয়র ও মিল্‌টন যে 'সমানধর্মা' কবি নন সেটা স্পষ্ট। কয়েকজন কবি আছেন যাঁরা 'সূর্যচারী'। গ্যেটের 'চিরন্তনী নারী'-র মতো তাঁরা সব সময় আমাদের উপরের দিকে টানছেন। তাঁরা হলেন ভার্জিল, দান্তে ও মিল্‌টন। আবার কয়েকজন কবি আছেন যাঁদের ধর্ম সাহিত্যের দর্পণে জীবনের প্রতিবিম্বন। এঁদের লেখা পড়ে আমরা জীবনকে আরও নিবিড়ভাবে জানতে পারি এবং আরও ঐকান্তিকভাবে ভালোবাসি। এঁরা হচ্ছেন হোমার, চসার, শেক্‌স্‌পিয়র।

মিল্‌টন শেক্‌স্‌পিয়রের থেকে আর এক দিকেও স্বতন্ত্র। তিনি আদর্শবাদী। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করবেন যা মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায়ক হবে। এইজন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন কৈশোর থেকে। যৌবনে তিনি নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। আধ্যাত্মিক শক্তিতে তাঁর আস্থাও এ সময় থেকেই দেখা যায়। ১৬৩৭ খ্রীস্টাব্দে বন্ধু চার্লস্‌ দিওদাতি-কে লেখা একটি চিঠি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। তাতে তিনি লেখেন—'শোনো! এ কথা শুধু তোমার কানে বলছি, তা না হলে আমি লজ্জা পাবো; আর একটু সময়ের জন্য তোমার

সঙ্গে বড়ো বড়ো কথা বলতে দাও। তুমি জানতে চেয়েছ আমি কি ভাবছি। ভগবান্ আমার সহায় হোন, আমি অমরত্বের কথা ভাবছি! আমি ডানা গজাচ্ছি আর ওড়বার চিন্তা করছি; কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের পক্ষীরাজ ঘোড়ার (পেগেসাস্-এর) ডানা খুব শক্ত হয় নি।'

লেখক নীতিবাদী হলে অনেকে তাঁর লেখা সহ্য করতে পারেন না। তাঁদের ধারণা এতে পৃথিবী রসাতলে যাবে। তাঁরা যদি সত্যই সহৃদয় হন তা হলে তাঁদের দেখা উচিত লেখকের রচনা রসোত্তীর্ণ হয়েছে কি না। সাহিত্যে এটাই একমাত্র বিচার্য। লেখক আদর্শবাদী কি বাস্তববাদী, ধর্মভীরু কি নাস্তিক, সে প্রশ্ন সাহিত্যের আলোচনায় গৌণ। মিল্‌টনের নীতিবাদ কোনো শুষ্ক শাস্ত্র-আওড়ানো কচকচি নয়। কবির উদ্ভাবনী-শক্তিকে তিনি যখন স্বাগত জানান তখন তাঁর কণ্ঠে রেনেসাঁস্-এর নৈতিক উদ্দীপনা ধ্বনিত—

'এই সব শক্তি…ঐশী প্রেরণার দুর্লভ আশীর্বাদ, তবে সব দেশেই কয়েকজন পেয়ে থাকেন (যদিও অধিকাংশই এর অপব্যবহার করেন) যাঁদের কাজ এক মহান্ জাতির জীবনে ধর্ম ও সদাচারের উন্মেষ ও বিকাশে সাহায্য করা, মনের বিভিন্ন অশান্তি প্রশমিত করা এবং মানসিক ভাবগুলিকে ঠিক সুরে বাঁধা…'

('The Reason of Church Government')

কবির কাজ যে মোটেই সহজ নয় এ কথা মিল্‌টন উপলব্ধি করেছিলেন। কবিকে অবশ্য ভয় পেয়ে সাবধান হলে চলবে না, সে সাবধানতা তাকে বিপদ এড়াতে শেখাবে মাত্র। 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'-তে মিল্‌টন নিজের মত দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন—'আমি কোনো পলাতক কিংবা আশ্রয়প্রাপ্ত নৈতিক গুণের মহিমা কীর্তন করতে পারি না, যা কোনো অনুশীলন করে না, পরিশ্রম করে না, যা কোনো দিনে ছুটে বেরিয়ে এসে শত্রুর মুখোমুখি হয় না, বরং যেখানে চির-অম্লান নির্মাল্য জয় করার জন্য ছুটতে হবে, ঘর্মক্লেদ সহ্য করে, সেই ধাবন-প্রতিযোগিতা থেকে সন্তর্পণে সরে যায়।' যারা অনুসন্ধানে অলস তাদের জন্য মিল্‌টনের কোনো ক্ষমা নেই। মিল্‌টনের নিজের মন সর্বদা অনুসন্ধিৎসু। শেলি মিল্‌টনকে **'a bold inquirer into morals and religion'** রূপে বর্ণনা করেছেন। নৈতিক ব্যাপারে অনুসন্ধান করা কিন্তু অনায়াস-সাধ্য নয় এবং মিল্‌টন এ কথা জানতেন। তাই তিনি আমাদের পূর্বোক্ত গ্রন্থে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, এই সংসারের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ভালো এবং মন্দ একই সঙ্গে বেড়ে ওঠে প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে। **'It was from out the rind of one apple tasted, that the knowledge of good and evil as two twins cleaving together leapt forth into the world.'**

সাংসারিক ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ ওতপ্রোত থাকলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মিল্‌টন বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যের সংমিশ্রণ অনুমোদন করতেন না। রাজা ও প্রজায় যে

পার্থক্য রয়েছে সে কারণে কিন্তু নয়। প্রকৃত ট্র্যাজেডির নায়ককে রাজা বা রাজপুত্র হতে হবে এ কথা মিল্টন স্বীকার করতেন না। (ব্যক্তিগত জীবনে তিনি রাজতন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।) তবে নায়কের নৈতিক উৎকর্ষ এমন থাকবে যাতে তাকে আমরা লোকোত্তর-চরিত্রের মানুষ-রূপে বুঝতে পারি। তাঁর নিজের ট্র্যাজেডি 'স্যাম্সন অ্যাগনিস্টিস'-এ (যে নাটকে তিনি গ্রীক ট্র্যাজেডিকে অনুসরণ করেছেন) তিনি জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা সামাজিক মর্যাদাকে কোনো বিশেষ স্থান দেন নি। তাঁর নাটকে কোরাস্ স্যাম্সন্‌কে উদ্দেশ করে যে-কথাগুলি বলছে তার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে—

> **Strongest of mortal men,**
> **To lowest pitch of abject fortune thou art fall'n.**
> **For him I reckon not in high estate**
> **Whom long descent of birth,**
> **Or the sphere of fortune, raises ;**
> **But thee, whose strength, while virtue was her mate,**
> **Might have subdu'd the Earth,**
> **Universally crown'd with highest praises.**

ট্র্যাজেডির প্রধান চরিত্রগুলিকে রাজন্যবর্গের সংশোধনের জন্য উদাহরণ-রূপেও ব্যবহার করা চলে। মিল্টন লিখেছেন—'স্যাটার-নাট্যের যেহেতু ট্র্যাজেডি থেকেই উৎপত্তি, তাই যাঁরা বড়ো তাঁদের প্রধান ত্রুটিগুলিকে সজোরে আঘাত করা ও দুঃসাহসের সঙ্গে সম্মুখীন হওয়া এ নাটকের কর্তব্য, সেটা উৎসানুসারী হবে।' রেনেসাঁস্-এর অনেক সমালোচকই বলেছেন যে, ট্র্যাজেডি নৃপতিদের শিক্ষাদান করবে যাতে তারা স্বেচ্ছাচারী না হয়। স্যার ফিলিপ্ সিড্‌নি রচিত 'অ্যান্ অ্যাপলজি ফর্ পোয়েট্রি'-তেও এ কথা রয়েছে। মিল্টন অবশ্য চাইবেন কোনো রাজাই যাতে না থাকে, সে রাজা স্বেচ্ছাচারী হোক আর না হোক। এই দিক্ থেকে মিল্টন যথেষ্ট আধুনিক। সপ্তদশ শতাব্দীতে তিনি গণতন্ত্রের যে-উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তার তুলনা বিরল। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গণতান্ত্রিক মনোভাব তাঁর কাব্য-সংক্রান্ত ধারণাকে প্রভাবিত করবে।

অনেক দিক্ থেকে সাহিত্য-সমালোচক মিল্টন প্রাচীন ধারার অনুবর্তন করেছেন এবং সে জন্য তাঁকে 'নিও-ক্ল্যাসিকাল' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে ; কিন্তু কবির কাজ কি হবে এ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মত রয়েছে। প্রচলিত 'অভিজাত' অভিমত তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। কবির কাজ শিক্ষাদান এটা তিনিও মনে করেন, তবে স্পেন্সার-এর 'ফেয়ারি কুইন' রচনা যে উদ্দেশ্যে (**'to fashion a gentleman or noble person in virtuous and gentle discipline'**) সে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি 'প্যারাডাইস্ লস্ট্' লেখার কথা কোনো দিন চিন্তা করেন নি।

কাব্য সম্বন্ধে মিল্‌টন যেমন আগ্রহী ছিলেন, প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধেও তেমনই। পুরশাসক বা ম্যাজিস্ট্রেটদের তিনি কাব্যের রাজনৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করেছেন। তিনি তাদের অনেকের মত মেনে নিয়েছেন—কোনো কোনো তথাকথিত কবি আসলে **'libidinous and ignorant poetasters'** এবং এ-সব লেখককে নিন্দার ভাষা নেই। তবে মানবাত্মার বিকাশের জন্য কাব্যের প্রয়োজনীয়তার কথা ম্যাজিস্ট্রেটদের ভুলে গেলে চলবে না। তাদের কাজ হবে তারা যে-ধরনের কবিতা চায় সেই ধরনের কবিতা রচনায় উৎসাহ দেওয়া। কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌-এ কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মিল্‌টন যে-সব কথা বলেছেন তার মধ্যে প্লেটোর রিপাব্‌লিক্‌-সংক্রান্ত চিন্তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। মিল্‌টন মনে করেন না যে, ম্যাজিস্ট্রেটদের কাজ শুধু কলহ মেটানো বা মামলার নিষ্পত্তি করা। জাতিগঠনে তাদের দায়িত্ব রয়েছে। যাতে ন্যায়ের প্রচলন ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়, লোকে মিতাচারী ও সাহসী হয়, জ্ঞান ও নীতির দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়—এ-সব দেখা তাদের পবিত্র কর্তব্য। আর এই সব কাজে তারা কবিকে তাদের পাশে পাবে। 'মানুষের বড়ো ইচ্ছাকে যে-সাহিত্য আকার দিয়েছে, এবং আকার দেওয়ার দ্বারা মানুষের মনকে ভিতরে ভিতরে বড়ো করে তুলছে', সে সাহিত্যকে শাসক অকুণ্ঠভাবে সম্মান দেবেন।

মিল্‌টন কিন্তু অন্য অনেক ব্যাপারে একেবারেই প্লেটোর মতো নন। প্লেটো মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে চেয়েছিলেন, এই স্বাধীনতা নিয়েই মিলটনের গর্ব। তিনি জানেন, মানুষ তার স্বাধীনতার অনেক সময় অপব্যবহার করে। অপব্যবহারের তিনি নিন্দা করবেন, কিন্তু অপব্যবহার হতে পারে এই ভয়ে আগে থাকতে স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে দেওয়া তিনি কিছুতেই অনুমোদন করতে পারেন না। তাই তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

'Give me the liberty to know, to think, to believe, and to utter freely according to conscience, above all other liberties.'

মিল্‌টনের কাব্যের সব চেয়ে বড়ো তাৎপর্য এই যে, সে কাব্য পাঠ করার পরে আমরা জীবন-সংগ্রামের জন্য শক্তি অর্জন করি। কাপুরুষের মতো পলায়নপরতার সহজ পথ বেছে নেওয়ার যে-প্রলোভন আমরা পদে পদে অনুভব করি মিল্‌টন তার থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। সংগ্রামী মিল্‌টন তাঁর নিজের জীবনের মধ্য দিয়েও আমাদের এই শিক্ষাই দিতে চেয়েছেন। 'কবিরে পাবে না তাহার জীবন-চরিতে' এ কথা মিল্‌টন সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। লোকে ট্র্যাজেডি নাট্যাকারে লেখে; মিল্‌টনের জীবনটাই একটা ট্র্যাজেডি। সারাজীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন।

প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি বারংবার তাঁর জীবনকে আচ্ছন্ন করেছে, তবু তিনি হার স্বীকার করেন নি। প্রথমা স্ত্রী তাঁকে কিছু দিনের জন্য ছেড়ে চলে যান। প্রাণাধিকা দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যু হয় প্রসূতি-অবস্থায়। নিজের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়। যে-রাজতন্ত্রকে মিল্টন মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে সেই রাজতন্ত্র ইংল্যাণ্ডে পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বভাবতই এর পরে মিল্টনের অবমাননা ও লাঞ্ছনার অবধি ছিল না। এর চেয়ে মৃত্যু অনেক বেশি কাম্য ছিল। 'সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে।'

একটি প্রখ্যাত সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে—সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, জীবনে যা কিছু ঘটুক না কেন, অপরাজিত হৃদয় নিয়ে তার সম্মুখীন হবে। মিল্টনের আদর্শ অভিন্ন। ওয়র্ডসোয়র্থও এই আদর্শের কথা ভেবে নিগ্রো নেতা Toussaint l'Ouverture সম্পর্কিত সনেটে লেখেন—'Man's unconquerable mind'। সব বড়ো ট্র্যাজেডির এইটা শেষ কথা। ট্র্যাজেডির নায়ক কখনও ভাগ্যের পায়ে দুর্বলপ্রাণে ভিক্ষা যাচনা করে না। অদৃষ্টকে হাস্যমুখে পরিহাস করার ক্ষমতা সে রাখে। তাই ট্র্যাজেডি দেখা বা পড়ার পর আমাদের মনে সেই সম্ভ্রম জাগে যেটার কথা অ্যারিস্টট্‌ল্ তাঁর কাব্যতত্ত্ব-গ্রন্থে বলেছেন এবং মিল্টন নিজে তাঁর 'স্যাম্‌সন্ অ্যাগনিস্টিস্' নাটকের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

মানুষের অপরাজিত চিত্তের জয়গান যাঁরা গেয়েছেন মিল্টনের স্থান তাঁদের পুরোভাগে। মিল্টনের বিশ্বাস ছিল, সচ্চরিত্র লোকের পক্ষেই চিত্তে অপরাজিত থাকা সম্ভব। ধর্মহীন, নীতিহীন জীবনে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। চারিত্রিক শুচিতার প্রয়োজন তাই সর্বাগ্রে—সাধারণ মানুষের পক্ষে যেমন কবির ক্ষেত্রেও তেমনই। মিল্টন তাঁর 'An Apology for Smectymnuus' নিবন্ধে লিখেছেন—

'...he who would not be frustrate of his hope to write well hereafter in laudable things, ought himself to be a true Poem, that is, a composition and pattern of the best and honourablest things; not presuming to sing high praises of heroic men, or famous cities, unless he have in himself the experience and the practice of all that which is praiseworthy.'

মিল্টন নিজের জীবনে কবিতার সুষমা আনার চেষ্টা করেছিলেন। আর তাঁর নিজের কবিতা জীবনের মহিমায় মন্দ্রিত। 'প্যারাডাইস্ লস্ট্' স্মরণে রেখেও একথা বলা চলে।

আপাতদৃষ্টিতে এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু কি তাতে খুব একটা যায় আসে না। কেউ কেউ মনে করেন, মিল্টন তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যের জন্য এমন বিষয় নির্বাচন করেছিলেন যেটা একেবারেই সাহিত্য-উপযোগী নয়। এই অভিমত সমর্থনযোগ্য

নয়। এ ব্যাপারে গোটের উক্তিকে শেষ কথা ধরা যেতে পারে—'আমাদের জার্মান সাহিত্যানুরাগী লোকে সব সময় "কাব্যের উপযোগী" এবং "কাব্যের অনুপযোগী" বিষয়বস্তুর কথা বলে থাকে। হয়তো এক দিক্ থেকে দেখলে তারা খুব একটা ভুল করবে না। তবু আসলে কোনো বিষয়ই কাব্যের অনুপযোগী নয় যদি অবশ্য কবি জানেন কিভাবে সেটার উপযুক্ত ব্যবহার করা যাবে।' আর কেউ না জানলেও মিল্‌টন জানেন কিভাবে কাব্যে বিষয়বস্তুর যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। 'প্যারাডাইস্ লস্ট্' কাব্যে ধর্মতত্ত্ব কিংবা অন্য কোনো বিষয়ের অবতারণা যখন করা হয়েছে তখন সেটা কাব্যসৌন্দর্যের হানি ঘটায় নি (স্বল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়েছে)। সব বড়ো কবির মতো মিল্‌টনও মনে করেন কবিতার প্রথম প্রয়োজন কাব্যত্বে উত্তীর্ণ হওয়া। আর কাব্যের সারাৎসার করুণায়। এই করুণা বা pity উইল্‌ফ্রেড্ ওয়েন্-এর বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবাহিত হয় না, মানব-হৃদয়ের সাংকেতিক রণাঙ্গণে উৎসারিত—এইখানে এর শ্রেষ্ঠত্ব।

মিল্‌টনের দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ট্র্যাজেডি-লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি। 'প্যারাডাইস্ লস্ট্' কাব্যে সকরুণ বীণার মূর্ছনা যে-কোনো সংবেদনশীল পাঠক অনুভব করতে পারবেন। এই কাব্যের মূলসুর বিষাদের, যে-বিষাদ বিশেষ এক মহিমায় মণ্ডিত। নাটকের রূপ ও রীতি অনুসৃত না হলেও 'প্যারাডাইস্ লস্ট্'কে ইংরাজী ভাষায় রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি গণ্য করা যেতে পারে। বাল্মীকির 'রামায়ণ' সম্বন্ধে আলংকারিক আনন্দবর্ধন মন্তব্য করেছেন, এ মহাকাব্যের প্রধান রস শৃঙ্গার-রস বা শান্তি-রসের মতো কোনো সাধারণ রস নয়—করুণরসের মতো বিশেষ রস। এই করুণ-রসকে আমরা মিল্‌টনের মহাকাব্যের প্রধান রস বলতে পারি।

করুণ-রসে অ্যাডাম এবং ঈভ-এর চরিত্র পরিপুক্ত। এ দুটি চরিত্র নিঃসংশয়ে মিল্‌টনের শ্রেষ্ঠ চরিত্রসৃষ্টি। শয়তানের চরিত্র-বর্ণনায় মিল্‌টন যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন এবং অসতর্ক মুহূর্তে আমাদের মনে হতে পারে উইলিয়াম ব্লেক্-এর কথাই ঠিক—**Milton belonged to the Devil's party without knowing it**। তবে আমাদের ভুল ভাঙতে দেরি হয় না। শয়তান আসলে এক ঘোরতর স্বার্থান্ধ কুচক্রী এবং তাকে মিল্‌টনের মহাকাব্যের নায়ক মনে করার অর্থ মিল্‌টনের প্রতি চরম অবিচার। আর ঈশ্বরের কথা যদি ধরা যায় তা হলে দেখা যাবে মিল্‌টন কত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। যিনি অনির্বচনীয়, অবাঙ্‌মনস-গোচর, সেই বচন ও মনের অতীত পরমপুরুষকে কাব্যের চরিত্ররূপে অঙ্কন করা কি সম্ভব? যিনি সব সামগ্রীর অন্তর্লোকে বিরাজ করেন তাঁকে কি বিশেষভাবে সাহিত্যের সামগ্রীতে পরিণত করা যায়? মিল্‌টনের বিষয়বস্তু এমনই যে তাঁর এই বিফল প্রয়াসে ব্রতী হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। তবে ঈশ্বরের প্রতি অবিচলিত ভক্তি পোষণ করলেও মিল্‌টন মানুষকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন। তাঁর আদর্শ **art for art's sake** নয়, তাঁর আদর্শ **art for man's sake**। কীট্‌স্

এই কথা মনে রেখে জেম্‌স্‌ রাইস্‌-কে একটি চিঠিতে (২৪শে মার্চ, ১৮১৮) মিল্‌টন সম্পর্কে লেখেন—'...he was an active friend to Man all his Life, and has been since his death.'

মানুষের প্রতি প্রগাঢ় দরদ ও গভীর মমত্ববোধ ছিল বলেই 'প্যারাডাইস্‌ লস্ট্‌' কাব্যে মিল্‌টন আদি-দম্পতির অন্তরঙ্গ দাম্পত্য-জীবনের ছবি এত মর্মস্পর্শীভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। অ্যাডাম্‌ ও ঈভ-এর প্রেম পার্থিব ও অপার্থিবের সমন্বয়-দ্যুতিতে ভাস্বর। এ-প্রেম সুখের পথে পরিণতি খোঁজে না, কারণ সে-পরিণতি পরিসমাপ্তির নামান্তর। স্বর্গ হতে তারা দু-জন ভ্রষ্ট হল, কিন্তু পরস্পরের বাহুপাশে তারা নতুন স্বর্গের সৃষ্টি করল। রবীন্দ্রনাথের কথা আর একবার মনে পড়বে—'পৃথিবীতে ভয়কে যদি কেহ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে, বিপদ্‌কে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারে, তবে তাহা প্রেম।' প্রেমের এই অপরূপ রূপ 'প্যারাডাইস্‌ লস্ট্‌'-এ পরিস্ফুট, তাই এ ট্র্যাজেডিরও শেষ কথা মানুষের মহিমা। অসীম দুঃখ স্বীকার করবার শক্তি যদি প্রতিভা হয় তা হলে 'প্যারাডাইস্‌ লস্ট্‌' একাধিক অর্থে কবিপ্রতিভার সম্পূর্ণ ও সর্বোত্তম প্রকাশ।

ওয়র্ডসোয়র্থ : দুশো বছর পরে

দুই শতাব্দীর ব্যবধানেও ওয়র্ডসোয়র্থের কবিতার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন রয়েছে কি? তাঁর কাব্যের আবেদন দেশ ও কালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। অনেক ভারতীয় পাঠকের কাছে এই কাব্য বিশেষভাবে সমাদৃত। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে ওয়র্ডসোয়র্থের ধ্যান-ধারণা একই সুরে বাঁধা। তাই যাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাঁদের সকলের কাছে ওয়র্ডসোয়র্থের কবিতা বিশেষ সমাদরের বস্তু। তাই ভারত-পথিক রবীন্দ্রনাথকে ওয়র্ডসোয়র্থ এত গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থে লিখেছেন—'বিশ্বের সঙ্গে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ সংঘাতে ওয়র্ডসোয়র্থের কাব্যসংগীত বাজিয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য তাহা এমন সরল।'

আজকের যুগ ও ওয়র্ডসোয়র্থের যুগে পার্থক্য অনেক। আধুনিক যুগে ওয়র্ডসোয়র্থকে অচল মনে করা অস্বাভাবিক নয়, কারণ 'সরল' কোনো কিছুতেই আমাদের তেমন আস্থা নেই। জীবনে জটিলতা যত বাড়ছে তত আমরা সহজ, অনাড়ম্বর জিনিসকে তাচ্ছিল্য করছি। আমরা সাহিত্য পাঠ করে শিহরিত হতে চাইছি, কাব্যের মধ্যে নতুন চমক খুঁজছি। ওয়র্ডসোয়র্থের কবিতায় এসব কোথায়? কবি নিজেই তাঁর 'Hart-Leap Well' কবিতায় বলেছেন, মর্মস্পর্শী দুর্ঘটনার তিনি পসারী নন, পাঠকের রক্ত হিম-শীতল করে দেওয়ার কোনো সহজ কৌশল তাঁর জানা নেই ; স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে সহৃদয়কে সরল কোনো গান শুনিয়েই তাঁর আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার'-এর কবির মতো, ওয়র্ডসোয়র্থ শুধু বাঁশীখানি হাতে তুলে নিতে চান, পুষ্পের মতো সংগীতগুলি আকাশ-ভালে ফুটিয়ে তোলবার জন্য।

এই প্রসঙ্গে সাধারণভাবে রোম্যান্টিক কবিতার কথায় আসা যেতে পারে। রোম্যান্টিক কবির কাছে অনুভূতির মূল্য সব চেয়ে বেশি। তাই তিনি মূলত আত্মকেন্দ্রিক ; তাঁরই চেতনার রঙে পান্না সবুজ হয়, চুণী রাঙা হয়ে ওঠে। তিনি অন্তর্মুখী—তাঁর জ্ঞানের উৎস চিত্তের গভীরে, পুঁথির শুষ্ক পাতায় নয়। প্রত্যেকের অনুভূতির প্রকৃতি স্বতন্ত্র ; তাই রোম্যান্টিক কবিতায় এত শতবরনের ভাব-উচ্ছ্বাস। বিংশ শতাব্দীর মানুষ সব কিছু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে চায়, আর ওয়র্ডসোয়র্থের মতো রোম্যান্টিক কবি মনে করেন বুদ্ধির যেখানে শেষ বোধের সেখানে আরম্ভ। বুদ্ধিকে একেবারে বর্জন করা সমীচীন নয়, কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে আমরা কত দূর এগুতে পারি? মাতৃস্নেহ বা দেশপ্রেম কি বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়?

রোম্যান্টিক কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা প্রজ্ঞার পরাকাষ্ঠায় পৌঁছাতে পারি ঠিকই, কিন্তু এই কবিতার বিপদ্‌ও রয়েছে। কবির যখন আন্তরিকতার অভাব

থাকে, রোম্যান্টিক কবিতা তখন একেবারেই অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। শুধু ভান করার চেষ্টা করে-যে ভালো রোম্যান্টিক কবিতা লেখা যায় না বায়রনের অনেক রচনাই তার প্রমাণ। আতিশয্যের দিকেও রোম্যান্টিক কবির দুর্বলতা থাকে, যদিও সেই আতিশয্যকে অনেক সময় 'সুন্দর' আখ্যা দেওয়া হয়। ইংরাজ রোম্যান্টিক কবিদের মধ্যে ওয়র্ডসোয়র্থের স্থান পুরোভাগে। আন্তরিকতার অভাব তাঁর কোনো দিন ছিল না। অকপটে তিনি তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করেছেন; তাই অনায়াসেই সেই ভাবকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। তিনি লিখেছেন—'আমি যা জানি ও যা আমরা অনুভব করি, সেই কথাই আমি ব্যক্ত করি।' আতিশয্যকে ওয়র্ডসোয়র্থ বরাবরই বর্জন করতে চেয়েছেন। আবেগের আতিশয্যের কি ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে 'Laodamia' কবিতায় তিনি তা দেখিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে—

...the gods approve
The depth, and not the tumult, of the soul ;
A fervent, not ungovernable, love.

হৃদয়ানুভূতির গভীরতাই দেবতাদের অনুমোদন পায়, উদ্দামতা নয়। কাব্যের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ওয়র্ডসোয়র্থ বলেছেন—স্মৃতির শান্তরসে ঘনীভূত আবেগই কাব্যের উৎস ('Poetry...takes its origin from emotion recollected in tranquillity')।

ওয়র্ডসোয়র্থের শ্রেষ্ঠ কবিতায় যে-অনুভূতি প্রাধান্য পেয়েছে তা নিঃসংশয়ে অধ্যাত্ম-অনুভূতি। ইন্দ্রিয়ের দ্বার তিনি রুদ্ধ করেন নি; এই দ্বার দিয়েই তিনি আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেছেন। অনেক ধর্মগুরু ও নীতিবিদ্ ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির অসারতা প্রতিপন্ন করেছেন ও ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। ওয়র্ডসোয়র্থ কোন দিন ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করেন নি: ইন্দ্রিয় তাঁকে যে-সৌন্দর্যলোকে উত্তীর্ণ করেছে তার মধ্যে তিনি গভীরতর সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর ছোট ছোট কবিতার মধ্যেও এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই রকম একটি কবিতায় তিনি বলেছেন, আকাশে যখন রামধনু দেখেন তখন তাঁর হৃদয় নেচে ওঠে। তাঁর জীবনের শুরুতেও এই ছিল, এখন তাঁর পরিণত বয়সেও তাই। বার্ধক্যেও যেন এর ব্যতিক্রম না হয়; তার চেয়ে বরং মৃত্যু ভালো। শিশুই মানবের জনক: আর তাঁর একান্ত আশা, তাঁর জীবনের দিনগুলি যেন সহজ নিষ্ঠার যোগসূত্রে গাঁথা থাকে। এত সহজে অথচ সুললিতভাবে এত গভীর জিনিস পৃথিবীর ক-জন কবি লিখতে পেরেছেন? রামধনু তিনি নয়নেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করেছেন; একবারও শব্দের সাহায্যে বলেন নি যে, এই অনুভূতির মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিক চেতনা আছে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনের এক অক্ষয় সম্পদ্ যেটা থেকে জীবনের কোনো স্তরেই তিনি বঞ্চিত হতে চান না। তাঁর

জীবন শুধু এক বিশেষ দীপ্তিতে আলোকিতই হয় নি, সমগ্র জীবন ঐক্যের বন্ধনে বাঁধা হয়ে গেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অহরহ যে ঐশী লীলার প্রকাশ ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটায় তারই রূপ ওয়র্ডসোয়র্থ চোখের আলোতেই দেখেছেন।

'শিশুই মানবের জনক', ওয়র্ডসোয়র্থের এই যুক্তি আধুনিক যুগের কোনো পাঠকের কাছেই বৈপ্লবিক মনে হবে না। শিশু-সত্তার মধ্যে যে-পরিণত মানুষের শক্তি বা দুর্বলতার বীজ নিহিত থাকে, এ সত্য আজ আমাদের কাছে একেবারেই নতুন নয়। ওয়র্ডসোয়র্থের কালে কিন্তু এ কথা বলার জন্য অনেক সাহসের প্রয়োজন হত। ওয়র্ডসোয়র্থের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী গভীর ও সূক্ষ্ম। বিকাশ ও ও ক্রম-পরিণতি তিনি সর্বদা কৌতূহল নিয়ে লক্ষ করেছেন। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকদের মতোই ওয়র্ডসোয়র্থ শৈশবের অভিজ্ঞতাকে বহুমূল্য মনে করছেন। তাঁর নিজের শৈশব তিনি বারংবার সমীক্ষা করেছেন; তাঁর বাল্যজীবন তাঁর কবিতার অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। তাঁর ছোটবেলার অনেক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। বাদাম সংগ্রহ করার নেশায় মেতে উঠেও বনদেবতার সান্নিধ্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন; অপহৃত নৌকায় চড়ে পার্বত্য হ্রদে নৈশ অভিযানের সময় তিনি 'সত্তার অনেক অজ্ঞাত স্তরে' উপনীত হয়েছেন।

ব্লেকের মতো ওয়র্ডসোয়র্থও শিশুদের নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। এর অন্যতম কারণ অবশ্য রুসোর প্রভাব। 'লুসি', 'লুসি গ্রে', 'অ্যালিস্ ফেল', 'উই আর সেভেন্' প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। শেষোক্ত কবিতাটিতে আট বছরের একটি মেয়ের সঙ্গে ওয়র্ডসোয়র্থের কথাবার্তা রয়েছে। একটি ভাই ও একটি বোন মারা যাওয়ার পরেও মেয়েটি বিশ্বাস করে যে, তারা আগের মতো সাতটি ভাই বোন। মৃত্যু তাদের পরিবারে ভাঙন ধরাতে পেরেছে বলে সে মনে করে না। 'লুসি' কবিতায় ওয়র্ডসোয়র্থ দিনে দিনে পরিবর্ধমানা লুসির মনোগ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন। শৈবালে ঢাকা শিলার পাশে ভায়োলেট-ফুলের মতো সে খানিকটা লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে গেছে; আকাশে যখন একটি নক্ষত্র শোভা পায় তখন সেই নক্ষত্রের মতো সে সুন্দর। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'Immortality Ode' ('Intimations of Immortality...')। এই কবিতায় ওয়র্ডসোয়র্থ শৈশবেরই জয়গান গেয়েছেন। তিনি বলেছেন—আমাদের শৈশব দিব্য সুষমায় মণ্ডিত। আমরা যত বড় হই তত স্বর্গ থেকে দূরে চলে যাই। বাল্য যত অতিক্রম করি তত পৃথিবীর মোহিনী মায়ার জালে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ি। স্বর্গের স্মৃতি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়, কিন্তু তার রেশ কমে যায়, একেবারে মিলিয়ে যায় না। রামধনু তেমনই আকাশে উঠে, গোলাপ তেমনই ফোটে, চাঁদ জ্যোৎস্না ছড়ায়, সূর্য আগের মতোই কিরণময়—কিন্তু তবু কি যেন হারিয়ে যায়, কোথায় যেন ম্লানিমা। আগের সেই দিব্য দ্যুতি আর কোনো দিকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

শিশুদের মাঝে ওয়র্ডসোয়র্থ যে-আনন্দ ও বৈচিত্র্য খুঁজে পেয়েছেন, মানবের

পরিণত জীবনে তিনি তার কোনো অভাব পান নি। কাম্বারল্যাণ্ডের যে-ভিখারী বয়সের ভারে নত হয়ে গেছে বা জেঁাক-সংগ্রহে জীবিকা নির্বাহ করে যে-দুঃস্থ বৃদ্ধ তার মনোবল অটুট রেখেছে—এদের জন্য ওয়র্ডসোয়র্থের সহানুভূতির অন্ত নেই। ভিক্ষুকটি-যে মানুষের মনে করুণার দীপ জ্বালিয়ে রাখে, এইজন্য তার অস্তিত্বের একটা বিশেষ সার্থকতা রয়েছে বলে কবি মনে করেন। আর যে-লোক জেঁাক সংগ্রহ করে তার দেহ বার্ধক্যে অপটু হলেও, জেঁাক খুঁজে পাওয়া সুকঠিন হলেও, স্বাধীন বৃত্তি ত্যাগ করার কথা সে ভাবতেই পারে না। তার এই সাহস ও নিষ্ঠার জন্য ওয়র্ডসোয়র্থের কাছে সে পরম অনুপ্রেরণার উৎস্।

সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আজ আমরা বুঝতে শিখেছি। কিন্তু সে যুগেও দীন-দরিদ্রের দুঃখ-কষ্ট ওয়র্ডসোয়র্থের মর্মস্পর্শ করেছিল। শুধু অনুকম্পা দেখিয়ে তিনি এদের ছোট করেন নি, তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের যন্ত্রণা নিজে অনুভব করার চেষ্টা করেছেন। তাদের জীবনেও-যে মহিমা আছে এ সত্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন ও তাঁর কবিতায় সেই সত্যকে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন। 'মাইকেল' কবিতায় ওয়র্ডসোয়র্থ ওই নামের এক বৃদ্ধ মেষপালকের কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন। গ্রাস্‌মীয়ারের এই বৃদ্ধ লোকটির জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধা। তার জমিটুকু কিন্তু সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। তার স্ত্রী ছিল সুগৃহিণী ও পতিপ্রাণা। তাদের জীবনের সব আশা-ভরসা তাদের একমাত্র সন্তান লুক্-কে নিয়ে। জমিটুকু ঋণমুক্ত অবস্থায় ছেলেকে দিয়ে যেতে পারার জন্য তাদের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। লুক্ যত বড় হতে লাগল পিতা-পুত্রের স্নেহের বন্ধন তত দৃঢ়তর হল। প্রতি দিন লুক্ তার বাবার সঙ্গে মাঠে যেত, বাবার কাজে সাহায্য করত। লুকের যখন আঠার বছর বয়স, তখন অর্থ উপার্জনের জন্য বাধ্য হয়ে তাকে শহরে পাঠাতে হয়। শহরে গিয়ে লুক্ বিপথগামী হয় ও পালিয়ে যায়। এই সংবাদে মাইকেল মর্মাহত হল। যে-ভেড়ার খোঁয়ারটির ভিত্তিপ্রস্তর সে লুক্‌কে দিয়ে স্থাপন করিয়েছিল ও যেটির নির্মাণ শেষ করার স্বপ্ন সে এতদিন ধরে দেখেছে, সে কাজে আর সে হাত দিতে পারল না; সে কাজ চির-দিনের মতো অসমাপ্ত থেকে গেল। ওজস্বী অমিত্রাক্ষর ছন্দে, অসীম দরদ দিয়ে ওয়র্ডসোয়র্থ মাইকেলের মর্মবেদনা গ্রথিত করে রেখে গেছেন। এ কবিতার ভাষা নিরলংকৃত—যে-ভাষাকে ওয়র্ডসোয়র্থ কাব্যের বাহন করতে চেয়েছিলেন। ব্রাউনিঙ, এজ্‌রা পাউণ্ড, টি. এস্. এলিঅট প্রমুখ কবিরা যখন চলিত ভাষা ও শৈলী নিয়ে কবিতা লেখেন তখন তাঁরা স্পষ্টতই ওয়র্ডসোয়র্থের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

মানবতাবাদী কবিরূপে অন্তত আধুনিক যুগের পাঠকের কাছে ওয়র্ডসোয়র্থের বিশিষ্ট স্থান থাকা উচিত। 'কবি কে?' এই প্রশ্নের উত্তর ওয়র্ডসোয়র্থ তাঁর 'লিরিক্যাল্ ব্যালাড্‌স' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় দিয়েছেন। তাঁর মতে—'**He is a man speaking to men.**' ফরাসী বিপ্লবের সময় তিনি সোল্লাসে বিপ্লবকে

অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি তরুণ ছিলেন বলে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। যে-আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী ওয়র্ডসোয়র্থের ছিল সেটা সে যুগে বিরল। নিজের দেশকে তিনি বিশ্ব-রাষ্ট্রপরিবারের অংশ ভাবতে পেরেছিলেন; **'the family of nations'** তাঁরই উক্তি।

ওয়র্ডসোয়র্থ কখনও মানবকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। মানব-জীবন প্রাকৃতিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে তিনি মনে করতেন। প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলে মানুষের জীবন তিক্ততায় ভরে ওঠে, প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সাহচর্যেই মানবজীবনের পূর্ণতা ও শান্তি—এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। যে-মহতী শক্তি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত, মানব এবং প্রকৃতিও তারই প্রকাশ। তাই ওয়র্ডসোয়র্থের নিসর্গ-চেতনা অধ্যাত্ম-চেতনারই নামান্তর। চাতক বা লিনেট্-পাখির উন্মাদক স্বরমাধুরীর মধ্যে, হলুদে ফুলে নিবিষ্ট ছোট প্রজাপতিটির পাখায়, সুবর্ণোজ্জ্বল ড্যাফোডিল-গুচ্ছে, নববসন্তের শতসহস্র সুরের সমাহারে ওয়র্ডসোয়র্থ প্রকৃতির নব নব লীলা উপভোগ করেছেন। এই রূপের মাঝেই তিনি আবার অপরূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই উপবন যখন তাঁর কাছে তপোবন হয়ে উঠেছে তখন সে পরিণতি খুব স্বাভাবিকভাবেই এসেছে।

'Tintern Abbey' কবিতাটিতে ওয়র্ডসোয়র্থ তাঁর নিসর্গ-চেতনার অভিব্যক্তি আলোচনা করেছেন। বাল্যাবস্থায় প্রাকৃতিক পরিবেশে ছুটাছুটির মধ্যে তিনি যে-আনন্দ পেতেন সেটা জান্তব ধরনের। তারপর যখন প্রথম যৌবনে উপনীত হলেন তখন তাঁর চোখে রূপতৃষ্ণা। প্রকৃতির সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করার জন্য তিনি ব্যাকুল। তাঁর আনন্দের মধ্যে তখন বেদনার অনুভূতি, ভাবাবেশে বিহ্বলতা—তাঁর নিজের ভাষায়, **'aching joys and dizzy raptures'**। এর পর এল ওয়র্ড-সোয়র্থের পরম উপলব্ধির বেলা। তখন তিনি নিসর্গের মধ্যে ঐশী লীলা প্রত্যক্ষ করলেন, প্রকৃতির মাঝে 'চিত্তের চির-বসতি' খুঁজে পেলেন।

আজ আধুনিক মানুষের জীবনে যে-সংকট উপস্থিত তার থেকে মুক্তি কোথায়? জীবন-যন্ত্রণায় আমরা জর্জরিত, উৎকণ্ঠায় ও অনিশ্চিতি-বোধে প্রপীড়িত নিঃসঙ্গতা-বোধ অসহনীয় হয়ে উঠেছে। অস্তিবাদী দর্শনের দিকে আমরা আজ কেন ঝুঁকেছি তা বুঝতে পারা কঠিন নয়। চারিপাশে শুধু ক্রূরতা ও হানাহানি দেখে সমকালীন যুগকে অধ্যাপক উইম্‌সাট্ 'চিতাবাঘের কাল' বা **'day of the leopards'** আখ্যা দিয়েছেন। ফ্রানৎস্ কাফ্‌কার একটি রচনা পড়ে কাফ্‌কার উক্তি থেকে এই অভিধার কথা তাঁর মনে হয়েছে। যে-বর্বরতা ও হিংসায় আজকের পৃথিবী উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমরা ওয়র্ডসোয়র্থ-প্রদর্শিত পথ বেছে নিতে পারি। উচ্চ আদর্শ সামনে রেখে সরল, অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের কথা ওয়র্ডসোয়র্থ বলেছেন, যে-জীবনে ঈর্ষা ও লোভ আমাদের তিলে তিলে ক্ষয় করে না, বাসনা-কামনার শিখা লেলিহান হয়ে ওঠে না, নিসর্গের সঙ্গে যে-জীবনের সংযোগ নিবিড় ও যে-জীবনের তন্ত্রী অনন্তের সুরে বাঁধা রয়েছে।

শেলির দৃষ্টিতে প্রেম

[ইংরাজী সাহিত্যে প্রেমের কবিতা লিখে যাঁরা অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে পার্সি বিশ্ শেলি অন্যতম। তাঁর কাছে প্রেম শুধু অগ্নিগর্ভ কোনো উন্মাদনাই নয়, গভীর কোনো আনন্দের জন্য ব্যাকুলতাও বটে। ব্রাউনিঙের মতো তিনিও ভেবেছেন 'প্রেম সর্বোত্তম'। তাঁর 'প্রোমিথিউস্ আন্‌বাউণ্ড' কাব্যনাট্যের দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্যে পাই—

All love is sweet,
Given or returned. Common as light is love,
And its familiar voice wearies not ever.

প্রেম সম্বন্ধে প্লেটোর ধারণাও শেলিকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একাধিক নারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন কিন্তু কারও মধ্যে তাঁর স্বপ্নসঞ্চারিণী মানসপ্রতিমাকে খুঁজে পান নি। যাকে কোনো দিন পাওয়া যায় না তাকে খুঁজে বেড়িয়ে তিনি নিজের জীবনে ও অন্যদের জীবনে অশান্তি ডেকে এনেছিলেন। অবশ্য এ ভুল তাঁর মতো আমরাও অনেকে করি। তাঁর নিজের একটি চিঠির ভাষায়, 'I think one is always in love with something or other ; the error—and I confess it is not easy for spirits cased in flesh and blood to avoid it—consists in seeking in a mortal image the likeness of what is, perhaps, eternal.'

শেলির উল্লেখযোগ্য গদ্য-রচনাগুলির মধ্যে 'On Love' অন্যতম। বর্তমান প্রবন্ধ সেটির পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ। মূল রচনার ভাবের ও ভাষার জটিলতাকে অনুবাদে সরল করার কোনো প্রচেষ্টা এখানে করা হয় নি।]

প্রেম কি? যে বেঁচে আছে, তাকে জিজ্ঞাসা করো, জীবন কি? যে ভক্তি করে, তাকে জিজ্ঞাসা করো, ঈশ্বর কি?

অন্য লোকদের আভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে আমি অবহিত নই ; এমন কি যাকে আমি এখন সম্বোধন করছি সেই তোমারও নয়। আমি দেখি যে, কতকগুলি বাহ্য লক্ষণে আমার সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু যখন সেই বাইরের রূপে ভুলে আমি কোনো পারস্পরিক বৃত্তির কাছে আবেদন করার কথা ভেবেছি, এবং তাদের নিকট আমার হৃদয়ের অন্তস্তলকে ভারমুক্ত করতে চেয়েছি, আমি দেখেছি আমার ভাষার ভুল অর্থ করা হয়েছে, সুদূর ও বর্বর কোনো দেশে আগন্তুকের মতো। আমার অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য তারা যত বেশি সুযোগ দিয়েছে আমাদের মধ্যে ব্যবধান তত বেশি মনে হয়েছে, এবং সহানুভূতির কণাগুলি আরও বেশি দূরে

অপসৃত হয়েছে। আমার প্রকৃতি এই প্রামাণিক তথ্য সহ্য করার উপযোগী নয়; স্বভাবের কোমলতায় আমি কম্পমান ও দুর্বল; সর্বত্র সহানুভূতির অন্বেষণ করেছি আর পেয়েছি বিতাডন ও হতাশা।

তুমি নিজে দাবি করছ, প্রেম কি? যখন আমাদের নিজেদের চিন্তার মধ্যে আমরা একটা অপ্রতুল শূন্যতার গহ্বর আবিষ্কার করি, এবং অন্য সকল সত্তার মধ্যে নিজেদের অন্তরের অভিজ্ঞতার অনুরূপ জাগিয়ে দিতে চাই, সকলের প্রতি সেই প্রবল আকর্ষণ যেটা আমরা নিজেদের অতিক্রম করে কল্পনা করি, আশঙ্কা করি বা আশা করি, সেটাই প্রেম। আমরা যদি আলোচনা করি, আমরা চাই লোকে আমাদের বুঝতে পারবে; যদি আমরা কল্পনা করি, আমরা চাই আমাদের মস্তিষ্কের বায়বীয় সন্ততি আর এক জনের মস্তিষ্কে নবজন্ম লাভ করবে; যদি আমরা অনুভব করি, আমরা চাই যে, আর এক জনের স্নায়ুগুলি আমাদের স্নায়ুর সঙ্গে একযোগে স্পন্দিত হবে, যে তাদের চোখের রশ্মি নিমেষে প্রজ্বলিত হবে এবং আমাদের নয়ন-রশ্মির সঙ্গে মিলবে ও মিশে যাবে, যে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ ও প্রচণ্ড আবেগে প্রকম্পিত ও প্রদীপ্ত অধরকে উত্তর দেবে না অচঞ্চল তুষার-শীতল অধর। এই হল প্রেম। এই বন্ধন ও এই অধিকারই, মানুষকে শুধু মানুষের সঙ্গেই নয়, যা কিছুর অস্তিত্ব আছে সব কিছুর সঙ্গে, যুক্ত করে। এই সংসারের মাঝে আমরা জন্ম নিই, আর আমাদের ভিতরে এমন একটা জিনিস আছে যেটা, আমাদের জন্মের মুহূর্ত থেকেই, নিজের সাদৃশ্যের জন্য ব্যাকুল থেকে ব্যাকুলতর হয়। সম্ভবত এই নিয়ম অনুসারেই শিশু মাতৃবক্ষ থেকে স্তন্যপান করে; আমাদের স্বভাবের বিকাশের সঙ্গে এই প্রবণতাও বিকাশ লাভ করে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিগত প্রকৃতির মধ্যে আমাদের সমগ্র সত্তার যেন একটা সূক্ষ্ম প্রতিরূপ আমরা অস্পষ্টভাবে দেখতে পাই, কিন্তু আমরা যা কিছু নিন্দা বা ঘৃণা করি এর কিছুই তার মধ্যে থাকে না: মানব-প্রকৃতিতে থাকতে পারে এমন যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর বৃত্তির কথা আমরা ভাবতে পারি তার আদর্শ মৌলরূপ। আমাদের বহিরঙ্গের প্রতিকৃতি শুধু নয়, আমাদের প্রকৃতি যে-উপাদানে নির্মিত তার ক্ষুদ্রতম কণিকাগুলিরও সমাবেশ;[1] এমন একটি দর্পণ যার মধ্যে পবিত্রতা ও ঔজ্জ্বল্যের রূপাবলীই শুধু প্রতিফলিত হয়; আমাদের হৃদয়ের গভীরে একটি হৃদয় যেটি তার নিজস্ব স্বর্গের বৃত্ত বেষ্টন করে রয়েছে যে-বৃত্তকে যন্ত্রণা, এবং দুঃখ, এবং অমঙ্গল উল্লঙ্ঘন করতে সাহস করে না। আমাদের সব কিছু সংবেদনের ব্যাপারে আমরা এরই শরণ নিই, সেগুলি এর সঙ্গে সাদৃশ্য-যুক্ত হবে বা এর অনুরূপ হবে এইজন্যই আমাদের ব্যাকুলতা। এর অবিকল প্রতিরূপের আবিষ্করণ; আমাদের বোধশক্তির পরিমাপ করতে সমর্থ এমন এক বোধশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ; এমন কল্পনা-শক্তি যা আমরা যে-সূক্ষ্ম ও সুকুমার বিশেষত্বগুলি গোপনে লালিত ও বিকশিত করে আনন্দ পেয়েছি

১ এই শব্দগুলি অকার্যকর ও রূপকান্বিত। অধিকাংশ শব্দই তাই—কিছু করার নেই।

সেগুলির মধ্যে প্রবেশ করে সেগুলি অধিকার করতে পারবে। এমন তনুর সঙ্গে, যার স্নায়ুগুলি, দুটি অপরূপ বীণার তন্ত্রীর মতো, সুন্দর এক কণ্ঠস্বরের সঙ্গতে বাঁধা, আমাদের স্নায়ুগুলির স্পন্দনের সঙ্গে স্পন্দিত হয়; এবং অন্তঃপ্রকৃতি যে-ভাবে দাবী করে তেমন অনুপাতে এই সবগুলির সংযোগের; এই সেই অদৃশ্য ও অপ্রাপণীয় মাত্রা যার দিকে প্রেমের প্রবণতা: এবং যেটি পাওয়ার জন্য এ মানব-শক্তিকে জাগ্রত করে তার ক্ষীণতম ছায়াকেও ধরে রাখার জন্য যা না পেলে সেই হৃদয়ের কোনো বিরাম বা বিশ্রাম নেই যে-হৃদয়ে এর সার্বভৌম কর্তৃত্ব। এই কারণে যখন কোনো নির্জন স্থানে, কিংবা সেই পরিত্যক্ত অবস্থায় যখন আমরা বহু মানুষের দ্বারা পরিবৃত থাকি তবুও তারা আমাদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে না, তখন আমরা ফুলকে ভালোবাসি, আর ঘাসকে, আর জলকে, আর আকাশকে। এমনি কি বসন্তের পল্লব-সঞ্চরণের মধ্যে, নীল আকাশের সীমানায়, আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে তখন গোপন সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। নির্বাক্ সমীরণে এমন মুখর ভাষণ আছে, এবং বেগবতী নদীগুলিতে ও তাদের পার্শ্ববর্তী শরগুলির মর্মর-ধ্বনির মধ্যে এমন সংগীত আছে, যেগুলি অন্তরের গভীরে কোনো কিছুর সঙ্গে তাদের অবোধগম্য সম্পর্কের সাহায্যে, আত্মিক সত্ত্বাকে রুদ্ধশ্বাস হর্ষের নৃত্যে জগিয়ে তোলে, আর বোধাতীত স্নেহের অশ্রুতে নয়ন ভরিয়ে তোলে, দেশাত্মবোধক সাফল্যের উদ্দীপনার মতো, কিংবা শুধু তোমাকেই গান শোনাচ্ছে এমন অনন্য প্রিয়জনের কণ্ঠস্বরের মতো। স্টার্ন্ বলেন, যদি তিনি মরুভূমিতে থাকেন, তা হলে তিনি কোনো সাইপ্রেস্ গাছ ভালোবাসবেন। যে-মুহূর্তে এই কামনার বা শক্তির মৃত্যু হয়, মানুষ তার নিজের জীবন্ত সমাধি হয়ে ওঠে, আর এর পরেও যা বেঁচে থাকে সেটা এক সময় সে যা ছিল তার শুষ্ক আবরণ মাত্র।

চার্লস্ ল্যাম

সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখকেরা অনেক সময় সাধারণ পাঠকের কাছে লেখক-রূপে অপরিচিত থেকে যান। ইংরাজী সাহিত্যে স্পেন্সার ও বেকনের, ডক্টর জন্সন ও জেমস্ জয়েসের নাম এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। আবার মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহিত্যিক আছেন যাঁরা শুধু সাহিত্যের ইতিহাসেই স্বীকৃতি পান না, যাঁদের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে জনসাধারণের অন্তরঙ্গ পরিচয় থাকে। সেই অন্তরঙ্গতা এত নিবিড় যে, সেই সাহিত্যিকেরা দেশবাসীর কাছে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মর্যাদা লাভ করেন। শেক্স্পিয়র ও ডিকেন্সের মতো চার্লস্ ল্যামও এই শ্রেণীর লেখক।

Lamb ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আইনজীবী স্যামুয়েল সল্ট-এর একান্ত সচিব ছিলেন। ১৭৮২ থেকে ১৭৮৯, সাত বছর, ল্যাম ক্রাইস্টস্ হস্পিট্যাল বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন; তাঁর সতীর্থ্য কোল্‌রিজের সঙ্গে তাঁর আজীবন সৌহার্দ্যের সূত্রপাত এখানেই ঘটে। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে কিছুদিন সাউথ্ সী হাউসে করণিকের কাজ করার পর ১৭৯২ থেকে দীর্ঘ তেত্রিশ বছর তিনি ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির হিসাবের অফিসে কাজ করেন। ১৭৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দে ল্যামকে কিছু দিন হক্স্টনের উন্মাদাগারে কাটাতে হয়েছিল। অ্যান্ সিমন্স্ নামে একটি মেয়েকে ল্যাম ভালোবাসতেন। তাঁর মানসিক অসুস্থতার মূলে তাঁর ব্যর্থ প্রণয়ের ব্যাপারও হয়তো কিছুটা ছিল। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন তাঁর মানসিক অসুস্থতার জন্যই তাঁর প্রণয়-জীবনে ব্যর্থতা আসে। ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর ল্যামের দিদি মেরি উন্মাদ-অবস্থায় কাঁচির আঘাতে—যে-কাঁচি তিনি তাঁর পোশাক-তৈরীর কাজে ব্যবহার করতেন—তাঁদের মা-কে প্রাণান্তিকভাবে আহত করেন। এরপর থেকে যত দিন বেঁচেছিলেন ল্যাম এই দিদির রক্ষণাবেক্ষণের গুরু দায়িত্ব নিজের উপরে তুলে নিয়েছিলেন। (একজন কেউ তাঁকে দেখার ভার না নিলে মেরি ল্যামকে সারাজীবন উন্মাদাগারে কাটাতে হত।) সেই কারণে ল্যামের পক্ষে বিবাহোত্তর সাংসারিক জীবন যাপন করা সম্ভব হয় নি, যদিও ল্যামের মতো সুকুমার সংবেদনশীল মনের ও মজলিসী স্বভাবের লোকের গৃহস্থ-জীবনের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ সাধারণের চেয়েও বেশি থাকে। ২৩ বছর বয়সে ল্যামকে শুধু-যে অসুস্থচিত্ত দিদির ভার নিতে হয়েছিল তাই নয়, এক মুমূর্ষু আত্মীয়া ও অকালজরাগ্রস্ত পিতার দেখাশোনা করার দায়িত্বও তাঁকে বহন করতে হয়েছিল। জীবনের রণাঙ্গণে নির্ভীক যোদ্ধার মতো ল্যাম সংগ্রাম করে গেছেন; অন্য অনেক রোমান্টিক লেখকের মতো কঠিন বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন নি, কন্টকহীন কুসুমের জন্য লালায়িত হন নি। শত দুঃখের মাঝেও তাঁর মুখের হাসি কোনোদিন মিলিয়ে যায় নি, তাঁর অন্তরের রসের নির্ঝর

শুষ্ক হয় নি। তাঁর উদার হৃদয় ও অসীম মনোবলের পরিচয় তাঁর প্রবন্ধগুলিতে পরিস্ফুট।

১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে ওয়র্ডসোয়র্থের সঙ্গে ল্যামের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। এর পরের বছর লয়েড-এর সঙ্গে সহযোগিতায় তাঁর প্রথম গ্রন্থ ***Blank Verse***-নামক কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৮০১ থেকে ল্যাম নিয়মিতভাবে সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে অভিনেত্রী ফ্যানি কেলি ল্যামের বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮২০ থেকে ১৮২৩ ল্যাম 'লণ্ডন ম্যাগাজিন' পত্রিকায় 'ইলিয়া' এই ছদ্মনামে লঘু প্রবন্ধ লেখেন। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে ***Last Essays of Elia*** প্রকাশিত হয়। এই বছর মেরি ও পালিতা কন্যা এমা-কে নিয়ে তিনি এন্‌ফীল্ডের বাসস্থান পরিত্যাগ করে এড্‌মন্টনে থাকার জন্য যান। জুলাই মাসে ল্যামের প্রকাশক এডওআর্ড মকসনের সঙ্গে এমার বিবাহ হয়। ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর ল্যাম পড়ে যান ও তাঁর মুখে আঘাত লাগে। ২৭শে ডিসেম্বর ল্যামের মৃত্যু হয়। মেরি এর পরে ১৩ বছর বেঁচেছিলেন।

ল্যামের কয়েকটি কবিতা সুপরিচিত হলেও (যেমন, 'Old Familiar Faces') তাঁর কবিখ্যাতি স্বল্প। নাট্যকাররূপেও আজ তিনি বিস্মৃত। সাহিত্য-সমালোচনার ইতিহাসে ল্যামের বিশিষ্ট স্থান আছে; তবে সমসাময়িক সমালোচক কোল্‌রিজ ও হ্যাজলিটের পাশে তাঁকে কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ মনে হতে পারে। (ব্র্যাড্‌লি অবশ্য ল্যামকে বলেছেন: 'the best critic of the nineteenth century'।) ল্যামের চিঠিপত্রগুলি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের অন্তর্গত। কিন্তু সে মর্যাদা কূপার, কীট্‌স্ প্রভৃতি ইংরাজ লেখকের চিঠিপত্রকেও দেওয়া হয়। ল্যামের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রবন্ধাবলীতে। এগুলি গুরুগম্ভীর গবেষণামূলক নিবন্ধ নয়, বা নিরস তত্ত্ব বা তথ্য কিংবা শুষ্ক নীতিকথার প্রচারের বাহন নয়। ব্যক্তিগত লঘু প্রবন্ধের যে-চিত্তাকর্ষক সরস ভঙ্গী আমরা ল্যামের 'ইলিয়া'-রচনাবলীতে পেয়েছি সেটা অভিনব। তাঁর এই ভঙ্গীর অনুকরণ করে পরবর্তী কালে বহু লেখক ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লিখেছেন; কিন্তু কোনো শিষ্যই গুরুর কৃতিত্বকে অতিক্রম করে যেতে পারেন নি।

আপাতদৃষ্টিতে অসতর্কভাবে লেখা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ইলিয়া-প্রবন্ধাবলীর রচনাশৈলী যথেষ্ট অনুশীলনের ফল। প্রতিটি শব্দ সযত্নে চয়ন করা। বার্টন, ব্রাউন প্রমুখ সপ্তদশ শতাব্দীর কয়েকজন লেখকের শৈলীর প্রভাব ল্যামের গদ্যে অনুভব করা যায়; এইজন্য ল্যামের লেখায় একটা পুরানো দিনের আমেজ আছে। কৌতুকরসের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে সংযত করুণ-রসের সমন্বয়ে ল্যামের রচনাবলীতে এক অপূর্ব মাধুর্যের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলি এক সহৃদয় মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনস্মৃতি।

প্রথম ইলিয়া প্রবন্ধে ('The South Sea House') ল্যাম তাঁর প্রথম কর্মস্থল নিয়ে আলোচনা করেছেন। সাংসারিক বিপর্যয়ের জন্য ল্যামকে চোদ্দ বছর বয়সে লেখাপড়া ছাড়তে হয় ও পরে অল্প কিছু দিন তিনি সাউথ সী হাউসে কাজ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি 'melancholy-looking, handsome' ভবনে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটির ও তাঁর কয়েক জন সহকর্মীর মনোগ্রাহী ছবি এঁকেছেন। এই সহকর্মীরা একটু খেয়ালী প্রকৃতির মানুষ (এই ধরনের চরিত্র-চিত্রণে ল্যাম সিদ্ধহস্ত)। লেখক এঁদের তাই 'odd fishes' বলেছেন। প্রবন্ধটির প্রারম্ভে তিনি সরাসরি পাঠককে সম্বোধন করেছেন।

'The Two Races of Men' প্রবন্ধে ল্যাম সমগ্র মানবজাতিকে দুইভাগে ভাগ করেছেন—যারা ধার করে আর যারা ধার দেয়। কৌতুকচ্ছলে ল্যাম দেখাতে চেয়েছেন যে, যারা ধার করে তারা যারা ধার দেয় তাদের চেয়ে মহত্তর। অর্থাৎ আমরা যাদের উত্তমর্ণ বলে থাকি ল্যাম তাদেরই অধমর্ণ বলেছেন। এই অভিনব উত্তমর্ণদের মধ্যমণি র‍্যাল্‌ফ বিগড্‌ (টাকা উড়িয়ে দিতে ইনি ছিলেন অদ্বিতীয়)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী এই প্রবন্ধের অন্তর্গত। অনেকে আবার টাকা ধার করে না, বই ধার করে। এদের মধ্যমণি কোল্‌রিজ। এ ব্যাপারে কোল্‌রিজের নাকি একটা নিজস্ব 'থিয়োরি' আছে—কোনো বই যে যত ভালো বুঝতে পারবে সে বইয়ের মালিকানা-স্বত্ব তার সেই অনুপাতে থাকবে। তারপর কোল্‌রিজের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ইঙ্গিত দিয়ে ল্যাম প্রশ্ন তুলেছেন—কোল্‌রিজ যদি তাঁর এই মত অনুসারে কাজ করেন তা হলে কি কারও বইয়ের আলমারি নিরাপদ থাকবে ?

'New Year's Eve' ল্যামের আত্মপরিচয়ে পরিপূর্ণ। অতীতের প্রতি ল্যামের অটুট আকর্ষণ এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি বই ভালোবাসেন, তিনি বন্ধুদের ভালোবাসেন ; শ্যামকান্তি ধরণীর স্নিগ্ধছায়ায় তিনি মানুষের মাঝে বাঁচতে চান। প্রতিদিনের ক্ষুদ্র সুখদুঃখ, প্রতিদিনের সামাজিক মেলামেশা, এর মূল্য তাঁর কাছে অপরিমেয়। মৃত্যু যেন তাঁর কাছে অজ্ঞাত রহস্যই থেকে যায়, তাকে জানবার জন্য ল্যামের কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। মৃদু নৈরাশ্যের উদাস সুর প্রবন্ধটিকে আরও রমণীয় করে তুলেছে।

'Dream Children' প্রবন্ধটিতে অকৃতদার ল্যামের এক মর্মান্তিক দিবাস্বপ্নের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে—যা হতে পারত অথচ কোনোদিন হল না যে অ্যান (এখানে 'অ্যালিস')-কে তিনি ভালোবেসেছিলেন অথচ কোনোদিন পেলেন না, বিচিত্ররূপা সেই নারী এখানে তাঁর স্বপ্নসম্ভবা সঙ্গিনী ও স্বপ্নসজ্জাত শিশুদের জননী। যে-ল্যাম কোনোদিন স্বামী বা জনক হতে পারলেন না সেই ল্যামের উন্মথিত হৃদয়বেদনা 'Dream Children' প্রবন্ধে সংযত ভাবাবেগের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে গীতিকাব্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে। শিশু-মনস্তত্ত্বের কয়েকটা দিক এখানে

সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। মাঝে মাঝে মৃদু হাস্যরস করুণ সুরকে আরও গভীর ও মর্মস্পর্শী করে তুলেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের ইলিয়া-প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'Old China' অন্যতম। 'Mackery End, in Hertfordshire' প্রবন্ধে ল্যাম তাঁর সহোদরা মেরির ছবি ইতিপূর্বেই খানিকটা এঁকেছেন। 'Old China'-তে মেরির সে অসম্পূর্ণ ছবি সম্পূর্ণ হয়েছে। যখন তাঁদের আর্থিক অবস্থা তত ভালো ছিল না, তখন তাঁরা অনেক সুখে ছিলেন; এখন আর্থিক সচ্ছলতা পর্যাপ্ত, কিন্তু সেই সঙ্গে ঝক্কিও জমেছে অনেক। আগের সেই সহজ জীবন কোথায় হারিয়ে গেছে, আর তার সঙ্গে হারিয়ে গেছে যৌবনের দিনগুলি।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধের জনক ফরাসী লেখক মঁতেন-এর মতো রচনার মননশীলতা ল্যামের লেখায় আমরা খুঁজে পাই না; বুদ্ধির দীপ্তির চেয়ে অনুভূতির ছটা এখানে বেশি। অন্তরঙ্গতার দিক থেকে ল্যামের রচনার তুলনা পাওয়া কঠিন। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে গীতিকাব্যের সুর ল্যামই আমাদের প্রথম শুনিয়েছেন। নিজের প্রবন্ধগুলিতে নিজেকে নিঃশেষে প্রকাশ করেছেন—তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্বের এক সামগ্রিক রূপ এগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে। এগুলির অধিকাংশই আত্মজীবনমূলক। অতীত স্মৃতির অনুধ্যান ও অতীত অনুভূতির রোমন্থন এগুলির উপজীব্য। মার্কিন কবি হুইটম্যানের মতো ল্যামও বলতে পারতেন—

> Camerado, this is no book,
> Who touches this touches a man.

ফরাসী বিপ্লবের জ্বালাময়ী বাণীতে যে-রোম্যান্টিক যুগ ঝংকৃত সে যুগের মানুষ হয়েও ল্যাম রাজনীতি নিয়ে কোনোদিন মাতামাতি করেন নি। জেন অস্‌টিন্ বা কীট্‌সের সঙ্গে এদিক থেকে তাঁর সাদৃশ্য রয়েছে। তাঁর ঘনিষ্ঠ কবিবন্ধু ওয়র্ডসোয়র্থ বা কোল্‌রিজ যখন ফরাসী বিপ্লবের উগ্র সমর্থক ছিলেন তখন ল্যাম এ-ব্যাপারে মোটামুটি উদাসীন। পরে এঁদের মোহভঙ্গের সময়েও ল্যামের ঔদাসীন্য ছিল সমপর্যায়ের। ল্যাম যে-মানুষকে ভালোবাসতেন সে মানুষ সামাজিক জীব, রাজনৈতিক জীব নয়। আর সে মানুষ মানুষ-রূপেই ল্যামের কাছে আকর্ষক ছিল, তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য নয়। সাধারণ, এমন কি দরিদ্র নিপীড়িত, মানুষের জন্য গভীর দরদ ওয়র্ডসোয়র্থকে উদ্বুদ্ধ করেছিল জোঁক-কুড়ানো লোক বা কাম্‌বার্ল্যাণ্ডের ভিখারি নিয়ে কবিতা লিখতে। সেই দরদই আমরা দেখতে পাই ল্যামের রচনায়, যখন তিনি যারা চিমনি পরিষ্কার করে

সেই সব ছোটো ছেলেদের নিয়ে লিখেছেন কিংবা শহরে ভিখারিদের সংখ্যাল্পতা নিয়ে।

এই সব নীচের তলার বাসিন্দাদের জন্য দরদ আমরা সমকালীন আরও অনেক লেখকদের মধ্যে দেখি। ফরাসী বিপ্লব মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে-পরিবর্তন এনেছিল তার সঙ্গে একে মিলিয়ে দেখা যায়। আর এক দিকে কিন্তু ল্যাম অনন্য। যে-সব লোক একটু খেয়ালী ধরনের বা বাতিকগ্রস্ত, যারা ঠিক নিজেদের সংসারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি, পাগল না হয়েও যাদের ভাগ্যে সব সময় পাগলামির অপবাদ জোটে, সেই সব দুর্ভাগাদের প্রতি ল্যামের ছিল অকৃত্রিম স্নেহ। (পরবর্তী কালে চার্লস ডিকেন্স এদিক থেকে তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী।) সংসার গড়তে সব রকমের লোকেরই দরকার হয়, এই প্রবচনে তিনি ছিলেন আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী। তাই তাঁর প্রথম ইলিয়া-রচনাতে তিনি এমন অনেকের কথা বলেছেন যাঁরা সহকর্মী-রূপে তাঁর কর্মস্থলে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলেন। এঁদের একজনেরও লোকোত্তর গুণাবলী ছিল না, ছিল না মহত্ত্বের কোনো লক্ষণ। ল্যামের-যে তাঁদের ভালো লেগেছিল এর অন্যতম কারণ তাঁরা ছিলেন খামখেয়ালী এবং সে কারণেই স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক।

কোষাধ্যক্ষ ইভান্‌স্‌-এর কথাই ধরা যাক। সাজপোশাকে তিনি ফুলবাবু। সারা সকাল হিসাব নিয়ে ব্যস্ত ; সব সময় তাঁর ভয় কোথায় কি ভুল হয়ে যায়। সকলকেই তিনি **defaulter** ভেবে বসেন, হয়তো কোনো ঝোঁকের ঘোরে নিজেকেও রেহাই দেন না। দুপুরবেলা কিন্তু যখন তিনি কফী-হাউসে খেতে যান তখন তাঁর সেই 'মার্জার-সুলভ গাম্ভীর্য' উড়ে গিয়ে হাসি-হাসি ভাব ফুটে ওঠে। তাঁর সহকারী টমাস টেম একটা আভিজাত্যের ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়ান। বিদ্যা-বুদ্ধির জোর তাঁর ছিল না, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর বংশলতিকায় কোনো একটা অভিজাত-পরিবারের সম্পর্ক ছিল (খুব নিকট সম্পর্ক যদিও নয় বরং খানিকটা গোলকধাঁধাঁর মতো) এবং এইটাই স্বামী-স্ত্রীর অভাবগ্রস্ত জীবনের অন্ধকারে নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করত। হাস্যরস এখানে করুণরসের সঙ্গে মিশে গেছে।

হাসি ও অশ্রুর এই মিশ্রণ ল্যামের শৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর 'হাসিখানি স্থির / অশ্রুশিশিরেতে ধৌত'।

> বাহিরে যবে হাসির ঘটা,
> ভিতরে থাকে অশ্রুজল,

ল্যামের রচনা পড়তে পড়তে এ কথা আমাদের বার বার মনে পড়বে। এইজন্য বলা হয়েছে তাঁর হাস্যরসের একটা রঙ আছে, সেটা রামধনু-রঙ। রামধনু-রঙের বর্ণালীতে উজ্জ্বল হয়েছে 'ড্রীম চিলড্রেন' ও অন্যান্য লেখা।

রামধনু-বিচ্ছুরণ ল্যামের চিঠিপত্রের মধ্যেও রয়েছে। সেখানে তাঁর পরিহাস-বিজল্পনে অনেক সময় সকরুণ মূর্ছনা শোনা গেছে। আবার গম্ভীর জিনিসে অনেক

সময় তিনি হাসির উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। সাদী-কে একটি চিঠিতে ল্যাম লিখেছেন—

'I was at Hazlitt's marriage, and had like to have been turned out several times during the ceremony. Anything awful makes me laugh. I misbehaved once at a funeral.' (৯ই আগস্ট, ১৮১৫) একবার তাঁর কর্মস্থলে কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় একজন তাঁকে অভিযোগের সুরে বলেছিলেন—'আপনি প্রতিদিনই দেরীতে আসেন।' ল্যাম সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, 'তেমনই আমি তো প্রতিদিনই তাড়াতাড়ি চলে যাই।' গুরুকে লঘু এবং লঘুকে গুরু করার ক্ষমতা ল্যামের অসাধারণ, এবং এই কারণে তাঁর হাস্যরসের এত উৎকর্ষ।

অত্যুক্তি তাঁর হাস্যরসের অন্যতম অঙ্গ। তাঁর একটি রচনা তিনি আরম্ভ করেছেন এই বলে—'আমার কোনো কান নেই।' পরে তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন—কান নেই মানে সঙ্গীতের কান নেই। তবে ভিতরে ভিতরে একটু সঙ্গীতপ্রতিভা তাঁর নিশ্চয়ই ছিল, না হলে বন্ধু এয়ারটনের বাড়ি গিয়ে হঠাৎ তিনি যখন পিআনোতে টুং টাং আরম্ভ করেছিলেন তখন পাশের ঘর থেকে এয়ারটন কি করে বুঝলেন যে, পরিচারিকা জেনি বাজাচ্ছে না? নিশ্চয়ই সেই বাজানোর মধ্যে কোনো বড়ো শিল্পীর সুরের কোনো আভাস ছিল!

ল্যাম ছিলেন নাট্যরসিক। নাটক ও নাট্যাভিনয় তিনি ভালোবাসতেন গভীরভাবে। এটা তাঁর মানুষের প্রতি ভালোবাসারই এক বিশেষ রূপ। নাটকের সমালোচনায় তিনি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। রেস্টোরেশন-যুগের কমেডির স্বপক্ষে তিনি এক চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন। সেখানে তাঁর বক্তব্য বেশ অভিনব। আমাদের বাস্তব-জীবনে আমরা যে-নীতিবোধ দ্বারা পরিচালিত হই, নাটক পড়া বা দেখার সময় সে নীতিবোধকে বিচারের মানদণ্ড করলে চলবে না। নাট্যজগৎ একটা একেবারেই স্বতন্ত্র জগৎ—সেখানে এখানকার পুলিশী রীতিনীতি কায়েম করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। নাটকের জগতে প্রবেশ করেও আমরা নিজেদের কেন ভুলতে পারি না? 'We carry our fire-side concerns to the theatre with us. ...We dare not dally with images, or names, of wrong. We bark like foolish dogs at shadows.' শেক্স্পিয়রের ম্যালভোলিও সম্পর্কে ল্যামের মন্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ: 'Malvolio is not essentially ludicrous. He becomes comic but by accident.' মাণ্ডেন-এর অভিনয় সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি যেভাবে

প্রবন্ধ শেষ করেছেন তাতে যেন মনে হয় বেটোফেনের কোনো সঙ্গীত শমে এসে থামল—'He understands a leg of mutton in its quiddity. He stands wondering, amid the commonplace materials of life, like primaeval man, with the sun and stars about him.' কথাগুলি ল্যামের সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। প্রথম খণ্ডের ইলিয়া পর্যায়ের শেষ রচনার শেষাংশে ল্যাম যেন নিজেই নিজের 'এপিটাফ' লিখে গেলেন।

অতীতের অনুধ্যানে ল্যাম ছিলেন অতন্দ্র। অতীত তাঁর কাছে এত প্রিয় যে, অতীতের কোনো কিছু পরিবর্তনের অলৌকিক শক্তি যদি তাঁর থাকত তা হলে সে শক্তির তিনি প্রয়োগ করতেন না। অ্যান সিমন্সকে তিনি ভালোবেসেছিলেন কিন্তু সেই ব্যর্থ প্রণয় আজ তাঁর স্মৃতির ঐশ্বর্য ; ব্যর্থতা যদি হঠাৎ সার্থকতায় পরিণতি লাভ করে তা তাঁর পক্ষে অসহ্য হবে। যে-ঠক তাঁদের পরিবারকে আর্থিক দিকে প্রবঞ্চিত করেছিল ল্যাম তার সম্পর্কেও মনকে নিরুদ্বিগ্ন রেখেছেন। অর্থাৎ মাঝে মাঝে যে-সব তার ছিঁড়েছিল ল্যাম তাই নিয়ে হাহাকার করেন নি, কি পান নি সে হিসাব মিলাতে যান নি। বারংবার যে-সুর তাঁর জীবনে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে সেই সুরে মগ্ন থাকতে চেয়েছেন। ওয়র্ডসোয়র্থের মতো ল্যামেরও 'emotion recollected in tranquillity' মূলমন্ত্র—কি জীবনে, কি সাহিত্যে। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ যে-কথা হ্যাজলিট সম্পর্কে বলেছেন তা ল্যাম সম্পর্কেও প্রযোজ্য— 'তিনি সামনের দিকে দেখার চেয়ে পিছন ফিরে তাকাতে বেশি ভালোবাসেন।'

হ্যাজলিটের মতো ল্যামও ছিলেন গ্রন্থকীট এবং চিত্রশিল্পের সমঝদার। বই পড়া ল্যামের জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দের মধ্যে অন্যতম। বই পড়তে পড়তে তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন, অন্য জগতের তখন তিনি বাসিন্দা। 'Detached Thoughts on Books and Reading' প্রবন্ধে ল্যামের পুস্তকপ্রীতির অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। এ পরিচয় অবশ্য তাঁর সব লেখাতেই অল্পবিস্তর পরিস্ফুট। স্বাভাবিকভাবেই তিনি প্রাচীন গ্রন্থাদির প্রতি বেশি আকৃষ্ট হতেন। ফিলিপ সিডনির সনেট কিংবা আইজাক ওআলটনের মাছ-ধরার গল্প ল্যামকে মুগ্ধ করে রাখত। ইলিজাবেথের যুগের নাট্যসাহিত্য পড়ে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন এবং এ থেকে বিশিষ্ট দৃশ্যাবলীর এক সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থে তিনি যে-সব টীকা-টিপ্পনী সংযোজিত করেন তা বিশেষ মূল্যবান্। মার্লোর নৃপতি দ্বিতীয় এডওআর্ডের রাজ্যহানির যন্ত্রণা কিংবা ওএবস্টারের নায়িকা ডাচেসের মর্মবেদনা ল্যামের কয়েকটি সুনির্বাচিত শব্দে চিরদিনের জন্য গ্রথিত। শেক্‌স্‌পিয়রের ট্র্যাজেডির তিনি নতুনভাবে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর মতে শেক্‌স্‌পিয়রের 'কিং লীয়র' নাটক

অভিনয় করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। পরবর্তী কালে গ্র্যান্‌ভিল-বার্কার প্রমুখ প্রযোজক-সমালোচকেরা যা-ই বলুন না কেন, ল্যামের যুক্তি আজ পর্যন্ত ভালো ভাবে খণ্ডন করা সম্ভব হয় নি।

তবে বই ল্যাম খুব ভালোবাসলেও মানুষকে ভালোবাসতেন অনেক বেশি। তাই তিনি বলেছেন যে, তিনি সব চেয়ে খুশী হন যখন সদর দরজার কলিং বেল বেজে ওঠে; তখন তাঁর অধীর আগ্রহ ও ঔৎসুক্য আগন্তুকের পরিচয় জানবার জন্য। তাঁর বন্ধুর সংখ্যা অনেক, এবং তাঁদের মধ্যে ওয়র্ডসোয়র্থ, কোল্‌রিজের মতো সমকালীন বিশিষ্ট লেখক থেকে আরম্ভ করে সাধারণ লোকেরাও ছিলেন। তিনি অপছন্দ বা ঘৃণা করতেন এমন লোক বিরল। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়—'আপনি অমুক লোককে অপছন্দ করেন?' তার উত্তরে তিনি বলেন—'কি করে অপছন্দ করব? আমার সঙ্গে যে তার পরিচয় হয়েছে।' এই অসাধারণ উদারতা ছিল বন্ধুবৎসল সদালাপী ল্যামের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। যে-সব জিনিস তাঁর ভালো লাগত না, সেগুলির প্রতি তিনি 'imperfect sympathy' পোষণ করতেন, antipathy নয়।

মানবচরিত্রে ল্যামের ছিল গভীর অন্তর্দৃষ্টি। জীবনের নানা দিক নিয়ে তাঁর যে-সব উক্তি রয়েছে সেগুলির মধ্যে এই অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে। তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার তিনি আমাদের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এই জ্ঞান কিন্তু জীবনের রাজপথের জ্ঞান নয়, এ জ্ঞান জীবনের গলিঘুঁজির। সংস্কৃত কবি বলেছেন, ঘনাম্বুতে রাজপথ পিচ্ছিল হলে সুধীজনেরও অপথ দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। অপথ দিয়ে যাতায়াত করার জন্য চার্লস্ ল্যাম কিন্তু ঋতু বিচার করেন নি—বর্ষা-শরৎ নির্বিশেষে তিনি এ পথে পা বাড়িয়েছেন। এই নিয়ে তাঁর অহংকার, আর এইজন্যই তিনি আমাদের এত কাছের মানুষ। বইয়ের শুষ্ক পাতা থেকে তিনি সাংসারিক জ্ঞান আহরণ করেন নি, পুঁথির চশমা পরে জীবনের দিকে দেখেন নি। তাই তিনি অনায়াসে পৃথিবীর সব লোককে দুই ভাগে ভাগ করতে পেরেছেন—যারা টাকা ধার দেয় আর যারা টাকা ধার করে। তাঁর মতে কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা উত্তম আর প্রথম শ্রেণীর লোকেরা অধম। উত্তম শ্রেণীর যিনি সর্বোত্তম সেই র‍্যাল্‌ফ্ বিগড্-এর হালচাল তাঁর কাছে রাজকীয়' মনে হয়েছে, 'ideal' মনে হয়েছে। আবার শিক্ষাদানের দুই পদ্ধতি ল্যাম প্রাচীন ও নবীন শিক্ষকের মধ্যে রূপায়িত দেখেছেন। প্রাচীন শিক্ষকের একাগ্রতা ও নিষ্ঠার বদলে নবীন শিক্ষক বেছে নিয়েছেন পল্লবগ্রাহিতা। ল্যাম এখানে ক্ষমাহীন, অথচ এই একজন নবীন শিক্ষকের দাম্পত্যজীবনের-যে করুণ দিকের তিনি আভাস দিয়ে গেলেন সেখানে তাঁর অসামান্য দরদ ফুটে উঠেছে। ল্যামের অনেক প্রবন্ধের মতো এটিও কান্না-হাসির দোলায় স্পন্দিত।

একবার তাঁর একটি সনেট প্রকাশিত না হওয়ায় ল্যাম খানিকটা পরিহাসচ্ছলে ঠিক করেন যে, তিনি 'পুরাকালের জন্য' লিখবেন। ল্যাম যতই পুরাকালের জন্য লিখে থাকুন না কেন ভাবীকালের মানুষদের কাছে এত জনপ্রিয়তা খুব কম লেখকই অর্জন করতে পেরেছেন। তাঁর যুগের যুগান্তকারী লেখক ওয়র্ডসোয়র্থের পাশে ল্যামের স্থান। ওয়র্ডসোয়র্থ ছিলেন প্রকৃতি-পাগল, ল্যাম ছিলেন শহুরে, কিন্তু দুইজনেরই ছিল মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী, এবং দুইজনেই কালজয়ী সাহিত্য রচনা করে গেছেন। এঁদের কথা ভাবতে গেলে আর একবার হুইটম্যানের কথা মনে পড়বে—

Behold, I do not give lectures or a little charity,
When I give I give myself.

ল্যাম নিজেকে তাঁর রচনার মধ্যে নিঃশেষ করে দিয়ে গেছেন। যত দিন তিনি বেঁচেছিলেন তিনি সৌন্দর্যের পূজারী হয়ে বেঁচেছিলেন—এ দিক থেকে তিনি কীট্সের সমগোত্রীয়। আর সৌন্দর্য তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন শুধু সাহিত্যের প্রাঙ্গণে বা সতীর্থ্য কোল্‌রিজের কথোপকথনে, কিংবা তুলনাহীনা অ্যানের চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে বা মিস্ কেলির অনবদ্য অভিনয়নৈপুণ্যে নয়, লন্ডেল-এর মতো বিচিত্রচরিত্র মানুষের মধ্যে ও লণ্ডন-শহরের জনবহুল সরণিতেও। তবে সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়িত্বে অন্য কবিদের মতো তিনিও বিচলিত, তাই তিনি প্রেমের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজেছেন, যেমন খুঁজেছেন ল্যাণ্ডর—

Soon, O Ianthe, life is o'er,
And sooner beauty's heavenly smile :
Grant only (and I ask no more)
Let love remain that little while.

বিশ্বসাহিত্যের দিক্‌পাল লেখকদের মধ্যে ল্যামের কোনো স্থান নেই। সফোক্লীজ, শেক্‌স্‌পিয়র কিংবা টলস্টয়ের সঙ্গে একাসনে তাঁকে বসানো হয় না। তবু তাঁর অনুরাগী পাঠকদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, যদি তাঁদের পৃথিবীর লেখকদের মধ্য থেকে একজনমাত্র লেখককে নির্বাচন করে নিতে বলা হত তাঁরা তাঁদের নির্বাচন নিয়ে কোনোরকম দ্বিধায় পড়তেন না। 'গ্রেস বিফোর মীট' প্রবন্ধে ল্যাম প্রস্তাব করেছেন যে, আহারের আগে যেমন স্বস্তিবচন পাঠ করার রীতি আছে, মিল্টন বা স্পেন্সার পড়ার আগে সে রীতিরই অনুসরণ করা উচিত। ছাত্রদের কাছে ল্যামের প্রবন্ধকে অবিস্মরণীয়ভাবে যিনি উপস্থাপিত করতে পারতেন সেই স্বর্গত অধ্যাপক তারকনাথ সেন মনে করেন যে, ল্যামের প্রস্তাবের পরিধি আরও বিস্তৃত করার প্রয়োজন রয়েছে। ইলিয়ার রচনা আমাদের অমেয় সম্পদ্। সে রচনার জন্যও সৃষ্টিকর্তার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।

ডে লা মেয়ার : তাঁর সাহিত্য

জনপ্রিয় লেখক সব সময় মহান্ লেখকরূপে স্বীকৃতি পান না। যোগ্যতা থাকলেও সমার্সেট মম পান নি। ওআলটার ডে লা মেয়ার এদিক থেকে ভাগ্যবান। সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর সমাদর যত বেড়েছে সমালোচকের প্রশস্তি তিনি তত বেশি অর্জন করেছেন। য়েট্স ও এলিঅটের যুগের কবি হয়েও এবং তাঁদের মতো কবিতা না লিখেও তাঁদের এবং অন্যান্যদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো অলোকসাধারণ কবিপ্রতিভার তিনি অধিকারী ছিলেন। আধুনিক যুগের লেখক হলেও তাঁর লেখায় তথাকথিত আধুনিকতা দুর্লভ। সংবাদপত্রে যেসব ঘটনার বিবরণ থাকে শুধু তাই নিয়ে কবিতা লিখলে যদি বাস্তববাদী হওয়া যায় তা হলে ডে লা মেয়ার নিঃসন্দেহে বাস্তববাদী লেখক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর অনেক কবিতা ও কাহিনীতে তিনি যেভাবে মানব-মনের গহনে আলোকপাত করেছেন তা বহু আধুনিক লেখকের রচনাতেই সহজলভ্য নয়। একটা নতুন কিছু করাকে বা বৈপ্লবিক হওয়াকে বা পাণ্ডিত্য দেখানোকে যাঁরা আধুনিকতা মনে করেন তাঁরা নিশ্চয়ই ডে লা মেয়ারকে 'আধুনিক' কবিরূপে স্বীকার করবেন না। তবে আধুনিকতার এই উগ্র রূপটাই সবার আগে তার আধুনিকতা হারায় ও পুরনো হয়ে যায়। প্রকৃত আধুনিকের মধ্যে এমন এক বিশ্বজনীনতা আছে যা সব কালের কাছে সমকালীন মনে হয়। চিরন্তনের রং তার অঙ্গে, তাই সে চিরনবীন। এই বর্ণালীতে রঞ্জিত বলেই ডে লা মেয়ারের কবিতাতে কোনো দিন ম্লানতা আসবে না।

সুন্দরের আনন্দের কখনো হয় না ক্ষয়, একথা জেনেও ডে লা মেয়ার বাহ্যিক সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়িত্বে বিচলিত না হয়ে পারেন নি। কীট্সের মতো, ব্রিজেসের মতো তিনিও সৌন্দর্যলাবী কামনায় অধীর হয়ে উঠেছেন। এই কামনা থেকে তাঁর মুক্তি নেই। একথা জেনে বিষণ্ণ হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তাই তাঁর এক কবিতা থেকে অন্য কবিতায় বারংবার বিষাদের মূর্চ্ছনা শোনা গেছে। টমাস্ হার্ডির মতো নৈরাশ্যগ্রস্ত না হলেও বিশ্ববিধাতার বিধানের মঙ্গলরূপ সম্পর্কে ডে লা মেয়ার সব সময় খুব সচেতন থাকতে পারেন নি। তবে যখন পেরেছেন তখন তাঁর অন্তরের আর্তি ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে, যেমন 'দ্য স্ক্রাইব' কবিতার প্রথম দুইটি ছত্রে—

> **What lovely things**
> **Thy hand hath made.**

(কবিও তো তাঁর নিজের অপার কাব্যসংসারের প্রজাপতি ; এই কথাগুলি আমাদের ডে লা মেয়ারের রচনা সম্পর্কেও ব্যবহার করতে ইচ্ছা হতে পারে।) যেসব

'লাভলি থিংস' আমাদের আশেপাশে ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে তাদের আমরা যেন দু-চোখ ভরে দেখতে পারি এবং সে দেখা যেন চর্মচক্ষু থেকে মর্মনেত্রে সঞ্চারিত হয়। আমাদের ভালো লাগার রঙে সে-সব জিনিস আরও রঙিন হয়ে উঠবে, যেমন আমাদের আগে যারা এসেছে এবং ভালোবেসেছে তাদের ভালোবাসার দীপ্তি আজও সবকিছুর মধ্যে অম্লান—

> Look thy last on all things lovely,
> Every hour. Let no night
> Seal thy sense in deathly slumber
> Till to delight
> Thou hast paid thy utmost blessing ;
> Since that all things thou wouldst praise
> Beauty took from those who loved them
> In other days. ('Fare Well')

ডে লা মেয়ার তাঁর পাঠকদের ভালোবাসা পেয়েছেন অকুণ্ঠ, যেমন পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ বা শেক্‌স্‌পিয়র, চার্লস্‌ ল্যাম বা ডিকেন্স। অনেক বড় ও খ্যাতিমান লেখকের ভাগ্যে এটা জোটে না। পাঠককে ডে লা মেয়ার খুব সহজে আপন করে নিতে পারেন, কারণ তাঁর সব রচনাতেই তাঁর স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের স্পর্শ রয়েছে, রয়েছে একটি সুন্দর সংবেদনশীল মনের ছাপ। তাঁর চিত্ত ছিল কাব্যসংগীতে ঝংকৃত, তাঁর হৃদয় ছিল কাব্যসুলভ সুষমায় পরিপূর্ণ। সর্বস্তরের মানুষের জন্য তাঁর দরদ ছিল অপরিসীম। শিশুদের জন্য তাঁর ছিল সীমাহীন স্নেহ ; তাই তিনি সহজে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারতেন ও তাদের চোখ দিয়ে বিশ্বসংসার নিরীক্ষণ করতে পারতেন ; তাই তাঁর কবিতায় অনেক সময় একটা দুর্লভ সারল্য ও পবিত্রতা এসেছে। একটি বৃদ্ধা রমণীর জরাগ্রস্ত রূপকে তিনি অসীম সহানুভূতি নিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন 'এজ্‌' কবিতায় এবং আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, যৌবনে এই দেহেই ছিল অপরূপ সৌন্দর্যের শিহরণ। গাছ থেকে ঝরবার সময় পাতার যে-অবস্থা হয় তার কম্পমান হাত-পায়ের অবস্থা এখন সেই রকম ; ঝড়ের বেগ প্রশমিত হওয়ার পর সাগরের জলের মতো তার হৃদয় এখনও স্পন্দমান। আর একটি দুর্ভাগিনীকেও তিনি তাঁর কবিতায় অমর করে রেখেছেন। এই সন্তানহীনা স্থূলাঙ্গিনী নারী 'দ্য ফ্যাট উওম্যান' কবিতার নামহারা নায়িকা—

> **A smile lurks deep in her eyes,**
> **Thick-lidded, motionless, pale,**
> **Taunting a world grown old,**
> **Faded, and stale.**

Enormous those childless breasts :
God in His pity knows
Why, in her bodice stuck,
Reeks a mock rose.

এই প্রসঙ্গে ডে লা মেয়ারের 'মেময়র্স অফ অ্যা মিজিট' উপন্যাসটির কথা মনে পড়ে। এর নায়িকা মিস্ এম্-এর মতো এত স্মরণীয়, এত জীবন্ত চরিত্র আধুনিক কথাসাহিত্যে বিরল। সে-যে খুব খর্বকায় একথা লেখক বিশদভাবে কখনো বর্ণনা করেন নি, কিন্তু অপূর্ব ব্যঞ্জনা ও বক্রোক্তির সাহায্যে মেয়েটির সমস্ত আত্মজীবনী থেকে এটা স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার চারপাশে সব সাধারণ লোকের মাঝে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে তার বিড়ম্বনার চিত্র ডে লা মেয়ার মর্মস্পর্শীভাবে অঙ্কন করেছেন। খর্বতা তার শুধু দেহেই নয়, তার মন, স্বভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গীকেও আক্রান্ত করেছে। এটাই মিস্ এম্-এর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। সে কোনো সময়ই ভুলতে পারে না যে, কারও সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময়ের সময় তাকে উপরের দিকে চোখ তুলতে হয় এবং অপরজনকে তার দিকে চোখ নামাতে হয়। তার প্রতি মিস্টার অ্যানন-এর (এইসব নামকরণ যথেষ্ট অর্থবহ) একনিষ্ঠ অনুরাগ আমাদের মনকে বিশেষভাবে বিচলিত করে। গভীর আন্তরিকতা ও নিপুণ শিল্প-কলা উপন্যাসটিকে বিশ্বের কথাসাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান দিয়েছে।

মানুষের জন্য এই সস্নেহ অনুকম্পা 'ইন্ দ্য ফরেস্ট'-এর মতো ছোটগল্পকে সহনীয় করে তুলেছে। গৃহকর্তা যুদ্ধে যাওয়াতে তার স্ত্রী, ছেলে ও শিশুসন্তানকে কি বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয়েছিল এবং গৃহকর্তা মুমূর্ষু অবস্থায় যুদ্ধ থেকে ফিরে আসায় সেই বিপর্যয়ের কি চূড়ান্ত পরিণতি হয় তার মর্মন্তুদ ছবি এই কাহিনীতে আঁকা হয়েছে। যুদ্ধের বর্বরতার এইসব নগ্ন চিত্রের প্রদর্শনের পরেও আজও যুদ্ধ ঘটছে, 'সভ্য' মানবসমাজের পক্ষে এর চেয়ে লজ্জাকর আর কিছু হতে পারে না। শুধু মানুষের জন্য নয়, ক্ষুদ্রতম প্রাণীটির দুঃখেও তিনি বেদনার্দ্র। তাই তাঁর 'হাই' কবিতায় তিনি শিকারীদের জীবহত্যার নিষ্ঠুর আনন্দকে বিদ্রূপের কশাঘাত করতে দ্বিধা করেন নি। তাই বৃদ্ধ নিঃসঙ্গ গর্দভেরও তিনি সমব্যথী হতে পেরেছেন 'নিকোলাস্ নাই' কবিতায়।

সাধারণ মানুষ ও সাধারণ প্রাণীদের জন্য যে-অসাধারণ দরদ আমরা ডে লা মেয়ারের লেখায় প্রত্যক্ষ করি, তারই অন্য এক রূপ পাই সাধারণ জিনিসগুলির প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণের মধ্যে। এই আকর্ষণই তাঁকে শক্তি দিয়েছে স্বাভাবিককে তাঁর রচনায় অ-স্বাভাবিক করে তোলার। স্বপ্নলোকে প্রয়াণের দিকে তাঁর সহজাত প্রবণতা থাকলেও বাস্তব জগৎকে তিনি বিস্মৃত হন নি। বাস্তব জগতের থেকে অনেক দূরে কোনো অদৃশ্য কাল্পনিক লোকে স্বপ্ন-সৌধের নির্মিতিতে কোনো কোনো কবি সর্বদা নিবিষ্ট থাকলেও ডে লা মেয়ার

তাঁর কল্পরাজ্যকে অনেক সময় প্রতিষ্ঠা করেছেন মাটির পৃথিবীর বুকে। দৈনন্দিন পার্থিব জিনিস তাঁর লেখনীর জাদুমন্ত্রে অপার্থিব হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে তিনি প্রকৃত রোম্যান্টিক কবি। ওয়র্ডসোয়র্থের মতো তিনিও অতি-পরিচিতের মধ্যে খুব সহজ ও আকস্মিকভাবে অপরিচয়ের বিস্ময় ও আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেন। প্রাত্যহিকতায় যা ক্লিষ্ট তাকে তিনি তাঁর কবিতায় নতুন লাবণ্য দান করেন। মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, রাত্রি, উষা, পতঙ্গ, খরগোশ, আয়না, কুয়াশা, বাতির আলো, ছায়া, শীতের গোধূলি, লিনেট পাখি, চেরী ফুলের গাছ—এই সব সাধারণ বিষয়বস্তুকে তিনি অনায়াসে অসাধারণ করে তুলতে পেরেছেন। মিতভাষণে, শব্দচয়নে ও ছন্দোবন্ধনে তাঁর অতুলনীয় দক্ষতা থাকলেও সে দক্ষতা লুকিয়ে থাকে তাঁর কবিতার গভীর অন্তস্তলে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, তিনি স্বভাবকবি মাত্র এবং যেমন মনে এসেছে তেমনি লিখে গেছেন, প্রয়াস, অনুশীলন, সংশোধনের প্রয়োজন হয় নি। তাঁর কবিতা এসেছে, কীট্‌সের ভাষায়, তেমন স্বাভাবিকভাবে যেমন স্বাভাবিকভাবে গাছেতে পাতা আসে। তাঁর 'দ্য হর্সম্যান' কবিতার কথা মনে পড়ে—

I heard a horseman
Ride over the hill ;
The moon shone clear,
The night was still ;
His helm was silver,
And pale was he ;
And the horse he rode
Was of ivory.

এই বিশেষ কবিতাটি অবশ্য প্রধানত ছোটদের জন্য লেখা 'পীকক্ পাই' কাব্য-গ্রন্থের প্রথম কবিতা। ছোটদের জন্য এত অসংখ্য ভালো কবিতা পৃথিবীতে বেশি কবি লেখেন নি। কিন্তু ডে লা মেয়ারের কল্পনার ইন্দ্রজাল বড়দের কবিতাতেও সমভাবে ছড়ানো। তাই অনেক সময় তাঁর ছোটদের ভালো কবিতা ও বড়দের ভালো কবিতা একাকার হয়ে গেছে, যেমন একাকার হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের 'প্রেম'-এর গান ও 'পূজা'র গান। 'দ্য হর্সম্যান' যে-সময়ের লেখা সেই সময়ের কাছাকাছি লেখা হয় তাঁর বিশ্ববিশ্রুত কবিতা 'দ্য লিস্‌নার্স'।

'দ্য লিস্‌নার্স'-ও এক ঘোড়সওয়ারের কবিতা, এবং ডে লা মেয়ার খুব সহজেই আমাদের পরিব্রাজক ঘোড়সওয়ারের সঙ্গী করে নিতে পেরেছেন। দূরদেশের অরণ্যাচ্ছন্ন দুর্গ-প্রদেশে আমরাও তার সঙ্গে পৌঁছে যাই। চারদিকে অন্তহীন নীরবতা, সবকিছু নিশ্চল, নিস্পন্দ। গভীর, স্তব্ধ রাতের অন্ধকারকে চাঁদের আলো আরও রহস্যময় করে তুলেছে। ঘোড়সওয়ার দ্বারদেশে প্রবেশপ্রার্থী কিন্তু কেউ

তাকে দরজা খুলে দিল না, এমন কি কোনো সাড়াও দিল না। শুধু সেই নির্জন নিবাসের অধিবাসী একদল নীরব অদৃশ্য অশরীরী শ্রোতা জগতের থেকে আসা এই শব্দ শুনতে পেল। নিঃসঙ্গ পথিক দরজায় আরও জোরে ধাক্কা দিল, এবং বলে গেল, 'তাদের বোলো, আমি এসেছিলাম, কিন্তু কেউ সাড়া দেয় নি, তবে আমি আমার কথা রেখেছি।' তারপর ঘোড়ার খুরের শব্দ যখন আস্তে আস্তে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল তখন আবার সেই অখণ্ড নীরবতার মৃদু তরঙ্গ সব কিছু প্লাবিত করে দিল।

তাঁর অপরূপ কাহিনী-কবিতা 'দ্য লিসনার্স'-এর মধ্য দিয়ে ডে লা মেয়ার কোনো তত্ত্বকথা বলতে চেয়েছেন কিনা আমরা জানি না, কিন্তু অনেক পাঠক ও সমালোচকের মনে নানা ধরনের রূপকের কথা উদিত হয়েছে। এর মধ্যে কোন্ ব্যাখ্যাটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য তা বলা কঠিন। কেউ কেউ আবার কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, যে-ব্যাখ্যাতে ব্যাখ্যাকারের চাতুরী অনেক বেশি পরিস্ফুট কবির বক্তব্যের চেয়ে। এ যেন গ্রন্থি মোচন করতে না পেরে গ্রন্থি ছেদন করতে যাওয়া। আমাদের উচিত কবিতাটিকে শুধু কবিতারূপেই গ্রহণ করা। এর অর্থের মধ্যে যে-রহস্য ঘনীভূত সেটা কবিতার রহস্যময় পরিবেশের সঙ্গে মিশে গেছে। কোনো একটা বিশেষ অর্থ উদ্ঘাটিত করলে রহস্যের উন্মোচন হয়তো হবে কিন্তু কবিতাটির আকর্ষণ অনেক কমে যাবে। যে-নীরব শ্রোতাদের কথা ডে লা মেয়ার কবিতাটির নামের মধ্যে উল্লেখ করেছেন তারা কারা, ঘোড়সওয়ারই বা কে, জায়গাটাই বা কোথায়, এই সব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেইও বটে, আবার যে-কোনো উত্তর হতে পারেও বটে। স্থান-কাল-পাত্রকে কবি অনির্দিষ্ট রাখাতে কবিতাটির বিশ্বজনীনতা অনেক বেড়ে গেছে। পথিক, তীর্থযাত্রী, ঘোড়সওয়ার, এরা সবাই একটা লক্ষ্যের দিকে চলে কোনো অভীষ্ট বস্তুর সন্ধানে। এদের যাত্রার কথা সব দেশের কাব্যে বার বার এসেছে, এদের চলা অবিরাম, অবারণ চলা। এ চলা আমাদের সকলের, কারণ আমরা সকলেই তীর্থযাত্রী জীবন-তীর্থের পথে। কবির ঘোড়সওয়ারকে তাই বিশ্বমানবের প্রতীক বা প্রতিনিধি মনে করতে কোনো বাধা নেই। তার সামনে যে-দরজা খুলল না সে দ্বার যেন মর্ত্যলোক ও অমর্ত্যলোকের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছে। ঘোড়সওয়ারের যে-বাণী বলা হল না সেটা আমাদের সকলের না-বলা বাণী, যার প্রকাশের ব্যথা আমাদের সকলকে ব্যাকুল করে তোলে। যে-মিলনে সে মিলিত হতে পারল না সে মিলনের প্রত্যাশী আমরা সকলে। সেই মিলনের আকুলতাই বিরহপীড়িতা শ্রীরাধার আর্তির মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে। 'বিদ্যাপতি কহে হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিন-রাতিয়া!' ডে লা মেয়ারের নায়কের কাছে সব কিছু শেষ পর্যন্ত প্রহেলিকা রয়ে গেল। জীবনও আমাদের কাছে শেষ পর্যন্ত প্রহেলিকাই থেকে যায়। মৃত্যু আমাদের কাছে রহস্যময়, পরলোক আমাদের কাছে অজানা, জীবন-মৃত্যুর সীমানাতে এসে আমাদের কৌতূহল তাই অন্তহীন হয়ে ওঠে। তবু শেষ

পর্যন্ত মরণের মতো জীবনের স্বরূপও রহস্যাবৃত থেকে যায়। জীবনের আশপাশে প্রকৃতির মাঝে আমরা যে-সমস্ত সৌন্দর্য দেখি তার সুন্দরতা কি শুধু মানুষের চেতনার মাঝে, মানুষের অনুভূতিতে, না সেগুলির স্বকীয় লাবণ্য রয়েছে যে-লাবণ্যের নন্দনকাননে আমরা মত্ত মাতঙ্গের মতো প্রবেশ করে সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মাঝে নিজের স্রষ্টাকেই ভুলে বসি অহমিকার আতিশয্যে, এই প্রশ্ন ডে লা মেয়ারকে 'অ্যা রিড্‌ল্' কবিতায় বিব্রত করে তুলেছে। এই ধরনের 'রিড্‌ল্' বা প্রহেলিকাই 'দ্য লিসনার্স' কবিতার কেন্দ্রবিন্দু ; তাই কবি ইচ্ছা করেই কবিতাটির সবকিছুর মধ্যে অনন্ত রহস্যের ব্যঞ্জনা ধ্বনিত করেছেন। এই রহস্য ভেদ করা সম্ভব নয়, তার কারণ এ রহস্য জীবনের সেই গভীর অনুদ্ঘাটিত রহস্য, যা থেকে মানুষের উৎপত্তি ও মানুষের লয়। আর যদি এ রহস্য ভেদ করা যেত তা হলে কবিতাটির অপমৃত্যু ঘটত।

'দ্য লিস্‌নার্স' শুধু ডে লা মেয়ারের শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্যতমই নয়, আধুনিক কাব্যের বিবর্তনে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। যে-রহস্য এর প্রাণ সেই রহস্যের দিকে প্রবণতা ডে লা মেয়ারের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর বহু কবিতায় সেটা লক্ষ করা যায়। কোনো কবিতাতেই তিনি সুদূর, অদ্ভুত, অপরিচিত কোনো বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন নি। আমাদের পরিচিত পরিবেশ থেকে তিনি নিজস্ব কাব্যলোক সৃষ্টি করে নিয়েছেন। পরিচিতকে তিনি তাঁর ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে অভিনব করে তুলতে পারেন। (তিনি খুব সচেতন শিল্পী এবং শব্দের চয়নে, রূপকল্পের ব্যবহারে এবং ছন্দের প্রয়োগে সর্বদা সযত্ন ও সতর্ক, এ কথা সব সময় মনে রাখতে হবে।) 'দ্য রেলওয়ে জাংশান' কবিতাটি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কবিতাটি পড়ার সময় আমাদের একই সঙ্গে মনে হবে কত পরিচিত অথচ কি বিচিত্র সবকিছু। কবিতাটির কাহিনীতে কোনো জটিলতা নেই। একদল অপরিচিত লোক সবেমাত্র ট্রেনে রওনা হয়ে গেল। জাংশানে শুধু কবি একলা রয়ে গেলেন। ট্রেনের সব যাত্রীরা পাহাড়ের দিকে কিংবা সমুদ্রের অভিমুখে গেছে। কবি তৃতীয় কোনো দিকে যাবেন যেটা অনির্দিষ্ট। যাত্রীদলে নানা বিভিন্ন ধরনের লোক ছিল—একজন চাকর, একজন ধর্মযাজক, একজন বিধবা ও তার ছেলে, একজন বন্দুকধারী শিকারভূমির রক্ষক এবং একজন রহস্যময়ী নারী যে নিজেকে গোপন রাখতে সচেষ্ট। তারা চলে যাওয়ার পর কবি মন্তব্য করেছেন, 'কেন এইভাবে আমাদের দেখা হল আমি কিছুই জানি না, জানি না তাদের চিন্তাভাবনা কোন্ ধরনের, কি কি তাদের আকাঙ্ক্ষা, আশা, তাদের ভাগ্যলিপি। আর রাত-হয়ে-যাওয়া এই সন্ধ্যায় আমার স্মৃতিতে কি থাকবে এ ছাড়া যে, এই অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর পথ দুদিকে বেঁকেছে, এর মধ্যে একটা গেছে অন্ধকার-হয়ে-আসা পাহাড়ের দিকে, আর একটা দূরের সমুদ্রের দিকে?' এই কবিতার কোনো গূঢ়ার্থ আছে কিনা, বা থাকলে কি, আমরা জানি না ; কবি ইচ্ছা করেই আমাদের জানান নি। এখানেও মানুষের

জীবনের কোনো রূপক থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু আমরা এটুকু জানি, এ কবিতা যতবার পড়া যায় ততবারই আমাদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করে এবং নতুনভাবে ভাবায়। ভালো কবিতার এর চেয়ে বড় লক্ষণ আর কি হতে পারে? 'দ্য রেলওয়ে জাংশান' কবিতাটি আরও বিচিত্র ভাববাহী হয়ে উঠবে আমাদের কাছে যদি আমরা প্রখ্যাত মার্কিন কবি রবার্ট ফ্রস্ট-এর লেখা 'দ্য রোড নট্ টেক্ন' নামে অপূর্ব কবিতাটির সঙ্গে এটিকে মিলিয়ে পড়ি।

'দ্য লিস্নার্স' কবিতায় যে-অতিপ্রাকৃতকে ডে লা মেয়ার আমাদের কাছে এত নিকট ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন সে-অতিপ্রাকৃত তাঁর কবিতায় বারংবার ধরা দিয়েছে। বার বার তিনি কোনো অমর্ত্যালোকের বারতা মর্ত্যবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। নির্জনতা বা নিঃসঙ্গতা, নীরবতা, নিশ্চলতা বা নিস্পন্দতা-যে কত বাঙ্ময় হয়ে উঠতে পারে তা ডে লা মেয়ারের আগে আর কোনো কবি আমাদের জানান নি। এক নিমেষে তিনি আমাদের নতুন জগতে নিয়ে যেতে পারেন যে-জগৎ কখনো রূপকথা বা উপকথার জগৎ, যেখানে পরীর মেলা, অপ্সর-কিন্নরের ছড়াছড়ি, কখনো বা এক রহস্যলোক যেখানে নানা অলৌকিক শক্তির প্রকাশ এবং সে অলৌকিক শক্তি সময় সময় অশুভ-অমঙ্গলেরও দ্যোতক। (টমাস্ হার্ডির রচনার ডে লা মেয়ার ছিলেন অনুরাগী পাঠক এবং হার্ডির দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন।) রচনা থেকে রচনান্তরে ডে লা মেয়ার তাঁর স্বপ্নের ও স্মৃতির জাল বুনে গেছেন। স্বপন-পসারী কবি টমাস্ বেডোস্-এর মতো ডে লা মেয়ারও বলতে পারতেন—

> The bitter past
> And the untasted future I mix up,
> Making the present a dream-figured bowl.

যদি কোনো কবি কখনো স্বপ্নলোকের চাবি খুঁজে পেয়ে থাকেন সে কবির নাম ওয়ালটার ডে লা মেয়ার। এই স্বপ্নলোকের সন্ধানে মাঝে মাঝে তিনি দূরে, বহু দূরে চলে গেছেন, তাতার বা আরব-বেদুইনদের মতো অজানা অচেনা দেশে নিজের মনের মতো ঘর খুঁজে পেয়েছেন। আরব-দেশ তাঁর ইলিরিয়া, তাঁর উজ্জয়িনী, তাঁর ইনিস্ফ্রী। সব যুগের সব রোমান্টিক কবির মতো তিনিও একটা নিভৃত লোকে গিয়ে দু-দণ্ড শান্তি ও সাময়িক বিরতি খুঁজেছেন, তাই সুদূর-সুন্দর আরব-দেশের উন্মাদক আকর্ষণে তিনি অভিভূত—

> They haunt me—her lutes and her forests;
> No beauty on earth I see
> But shadowed with that dream recalls
> Her loveliness to me:

Still eyes look coldly upon me,
Cold voices whisper and say—
'He is crazed with the spell of far Arabia,
They have stolen his wits away.' ('Arabia')

জ্ঞানের রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে থাকতে থাকতে ডে লা মেয়ারের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে তাই কল্পনার উন্মুক্ত আকাশে তাঁর পরিক্রমা, এ কথা তিনি নিজেই তাঁর 'ড্রীমস' কবিতায় বলেছেন। বাস্তব জগৎকে তিনি অবহেলা করেন নি ঠিকই কিন্তু বাস্তব যেখানে অবাস্তবের সঙ্গে মিশেছে সেই আলো-আঁধারির জগৎ-ই ডে লা মেয়ারের নিজস্ব জগৎ। সেখানে বিচিত্র এক ছায়া-মিছিলের তিনি সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু সে ছায়াকে তিনি এত চিত্তহারী ও মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন যে, আমাদের মনে তার কায়িক রূপ সম্বন্ধে বিভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। ছায়ালোক তাঁর কবিতায় প্রাণবন্ত। কোলরিজের পরে ইংরাজী কবিতা আর কখনো এত স্বপ্নমদির সুরভি নিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে নি।

কবি ডি. এচ্. লরেন্স

ডি· এচ্· লরেন্স মূলত কথাশিল্পী। তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতির মূলে রয়েছে 'সান্স অ্যাণ্ড লাভার্স' ও 'উইমেন ইন লাভ্'-এর মতো উপন্যাস। (শিল্পকর্ম হিসাবে 'লেডি চ্যাটার্লীজ লাভার'-এর মূল্য নগণ্য।) কিন্তু লরেন্স কবিরূপেও যথেষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং এই শতাব্দীর কাব্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান বিশিষ্ট। বহিরঙ্গের দিক থেকে লরেন্সের কবিতাগুলিতে প্রচলিত রীতির অনুসরণ করা হয় নি। সাধারণত তিনি শিথিল ও দীর্ঘ মুক্তছন্দের পঙ্ক্তিতে কবিতা রচনা করেছেন। লরেন্স নিজেই তাঁর 'নিউ পোয়েম্স্'-এর মার্কিন সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন, কবিতাকে সাধারণভাবে বলা যায় 'না হয় সুদূর ভাবীকালের কণ্ঠস্বর, সুন্দর ও স্বর্গীয়, অথবা এটা অতীতের কণ্ঠস্বর, সমৃদ্ধ ও মহিমান্বিত।' প্রথম শ্রেণীর কবিতা স্কাইলার্ক পাখির গানের মতো—ভাবীকালের অভিমুখে ক্ষিপ্রধাবন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা নাইটিংগেল পাখির সংগীতের মতো—অতীতের মন্থর অনুধ্যান। লরেন্সের কবিতাকে এই দুটির কোনো শ্রেণীতেই ফেলা চলে না। শেলি ও কীট্সের বরণীয় গীতিকবিতাগুলি (লরেন্স মনে করেন) বিগতকালের বা অস্পষ্ট ভবিষ্যতের কয়েকটি মুহূর্তের চিরন্তন রূপ। কিন্তু অতীত বা ভবিষ্যতকে নিয়ে শেলি বা কীট্সের মতো কবিতায় রূপদানের আগ্রহ লরেন্সের ছিল না। তাঁদের মতো তিনি সামনে বা পিছনের দিকে চোখ মেলে থাকেন না। ওয়াল্ট হুইটম্যানের মতো প্রাণময় বর্তমানকে নিয়েই তিনি ব্যস্ত। লরেন্সের নিজের ভাষায়, 'The seething poetry of the incarnate Now is supreme'।

লরেন্সের প্রতিভার প্রবণতা কাব্যাভিমুখী। এটা তাঁর কবিতা থেকে তেমনই বোঝা যায় যেমন বোঝা যায় তাঁর উপন্যাস বা ছোটগল্পের গদ্যশৈলীর লাবণ্য থেকে। তাঁর প্রবন্ধ ও ভ্রমণ-কাহিনীতেও একটা কবিতার রস রয়েছে। কবি-রূপে তাঁর আরও বেশি প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত ছিল। রবার্ট ব্রাউনিঙের কথা মনে পড়ে। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই নাট্যধর্মী। নাট্যকাররূপে কিন্তু তিনি বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারেন নি।

লরেন্সের রচনার অধিকাংশই আত্মজীবনমূলক। তাঁর কবিতা সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। তাঁর কবিতা, বিশেষ করে প্রথম দিকের কবিতা, একান্তভাবে ব্যক্তিগত। তিনি বলেছেন, 'এগুলি এতই ব্যক্তিগত যে, অসংলগ্নভাবে এগুলি অনুভূতিময় অন্তর্জীবনের চরিতালেখ্য'। ওয়র্ডসোয়র্থের 'প্রেলিউড'-এর চেয়ে বেশি অন্তরঙ্গ-ভাবে, লরেন্সের কবিতা তাঁর কবিজীবনের বিকাশের ইতিবৃত্ত। মিল্ বলেছেন, সমস্ত কবিতাই স্বগতোক্তির মতো। লরেন্সের কবিতার সঙ্গে সামান্য পরিচয়েও আমাদের মনে হবে, তাঁর কবিতা অন্তত স্বগতোক্তির মতো। স্পর্শসচেতন মন ও

অসাধারণ কল্পনাশক্তির অধিকারী লরেন্স যেন তাঁর কবিতায় সবাক্ চিন্তায় মগ্ন। তাঁর অনুভূতির তীব্রতা তাঁর কবিতায় স্পষ্টভাবে উচ্চারিত। অবশ্য এ কথা সাধারণভাবে অধিকাংশ রোম্যান্টিক কবির কবিতা সম্বন্ধেই বলা চলে। লরেন্সের কবিতার এই রোম্যান্টিক লক্ষণ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রিচার্ড অ্যাল্‌ডিংটনের উক্তি মনে পড়ে—'He adventured into himself in order to write, and by writing discovered himself'।

লরেন্সের প্রথম দিকের কবিতায় আত্মজীবনমূলক অংশ অনেক বেশি। এগুলির অধিকাংশই তাঁর জননী কিংবা মিরিয়াম সম্পর্কে লেখা। মিরিয়াম লরেন্সকে ভালোবাসতেন, লরেন্সও কৈশোরে মিরিয়ামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তবে লরেন্স কোনো দিন মিরিয়ামকে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসতে পারেন নি। মিরিয়ামকে তিনি মানসী-রূপে যতটা পেতে চেয়েছেন নারী-রূপে ততটা নয়। আর নিজের মার সঙ্গে লরেন্সের সম্পর্কও যথেষ্ট জটিল। লরেন্স তখন ফ্রয়েড নিয়ে পড়াশুনা করছেন ; 'ঈডিপাস্ কম্‌প্লেক্স' তিনি নিজের জীবনেই আবিষ্কার করেন। 'সান্‌স্ অ্যাণ্ড লাভার্স' উপন্যাসের এটাই বিষয়বস্তু। মিরিয়ামকে নিয়ে কবিতাগুলির মধ্যে উল্লেখ্য 'লাস্ট ওয়র্ডস্ টু মিরিয়াম'—

Yours is the sullen sorrow,
The disgrace is also mine ;
Your love was intense and thorough,
Mine was the love of a growing flower
For the sunshine.

এই কবিতার বিষণ্ণতার সুর তাঁর মাকে নিয়ে লেখা 'পিয়ানো' কবিতাতেও পাওয়া যায়। অন্ধকারের মাঝে নারীকণ্ঠের সংগীত তাঁকে অনেক বছর পেরিয়ে তাঁর শৈশবে পৌঁছে দিয়েছে, যে-শৈশবে তিনি পিয়ানোর কাছে বসে বাজনা শুনতেন। শৈশবের মোহিনী মায়ায় তিনি জড়িয়ে গেলেন, স্মৃতির প্লাবনে তাঁর যৌবন গেল ভেসে, অতীতের জন্য তিনি শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন।

এই প্রথম দিকের কবিতাগুলি লরেন্সের জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত। মিরিয়াম এবং হেলেন প্রভৃতি অন্য মেয়েদের সঙ্গে লরেন্সের প্রণয়, মায়ের প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণ, মাতার মৃত্যু—এ সবকিছু আমরা এই কবিতাগুলি থেকে জানতে পারি। এই সব অভিজ্ঞতা কিন্তু তাঁর মনে অতৃপ্তি ও অশান্তিরই শুধু সৃষ্টি করে। স্মৃতিচারণার অর্থ হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগানো। তাই কবিতাগুলিতে তাঁর জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস খুঁজতে যাওয়া বৃথা। কোনো আদি-মধ্য-অন্ত-বিশিষ্ট অ্যারিস্টটেলীয় প্লট এখানে নেই।

'লাভ্ অন্ দ্য ফার্ম' গোড়ার দিকের কবিতা হলেও কাল্পনিক ও নাটকীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে (এই জাতীয় আরও কবিতা লরেন্স লিখেছিলেন)। এই

কবিতাটির নায়িকা শান্ত এবং ভীরু স্বভাবের, নায়ক কিন্তু দুর্দান্ত প্রকৃতির। খামারে তার আগমন যেন আশ্রমে মত্ত হস্তীর প্রবেশ। পাখি ভয়ে কম্পমান, খরগোশের অবধারিত মৃত্যু। এমন কি তার নির্দয় আলিঙ্গনে নায়িকাও শ্বাসরুদ্ধ—

> ......his lips meet mine, and a flood
> Of sweet fire sweeps across me, so I drown
> Against him, die, and find death good.

কবিতাটির আরম্ভ টেনিসনের কথা মনে করিয়ে দেয়, কবিতার শেষ কিন্তু ব্রাউনিঙের মতো।

লরেন্সের দ্বিতীয় পর্বের কবিতাও আত্মজীবনমূলক। এই কবিতাগুলির অধিকাংশ 'লুক্, উই হ্যাভ কাম থ্রু' নামে পরিচিত। ফ্রিয়েডা লরেন্সের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য জীবনের প্রথম দিকের অভিজ্ঞতা থেকে এগুলির জন্ম। লরেন্সের চেয়ে পাঁচ বছরের বড় ফ্রিয়েড়া ছিলেন লরেন্সের নটিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী ভাষার অধ্যাপক উইক্লি সাহেবের স্ত্রী। লরেন্স ফ্রিয়েডাকে নিয়ে পালিয়ে যান—

> You are the call and I am the answer,
> You are the wish, and I the fulfilment,
> You are the night, and I the day.

তাঁরা জার্মানী, ইটালি এবং ইংল্যাণ্ডে ঘুরে বেড়ান। জীবনের উষর ভূমিতে দাম্পত্য মরূদ্যানের একটু স্নিগ্ধতার জন্য লরেন্স ও ফ্রিয়েডাকে যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হয়, কারণ তাঁদের পরস্পরকে বুঝে নিতে বেশ সময় লাগে। এই পর্বের কবিতায় লরেন্স কি বলতে চেয়েছেন সেটা লরেন্সের নিজের উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি—'প্রেমের ব্যাপারে ও মানুষের কাছে অনেক সংগ্রাম ও ক্ষতির পর, নায়ক ইতিপূর্বে বিবাহিতা একটি নারীর ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়িয়ে নিল। তারা দুইজনে মিলে অন্য এক দেশে গেল এবং মেয়েটি বাধ্য হল তার শিশুদের ফেলে যেতে। পুরুষটি ও নারীটির মধ্যে, এবং তাদের ও চারপাশের জগতের মধ্যে, প্রেম ও ঘৃণার দ্বন্দ্ব চলল, যতক্ষণ না একটা মীমাংসা হয়।' এই অভিজ্ঞতা লরেন্সের চিঠিপত্রে এবং ফ্রিয়েডা লরেন্সের 'নট আই বাট দ্য উইণ্ড' গ্রন্থেও বিবৃত।

দ্বিতীয় পর্বের কবিতাগুলিকে 'অমিল কবিতা' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে; প্রথম পর্বের কবিতাগুলি 'সমিল কবিতা' রূপে বর্ণিত হয়। মিলহীন লরেন্সীয় 'মুক্তছন্দ' দ্বিতীয় পর্বের কবিতার বৈশিষ্ট্য। আরও একটি বিষয়ে এই কবিতাগুলি গোড়ার দিকের কবিতা থেকে স্বতন্ত্র; যে-অভিজ্ঞতা থেকে এগুলির জন্ম সে অভিজ্ঞতা আরও সংহত। কিন্তু পড়তে বেশি ভালো লাগে প্রথম পর্যায়ের কবিতা। নূতনত্ব থাকলেও কাব্যের জাদু 'মুক্ত ছন্দে' পাওয়া যায় না। অনেক সময় গদ্যের মতো মনে হয়, যেমন 'Manifesto' কবিতাটির এই স্তবকটি—

I thank mankind with passionate heart
that I just escaped the hunger for these,
that they were given when I needed them,
because I am the son of man.

অবশ্য সমিল ও প্রচলিত ধরনের কবিতা-যে দ্বিতীয় পর্যায়ে একেবারে নেই তা নয়। প্রথমেই বিখ্যাত কবিতা 'Giorno dei Morti' ('সমস্ত মৃতের সৎকার') মনে পড়বে। ইতালীয় একটি শবানুগামী দলের বাস্তব চিত্র এই কবিতায় ফুটে উঠেছে। বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে ছন্দের স্পন্দন—

And all along the path to the cemetery
The round dark heads of men crowd silently,
And black-scarved faces of womenfolk, wistfully
Watch at the banner of death, and the mystery.

'Birds, Beasts and Flowers' লরেন্সের কবিতার তৃতীয় পর্যায়ের সূচক। এই শ্রেণীর প্রায় সমস্ত কবিতাই ইতালিতে লেখা। লরেন্সের জীবন ও রচনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জীবজগৎ—অর্থাৎ নর-নারী, পশু ও গাছপালার সঙ্গে নিবিড় পরিচয়। তাঁর রচনায় অনেক সময় দেখা যায়, নর-নারীদের মধ্যে পশুসুলভ অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়না, আর জন্তুদের মধ্যে মানবিক বৃত্তি। লরেন্সের শিল্পীজীবনের এই মধ্যপর্বে প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগের দিকে তাঁর প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ওয়র্ডসোয়র্থের মতো প্রকৃতির মধ্যে তিনি কোনো মহাশক্তির মহিমা বিকশিত দেখেন নি। নিজের নৈতিক শক্তি জাগ্রত করার কোনো উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। প্রকৃতিকে তিনি প্রকৃতি-রূপেই দেখতে চেয়েছেন, গভীরতর বা মহত্তর কোনো রূপে নয়। মানুষ যখন কোনো প্রাণীর কিংবা বৃক্ষজগতের কোনো গোপন রহস্যের মুখোমুখি, লরেন্স সেই প্রতিক্রিয়াকে তাঁর কোনো কোনো কবিতার বিষয়বস্তু করেছেন। 'Snake' এই পর্যায়ের বিখ্যাত কবিতা।

'Pansies' লরেন্সের কবিতার পরের পর্যায়। এর আগের পর্যায়ের কবিতাতেই আমরা ছন্দের ব্যাপারে যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ করেছি, এবং এই উন্নতি ক্রমবর্ধমান ; এর পরিণতি লরেন্সের শেষের দিকের কবিতায়। 'প্যান্‌সিজ্' কবিতাগুলি লরেন্সের আমেরিকা থেকে ফেরার পরে লেখা। এগুলির ম. ৗ যে-ভাবধারা প্রবাহিত লরেন্স সেই দিকেই তাঁর সব মনোযোগ দিয়েছেন ; তাই নিছক কবিত্বের দিক থেকে এগুলি লরেন্সের অন্য কবিতার তুলনায় নিকৃষ্ট। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক লরেন্স এইসব কবিতায় তুলে ধরেছেন। কবিতাগুলি প্রধানত সমালোচনাত্মক। আধুনিক জীবনের তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন। যৌনতার গুরুত্বও প্রতিপাদিত করেছেন—

Sex isn't sin, ah no! sex isn't sin,
nor is it dirty, not until the dirty mind pokes in.

লরেন্সের ধারণা, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিই আমাদের জীবনে যত বিপর্যয়ের মূল। আমরা যদি আমাদের প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হই তা হলে কখনই আমাদের ক্ষতি হওয়া সম্ভব নয়। জানুয়ারি, ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন—
'My own great religion is a belief in the blood, the flesh, as being wiser than the intellect. We can go wrong in our minds. But what our blood feels and believes and says, is always true. The intellect is only a bit and bridle.'
লরেন্সের দেহবাদ 'প্যান্সিজ্' পর্যায়ের অনেক কবিতায় পাওয়া যায়।

লরেন্সের 'লাস্ট্ পোয়েম্স্' তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। যখন লরেন্স মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে আরম্ভ করেছেন তখন এই কবিতাগুলি লেখা। মৃত্যুর ছায়া কবিতাগুলিতে ঘনীভূত। 'And death is on the air like a smell of ashes.' তবে মৃত্যু-ভয়ে তিনি কাতর নন। মরণের যে-তরীর কথা তিনি 'The Ship of Death' কবিতায় লিখেছেন, সাহসে সে তরীর নির্মিতি। তিনি জানেন শীতের শুষ্ক, বিবর্ণ ফুল বসন্তের বর্ণোজ্জ্বল, সুরভিমদির পুষ্পে রূপান্তরিত হবে।

আধুনিক ইংরাজী কবিতা : এক অধ্যায়

১৯৫০-১৯৫৯, এই দশ বছরে যে-সব ইংরাজ কবি কবিতা লিখে প্রথম সুনাম অর্জন করলেন তাঁদের মধ্যে অনেককেই 'নিউ লাইন্‌স্‌' (১৯৫৬) ও 'ম্যাভেরিকস' (১৯৫৭) এই দুই কবিগোষ্ঠীতে ভাগ করা চলে। এই দুই কবিতা-সংকলনে আঠারজন বিশিষ্ট সমকালীন কবির কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'নিউ লাইন্‌স্‌' গ্রন্থের কবির সংখ্যা নয় জন—ফিলিপ লার্কিন, কিংসলি অ্যামিস, জন ওয়েন, টম গান, ইলিজাবেথ জেনিংস, ডি. জে. এনরাইট, জন হলোয়ে, ডোনালড ডেভি এবং গ্রন্থ-সম্পাদক রবার্ট কংকোয়েস্ট্‌। সম্পাদক তাঁর ভূমিকায় এই দশকের কবিতা সম্পর্কে বলেছেন—'এই কবিতা মনগড়া ধারণার সমষ্টি বা নির্জ্ঞাত নির্দেশের সমারোহের কোনো মহান্‌ রীতির প্রতি আস্থাশীল নয়। অতীন্দ্রিয় বা ন্যায়শাস্ত্রগত বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত, এবং আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের মতো, যা কিছু আসে সব কিছুর প্রতি এর দৃষ্টিভঙ্গী প্রযোজ্য। বাস্তব কোনো মানুষের বা ঘটনার প্রতি এই নিষ্ঠা যথার্থই আমাদের যুগের সাধারণ বুদ্ধিগত পরিবেষ্টনের অঙ্গ। অতিরঞ্জনের আশ্রয় না নিয়েও বলা যেতে পারে যে, আধুনিক কবিতার উপর জর্জ অর্‌ওয়েলের, আদর্শগত নয় বরং বাস্তবানুগ, সততা অন্যতম প্রধান প্রভাব বিস্তার করেছে, যদিও অপ্রত্যক্ষভাবে।··· আরও প্রয়োগের দিকে···আমরা দেখি যুক্তিগ্রাহ্য কাঠামো ও বোধগম্য ভাষা পরিত্যাগ করতে অস্বীকৃতি···। এটা এখনই প্রতীয়মান হবে যে, এই কবিরা যদি, যাঁরা কার্যতালিকা ও নিয়মাবলী নিয়ে সম্পূর্ণ বিশেষ একটা গোষ্ঠী এমন এক মতবাদ-ভারাক্রান্ত লেখক-সম্প্রদায় হতেন, তা হলে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যতটা সাদৃশ্য থাকত এঁদের মধ্যে ততটা নেই। যে-সাদৃশ্য তাঁদের মধ্যে যথার্থই রয়েছে সেটা সম্ভবত, সর্বনিম্ন অবস্থায়, যে-সব নীতি অশোভন তা এড়িয়ে চলার জন্য নেতিবাচক সংকল্পের চেয়ে সামান্য কিছু বেশি।'

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সম্পাদক এই যে-সব কথা বললেন এগুলি তো আজ মোটামুটি সর্বজনস্বীকৃত। সমকালীন কবির কাছে আমরা এর চেয়ে আর কি আশা করি? তা হলে রবার্ট কংকোয়েস্ট্‌ এত কথা বলতে গেলেন কেন? তাঁর ঘোষণা-পত্রকে উপযুক্ত পরিবেশে বিচার করা দরকার। ঘোষণা-পত্রটি একটি বিশেষ বিষয়ে সীমাবদ্ধ—আবেগের আতিশয্যের সব কিছু প্রকাশের বিরুদ্ধে ও 'কাব্যকে রূপকান্বিত (মেটাফরিক্যাল) হতেই হবে' এই হানিকর ধারণার বিরুদ্ধে এই প্রতিক্রিয়া। আগের দশকের 'রহস্য-উন্মোচক' (অ্যাপোক্যালিপ্‌টিক) রোম্যান্টিসিজ্‌মের সঙ্গে মৌলিক এই বিরোধ। যেহেতু ওই ধরনের অনেক রোম্যান্টিক কবিতাই নিকৃষ্ট, এর সবই নাকি (এমন কি ডিলান্‌ টমাসের কবিতাও) পরিত্যাগ করতে হবে। কাঠিন্য, শুষ্কতা, নিকৃষ্টতা, বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ প্রভৃতির অনুশীলনের প্রয়োজন।

অবশ্য এ সবই খুব একটা নতুন কিছু নয়। সমালোচক জেফ্রে মুর তাই লিখেছেন, যুদ্ধোত্তর যে-সব প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আমরা পরিচিত এগুলি তার মধ্যেই পড়ে। যদি এই কবিগোষ্ঠী নিজেদের মতবাদ সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট হতেন তা হলে এঁদের এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অঙ্গ বলে ধরে নেওয়া যেত। যেমন, মিল্‌টনের ব্যর্থ অনুকরণকারীদের যুগে 'মানুষের সত্যভাষা' কবিতায় ব্যবহার করার জন্য ওয়র্ডসোয়র্থের যে-আহ্বান বা টেনিসনের গতায়ু প্রভাবের যুগে এজ্‌রা পাউণ্ডের দৃঢ়-সম্বন্ধ ও সুস্পষ্ট শব্দ-সম্ভারের জন্য আবেদন ও ভাবপ্রবণতার অতি-রেকের এবং 'কবিয়ানা' করার বিরুদ্ধে অভিযান। এই সব আন্দোলনের নেতারা সাধারণ মানুষ ছিলেন না, আর তাঁরা ছিলেন নতুনের প্রবর্তক। 'নিউ লাইন্‌স্' কবিদের কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতার অভাব ; কোনো প্রকারেই তাঁরা নিজেদের মনোভাব দৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করতে আগ্রহশীল নন।

'নিউ লাইন্‌স্'-এর ঘোষণাপত্রের বিরোধিতা হবেই এটা আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু সেই বিরোধিতা যদি 'ম্যাভেরিক্‌স্'দের রূপ নিয়ে না আসত তা হলে বোধহয় ভালো হত। 'ম্যাভেরিক্‌স্'-এর সম্পাদকদ্বয় (ড্যানি এ্যাবস্ ও হাওয়ার্ড সার্জেন্ট) তাঁদের গোষ্ঠীর অভিযান ঘোষণা করলেন—'এক ভয়াবহ সংগ্রাম··· কবিতা ও কবির মধ্যে, নামহীন, রূপহীন, উন্মাদক (ডায়োনিসিয়ান) উপাদান ও সচেতন, সভ্য, উচ্চারক শিল্পীর মধ্যে।' তাঁরা প্রকারান্তরে বলতে চাইলেন, 'নিউ লাইন্‌স্' কবিদের কোনো দিন 'ডায়োনিসিয়ান'-এর সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় নি। তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাই উপহাসের পাত্র। অবশ্য এই বিরোধে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের কাছে এর মূল্য থাকলেও সাধারণ পাঠক, যার কাছে কবিতার রসাস্বাদনই বড় কথা, একে বাগাড়ম্বর ছাড়া বিশেষ কিছু ভাবে নি। 'ম্যাভেরিক্‌স্' (এর অনুবাদ করা যেতে পারে 'বল্‌গাহারার দল')-এর লেখকদের মধ্যে রয়েছেন ডেভিড রাইট, জে· সি· হল, মাইকেল হ্যামবার্গার, জন স্মিথ, জন সিলকিন, অ্যান্টনি ক্রোনিন, ভার্নন স্ক্যানেল, ডবলু· প্রাইস টার্নার এবং ড্যানি অ্যাবস্। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ (জে· সি· হল, টমাস ব্ল্যাকবার্ন) পৌরাণিক কাহিনীর ব্যবহার বা সৃষ্টি করেছেন ; কিন্তু এঁরা সকলেই আত্মকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিগত গীতিকবিতা রচনা করেছেন। এগুলি অধিকাংশই পাকা হাতের লেখা। তবে এ কবিরা কামানের চেয়ে তীর-ধনুকের ব্যবহারই বেশি পছন্দ করেন। তাঁদের ধারণা, এ যুগ গর্জনের নয়, অনুনাসিকের। যাই হোক, সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত বাড়াবাড়ি বিস্ময়জনক। গার্টরুড্ স্টাইনের ভাষায়, 'সবই এক এবং সবই পৃথক্'। পার্থক্য এইখানে যে, 'ম্যাভেরিক্‌স্'-এর কবিদের চেয়ে 'নিউ লাইন্‌স্'-এর কবিরা আমাদের কৌতূহল বেশি জাগ্রত করেন। শক্তিমত্তা ও অনুভূতির দিক থেকে ফিলিপ্ লার্‌কিন্, টম্ গান্ এবং ইলিজাবেথ জেনিংসের যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ডি· জে· এন্‌রাইটের লেখা যেমন ভাবগম্ভীর তেমনই প্রাণবন্ত। জন্ হল্‌ওয়ে এবং ডোনাল্‌ড্

ডেভির মধ্যে এম্প্‌সনের প্রভাব কিছুটা লক্ষণীয় মনে হয়। কিংস্‌লি অ্যামিস্‌ ও জন্‌ ওয়েনের কবিতা জন্‌ অস্‌বোর্নের নাটকের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁরা রসজ্ঞ তার্কিক, এবং আড়ম্বর ও প্রচলিত রীতিনীতিকে শ্লেষের শেলে বিদ্ধ করে পাঠকদের তীব্র ও অশ্রদ্ধ উপভোগের যোগান দিতে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু পাঠকদের এ অস্বস্তিকর অনুভূতিও হয় যে, এই অতিরঞ্জন-আশ্রিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকে এক স্থানে এসে থামতেই হবে। সেটা যখন হবে তখনই 'আন্দোলন' ('দ্য মুভ্‌মেন্ট')-এর সার্থকতা।

'নিউ লাইন্‌স্‌'-এর নয়জন কবির মধ্যে ছয়জন তখন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, দুইজন গ্রন্থাগারিক ও একজন পদস্থ রাজকর্মচারী। এঁদের কবিতায় তাই কেতাবী-ভাব রয়ে গেছে। দফতরের গন্ধ লেগে রয়েছে। এই কবিতাকে শিষ্ট, শিক্ষিত, দক্ষ ও মার্জিত বলা যেতে পারে, আর বুদ্ধিদীপ্তও বটে। আদিম ও অসংযত আবেগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এই কবিতার উৎস। এর লেখকদের, বিশেষ করে অ্যামিস্‌, ওয়েন্‌ ও লার্‌কিন্‌কে, কিছুটা পরিহাসবিজল্পিত, 'দ্য মুভ্‌মেন্ট' নাম দেওয়া হয়েছে। অ্যামিস্‌ ও ওয়েন্‌ ঔপন্যাসিক সমালোচক-রূপেই সমধিক পরিচিত। গ্রন্থাগারিক লার্‌কিনই এঁদের মধ্যে প্রকৃত কবি। এঁরা সকলেই অক্‌স্‌ফোর্ডের একই কলেজের ছাত্র। আর একটা কথা, এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈশিষ্ট্য বিচার করার সময় মনে রাখতে হবে—এঁরা সকলেই মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। কাব্যের দিক থেকে, এঁরা রোম্যাণ্টিসিজ্‌মের ও সহজ বুদ্ধির বিরোধী। এঁরা বড় বড় দার্শনিক মতবাদ ও চিন্তাধারায় বিশ্বাস করেন না, নিজেরা যেটা ব্যক্তিগতভাবে জানেন ও অনুভব করেন (সেটা প্রচলিত ধ্যান-ধারণার যত বিপরীতই হোক না কেন) তাই প্রকাশ করেন এবং ফলে যে-পাঠকেরা কাব্যানন্দকে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর মনে করেন তাঁদের উষ্মার কারণ হন। অবশ্য যাঁদের কাব্যের ধর্ম সম্পর্কে ধারণা বাস্তবানুগত্য, তাঁদেরও এই কবিরা সব সময় সন্তুষ্ট করতে পারছেন না। তার কারণ এঁদের আবেগের প্রতি ও আদর্শের প্রতি বিতৃষ্ণা সত্যকারের আদর্শ ও ভাবাবেগ সৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমকালীন কবিদের মধ্যে ফিলিপ লার্‌কিনের কবিখ্যাতি সর্বাধিক। তির্যক বিদ্রূপের সুর তাঁর কবিতায় শোনা যায়। তিনি বাস্তবে বিশ্বাস করেন ও ভাবাবেগ পছন্দ করেন না। চড়া সুরের কবিতায় তাঁর আস্থা নেই ও মাঝে মাঝে তাঁর কবিতায় কিছু গদ্যময়তা এসে পড়ে। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তিও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। 'চার্চ গোয়িং' কবিতায় গির্জার অভ্যন্তরের অন্তরঙ্গ বর্ণনা রয়েছে—

> **...matting, seats and stone,**
> **And little books ; sprawlings of flowers, cut**
> **For Sunday, brownish now,...**

এর পরে তিনি বলেছেন—

Hatless, I take off
My cycle-clips in awkward reverence.

যুদ্ধোত্তর কল্যাণ-রাষ্ট্রের ব্রিটিশ নাগরিকের ছবি এখানে ফুটে উঠেছে। বেশভূষার প্রতি তার লক্ষ নেই, বিত্তবান নয়; গাড়ি নেই, সাইকেল আছে; শ্রীহীন, রুক্ষ, অথচ অজ্ঞাবাদী ভক্তির অভাব নেই; খাদ্যের অপ্রাচুর্য, উপার্জনের অপ্রাচুর্য অথচ গুরু করভার; আশা নেই, বৈচিত্র্য নেই, ঋজুতা নেই। লার্কিন যেন দেখাতে চান, কবি কোনো দ্বিতীয় ভুবনে বাস করেন না, কল্পনাবিলাস তাঁর বৃত্তি নয়। তিনি আমাদের প্রতিবেশীর মতো—এমনি কি, হয়তো প্রতিবেশীই। 'তৃণভূমিতে' কবিতায় দুটি ঘোড়ার বর্ণনা আছে। তাদের গৌরবের দিন আজ গত হয়েছে; ঘোড়দৌড়ের বাজীর মোহিনী-মায়া আজ নিঃশেষে অবলুপ্ত। পনের বছর আগের সে উত্তেজনা, সে রোমাঞ্চ, সে কোলাহল আজ স্তব্ধ। স্মৃতিও কি, মাছির মতো, তাদের কানে জ্বালাতন করে? আজ তারা নামহীন, গোত্রহীন, ছায়াময় প্রান্তরে বিলীন। **'I remember, I remember'** কবিতায় স্মৃতিচারণের সরস ভঙ্গীর মধ্যে হয়তো সূক্ষ্ম কোনো বেদনা প্রচ্ছন্ন আছে আর সেটাই কবিতাটিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। অন্যান্য কবিদের প্যারডি নামকরণ থেকেই শুরু।

আন্দোলক তিন জন কবির মধ্যে কিংসলি অ্যামিসের কবিতা সবচেয়ে চিত্তগ্রাহী। বিচক্ষণতা সকলেরই রয়েছে, কিন্তু কৌতুকবোধ অ্যামিসের সর্বাধিক। তিনি আমাদের মিত্র-ভাবাপন্ন প্রতিবেশী। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলে তবে আমরা বুঝতে পারি কত ক্ষুরধার তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। 'বইয়ের দোকানে জঘন্য কিছু' তিনি খুঁজে পেয়েছেন। উদ্যান-শিল্পের ও রন্ধন-শিল্পের মাঝখানে কাব্যগ্রন্থের ছোট তাক। 'তোমাকে মনে পড়ে', 'ভালোবাসা আমার ধর্ম', এই ধরনের কবিতার বই মেয়েদের ভাগে। সেই প্রসঙ্গে অ্যামিসের কটাক্ষ বায়রনের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তির ব্যবহার করে—

Should poets bicycle-pump the human heart
Or squash it flat ?
Man's love is of man's life a thing apart ;
Girls aren't like that.

'বেওউল্‌ফ্' কবিতায় আমরা অ্যামিসের কাব্যকৌশলের পরিচয় পাই—ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের জ্ঞান তিনি হাস্যরস সৃষ্টির কাজে লাগিয়েছেন। 'সুন্দরী নারীদের স্বপ্ন' অ্যামিসের পূর্ববর্তী অনেক ইংরাজ কবি দেখেছেন। কিন্তু তারা যেভাবে আধুনিক কবির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তাদের 'দেহের অটোগ্রাফ খাতায় স্বাক্ষর' করানোর জন্য, তা দেখলে অ্যাডোনিস্-প্রেমে পাগল শেক্স্‌পিয়রের নায়িকা ভীনাস্‌ও লজ্জা পাবে। তাদের সকলেই বলছে, 'আমায় আগে, কিংসলি; আমি

চাতুরীতে সবার সেরা।' অবশ্য এই কবিতায় লেখককে **'Spry Juan, lifter of the lifted skirt'** ('ডার্টি স্টোরি')-এর অন্য সংস্করণরূপে পাচ্ছি না, এই রক্ষা। এই সব উদাহরণ থেকে যদি মনে করা হয় অ্যামিসের নৈপুণ্য শুধু হাল্‌কা সুরের কবিতায়, কিংবা আদিরসের সঙ্গে হাস্যরস বা উদ্ভট-রসের মিশ্রণে, তা হলে ভুল করা হবে। যদি ইচ্ছা করেন তা হলে অলঘু বিষয়ে তিনি গাম্ভীর্য নিয়ে লিখতে পারেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'মাস্টার্‌স্‌' কবিতাটি। কবিতাটির আরম্ভ এই রকম :

> যে-ঘোড়ার আরোহী উল্লম্ফনে ভয় পায় তার পতন হবে,
> বন্দুকধারী লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে যদি আদেশে অনিশ্চয়তা ঝরে ;
> তারাই শুধু নিরাপদ রবে যারা নিজেদের নিরাপদ মনে করে ;
> কণ্ঠস্বর যারা হারিয়ে ফেলে তারা সবই হারাবে···

কিংস্‌লি অ্যামিসের কবিতার সঙ্গে জন্‌ ওয়েনের কবিতার অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। তবে জন ওয়েনের প্রগল্‌ভতার দিকে প্রবণতা বেশি, অ্যামিসের ঝোঁক পরিহাসের দিকে। ওয়েনের 'মিক্সড্‌ ফীলিংস' (১৯৫৩) কাব্যগ্রন্থের তুলনায় 'এ ওয়র্ড কার্ভ্‌ড্‌ অন এ সীল্‌' (১৯৫৬)-এ রচনাশৈলী অনেক সংযত, শব্দসম্ভার সুনির্বাচিত। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম হচ্ছে 'দ্য ব্যাড থিংগ'—

> কখনও কখনও শুধু একা থাকা খারাপ জিনিস মনে হয়।
> নিঃসঙ্গতা ফুলে-ফেঁপে সূর্যকে পর্যন্ত ঢেকে ফেলতে পারে।
> এর বেদনা এত বেশী যে ভয়ও, অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে
> দুশ্চিন্তাও, চাপা পড়ে যায়। এরই আজ হল জয়,
> তুমি ভাবো,—এইটাই খারাপ জিনিস, এখানে যা নিকটেই আছে।
> পরে বোধ জাগে ; তুমি নিদ্রা তরে শয্যা নাও, কিংবা
> কিছু খাও, চিঠি লেখো কোনো বা কিছু কাজ করো, বা পরিষ্করণ।
> নিঃসঙ্গতা সঙ্কুচিত হয় ; তুমি তার পুরাপুরি ক্রীতদাস নও।
>
> তখন তুমি ভাবো : খারাপ জিনিসটার বাস নিজের মাঝেই।
> শুধু একা থাকা কিছু নয় ; প্রদাহ নয়, প্রলেপ নয়।
> পরিত্রাণ, কবিতার মাঝে কিংবা মদিরাশালায়,
> বন্ধুর প্রতীক্ষা, খারাপ জিনিসটা তাতে এড়ান যায় না।
> যে উঁচু তাকে রেখেছিলে সেটা প্রশান্তির আশা নিয়ে,
> ভেঙে গেছে। গড়িয়ে পড়েছে ওটা। শেষ অবধি তোমার পিছু নেবে।

'মূল-ক্রিয়াপদ-হীন কবিতা'র খামখেয়ালী ভাবের মধ্যে বা 'দুর্বোধ্যতার অষ্টম রূপ' (সমালোচক এম্‌প্‌সন্‌ সাতটি রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন) কবিতার চাতুরীর মধ্যে আমরা ওয়েনের অন্য রূপের পরিচয় পাই। প্রেমের কবিতাও

তিনি লিখেছেন ; উদাহরণ-স্বরূপ 'সর্বোপরি মূল্যবান্ এবং উল্লেখ্য' কবিতাটির নাম করা যেতে পারে :

> And why should this chain of miracles be easier to believe
> Than that my darling should come to me as naturally
> As she trusts a restaurant not to poison her ?

ডি· জে· এন্‌রাইটের 'দ্য লাফিং হায়েনা' (১৯৫৩) কাব্যগ্রন্থে আমরা কবির বিদেশ-বাস-সঞ্জাত অভিজ্ঞতার পরিচয় পাই। হোকুসাই-অঙ্কিত হায়েনার হাসি তাঁর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—

> I find it an honest visitant, even consoling, after all
> Those sententious phantoms, choked with rage and uncertainty,
> Who grimace from contemporary pages. It, at least,
> Knows exactly why it laughs.

শব্দচিত্রাঙ্কনে এন্‌রাইটের নিজের দক্ষতা অনস্বীকার্য। 'মিশরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা' শীর্ষক কবিতায় তিনি সুন্দরভাবে বাস্তবের ছবি তুলে ধরেছেন—

> উত্তেজনায় ও ধোঁয়ায় বাতাস ভারাক্রান্ত :
> ঘামে ভেজা হাতে কলম কাঁপছে :
> ঘরোয়া পুলিশ ত্রস্তপদে যায় আসে, স্মেলিং সল্ট্ আর অ্যাস্‌পিরিন্ হাতে,
> আর পরিচারকেরা, গম্ভীর মুখে কিন্তু বিবর্ণরূপে,
> থামে ঘেরা স্থানটিতে পায়চারি করে,
> কফি সিগারেট আর কোকা-কোলা নিয়ে।

'ব্রেড রাদার দ্যান ব্লসম্‌স্' (১৯৫৬) এন্‌রাইট্ যখন জাপানে ছিলেন তখন লেখা হয়। অসাধারণ সাধারণ-বুদ্ধি ও রসানুভূতি নিয়ে প্রতীচীর এক যুবক প্রাচ্যকে বোঝার যে-প্রচেষ্টা করেছেন তাই ফুটে উঠেছে এই কাব্যে।

ইলিজাবেথ্ জেনিংসের কবিতা পরিহাস-চপল লঘুপদে চলে না। গভীর বিষয়ে গভীর কবিতা লেখা তাঁর বৈশিষ্ট্য। এই গভীরতার মধ্যে জটিলতা নেই, লালিত্য আছে। তাই অনেকের মতে তিনিই পঞ্চাশের দশকের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কবিতা একাধিকবার বিভিন্ন সাহিত্য-পুরস্কার লাভ করেছে। যে-সব ধ্যান-ধারণা নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন সেগুলি একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব হলেও তাঁর প্রকাশভঙ্গীর প্রসাদগুণে সেগুলি তাঁর পাঠকবর্গের অন্তর স্পর্শ করে। অনবদ্য সূক্ষ্মতা ও সংবেদনশীলতা তাঁর কবিতাকে এক বিশেষ সৌকুমার্য দান করেছে। ডান্-এর কবিতার সঙ্গে তাঁর কবিতার সাযুজ্য রয়েছে।

'শরৎ-শুরুর গান' কবিতায় নিসর্গের সুন্দর ও প্রাণবন্ত বর্ণনা রয়েছে। গ্রীষ্মের শেষ ও শরতের শুরু মিলে মিলন-গোধূলি রচিত হয়েছে।

এখন দেখো শরতের এই লুকিয়ে আসা
সুরভিতে। ভাবো গ্রীষ্ম বুঝি রয়েই গেল,
রঙের কোথাও কিছু বদল নেই, বাতাস
শান্ত ধারায় সবুজে সাদায় বাঁধে বাসা।
তরুরাজি নম্র আজি বিকাশের ভারে আর
পূর্ণতা প্রান্তরে। সব দিক ফুলে ভরা।

'অ্যাবসেন্স' কবিতায় বিচ্ছেদবেদনা এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করেছে। কবি আবার সে স্থানে এসেছেন যেখানে তাঁর শেষবার প্রিয়সমাগম। কিছুই বদলায় নি, বাগান সযত্নে চর্চিত, ফোয়ারার জল অবিরাম ঝরে চলেছে, কিছু শেষ হয়ে গেছে সে চিহ্ন কোথাও নেই, আর কবিকে ভুলে যাওয়া শেখাবারও কিছু নেই। গাছের থেকে যে-সব নিশ্চিন্ত পাখি বেরিয়ে আসছে কণ্ঠে গীতোচ্ছ্বাস নিয়ে যাতে কবি অংশ গ্রহণ করতে পারছেন না, তারা কবির চিন্তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। এই সমস্ত আনন্দে নিশ্চয়ই কোনো দুঃখ সহ্য করার মতো কিছু থাকতে পারে না কিংবা কোনো বেসুর, স্থিরগতি সমীরণের যা বেপথু এনে দিতে পারে। স্থানটি ঠিক আগের মতো আছে বলেই প্রিয়বিচ্ছেদ কবির কাছে কোনো আদিম, প্রচণ্ড শক্তির মতো মনে হয়েছে, কারণ সব কিছু শান্ত রূপের নীচে ভূমিকম্পের স্পন্দন এসেছে : প্রিয়-নাম স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে ফোয়ারা, পাখি, তৃণ কেঁপে উঠেছে।

ইলিজাবেথ জেনিংস রোমান ক্যাথলিক; তাঁর কবিতায় অপার্থিব ও আধ্যাত্মিক সুর অনেকবার শোনা যায়। মাঝে মধ্যে ধর্মীয় আচার ও রীতির সঙ্গে শিল্পিমনের যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধি মেলানো কঠিন হয়েছে; কবি তাঁর সমালোচকের দৃষ্টি ডুবিয়ে দিতে চেয়েছেন প্রথার গভীর গহনে—

Waiting restlessly the coming event,
Hearing the three bells ringing the loud warning,
I look for the lifted moment, the lifted cup,
Feeling upon my skin the Roman morning.
I watch with a critical eye the bread raised up
And confuse aesthetics now with a sacrament.

('At a Mass')

কবিতাটির শেষ দুইটি ছত্র অপূর্ব—

I have to endure the ecstatic pain of art
And shape from the silence all my encroaching songs.

টম্ গানের কবিতায় নিছক বুদ্ধিবৃত্তির স্থান নিম্নতর। যদিও ছন্দের দিক

থেকে তিনি নূতনত্ব দেখাবার চেষ্টা করেন নি, উগ্রতায় তিনি সবার উপরে। রূপকের প্রয়োগও তাঁর কবিতায় অপেক্ষাকৃত কম। সাধারণ-বুদ্ধিই তাঁর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। তাই তাঁকে রোমান্টিক আখ্যা দেওয়া সমীচীন নয়। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'ফাইটিং টার্‌ম্‌স্' গ্রন্থে তাঁর অগাধ পড়াশুনার পরিচয় পাওয় যায়। 'আ সেন্স অব মুভমেন্ট' গ্রন্থে প্রতিভার স্বাক্ষর উজ্জ্বলতর। তরুণ মার্কিন কবিদের কবিতার সঙ্গে তাঁর কবিতার সাদৃশ্য চোখে পড়ে। পূর্বসূরীদের প্রতি আধুনিক কবিদের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় 'লাইন্‌স্ ফর অ্যা বুক' কবিতার প্রারম্ভে :

> I think of all the toughs through history
> And thank heaven they lived, continually.
> I praise the overdogs from Alexander
> To those who would not play with Stephen Spender.

'কারনাল নলেজ' কবিতায় প্রতি স্তবকের শেষ পঙ্‌ক্তিতে শুধু 'ইউ নো' 'আই নো'র পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে—'You know I know you know I know you know'। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত কবিতার মধ্যে রয়েছে—'Lofty in the Palais de Danse', 'A Mirror for Poets', 'Jesus and his Mother', 'Elvis Presley' এবং 'On the Move' (শেষোক্ত কবিতাটির দ্বিতীয় অভিধা—'Man, you gotta Go' ও শেষ ছত্রটি এইরূপ—'One is always nearer by not keeping still.')

ডোনাল্‌ড্ ডেভির কাব্যগ্রন্থ 'ব্রাইড্‌স অফ রীজ্‌ন্' প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে। এঁদের কবিতায় বুদ্ধিবৃত্তির স্থান তুলনায় অনেক বেশি, যদিও হলোয়ের কবিতার বৈদগ্ধ্য কখনও পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে নি। ডোনাল্‌ড্ ডেভির কবিতায়ও গীতিকাব্যের লালিত্য শোনা যায়—

> Time passing, and the memories of love
> Coming back to me, carissima, no more mockingly
> Than ever before ; time passing, unslackening,
> Unhastening, steadily ; and no more
> Bitterly, beloved, the memories of love
> Coming into the shore.

আধুনিক ইংরাজী কবিতার এই বিশেষ অধ্যায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম ফিলিপ লার্‌কিনের (জন্ম ১৯২২)। উৎসাহ-উদ্দীপনার সুর তাঁর কবিতায় সহজলভ্য নয়, বরং কেমন যেন একটা ভীরুতার ভাব আছে। তবু সৌন্দর্যকে

তিনি অস্বীকার করেন নি, আদর্শকে বিসর্জন দেন নি। তাঁর প্রিয় কবি জন্ বেট্‌জিমান (জন্ম ১৯০৬)-এর মতো কখনো কখনো অবশ্য তাঁকে লঘু ও চপল মনে হতে পারে। টেড্ হিউজ (জন্ম ১৯৩০)-এর কবিতায় বাঁচবার যে-উদগ্র প্রবণতা ঝঙ্কৃত তা আমরা লার্‌কিনের লেখায় পাই না কিন্তু শিল্পকর্মে তিনি নিপুণতর। বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী কবিতার নতুন সংকলনের সম্পাদনার ভার তাঁকে অর্পণ করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ভুল করেন নি।

প্যাট্রিক হোয়াইট

সাহিত্যিকরূপে প্যাট্রিক হোয়াইট-এর মহত্ত্ব, প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা সংশয়াতীত। উপন্যাস-জগতে তিনি এক নতুন মহাদেশের সন্ধান দিয়েছেন এবং মানবজীবনের অস্তিত্বের নতুন অর্থ আবিষ্কার করেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র জঁা-পোল সার্ত্র-এর মানুষের মতো 'নিরীশ্বর জগতের পরিত্যক্ত প্রাণী' নয়, কিংবা তিনি আল্‌বের্তো মোরাভিয়ার মতো মানবজীবনের অস্তিত্বের পক্ষে বাস্তবতার অসম্পূর্ণ বা নিরর্থক ভূমিকা সম্পর্কে অকারণে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন নি। মানসলোকের মহান্ অভিযাত্রী প্যাট্রিক হোয়াইট। মানুষের মনের গহন-গভীরে তিনি বিচরণ করেছেন, পরিচিত জনপদ পরিক্রমা করেন নি। শুধু জৈবিক সুখের অন্বেষণ মানবাত্মার চরম লক্ষ্য, এ কথা হোয়াইট মেনে নিতে পারেন নি। সেই কারণেই তিনি গ্রীক পুরাণের যে-রূপকে মানবাত্মাকে প্রজাপতির পাখা-লাগানো সুন্দরী কিশোরী-কন্যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে সে-রূপকের প্রচলিত ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করতে পারেন না। মানুষের একান্ত নিঃসঙ্গতা এবং অনিবার্য যন্ত্রণাভোগ হোয়াইটকে বিশেষভাবে বিচলিত করেছে। তাই মানুষের প্রতি রয়েছে তাঁর সহানুভূতি—বিদ্বেষ নয়।

মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণাকে প্যাট্রিক হোয়াইট কখনো ছোট করে দেখেন না, বরং তিনি মনে করেন যে, এই অনিবার্য যন্ত্রণা-ভোগের মধ্য দিয়ে মানুষ যে-অভিজ্ঞতা লাভ করে তা মহামূল্য। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'হ্যাপি ভ্যালি'তে তিনি যে-বাণী বা 'এপিগ্রাফ' লিপিবদ্ধ করেছেন সেটি হচ্ছে এই—'অগ্রগতির পরিমাপ করতে হবে যন্ত্রণা-ভোগের পরিমাণ দিয়ে'। হোয়াইটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দ্য ট্রী অফ্ ম্যান'-এর নায়ক স্ট্যান পার্কারকে আমরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করতে পারি, যেভাবে আমরা শেক্‌স্‌পিয়রের হ্যামলেট বা ডস্টয়েভস্কির র‍্যাসকলনিকভকে গ্রহণ করি। আধুনিক ইংরাজ কবির মতো স্ট্যান পার্কারেরও বিশ্বাস, তার কর্তব্য হচ্ছে ছিনিয়ে নেওয়া—'হতাশার মধ্য থেকে জীবিকা আর ইস্পাতের মধ্য থেকে গান।' প্যাট্রিক হোয়াইট মনে করেন, এটা প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য, শুধু স্ট্যান পার্কারের নয়। লেখকরূপে উপন্যাস-সাহিত্যে হোয়াইট-এর যে-দান তার প্রকৃত তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর জীবনদর্শনের মধ্যে।

তাঁর অস্ট্রেলীয় পিতামাতার ইংল্যাণ্ডে প্রবাস-কালে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে মে লণ্ডন শহরে প্যাট্রিক ভিক্টর মার্টিন্‌ডেল্ হোয়াইট-এর জন্ম হয়। শৈশবেই তাঁকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। তেরো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সিডনি শহরে শিক্ষালাভ করেন। এর পর তিনি আবার ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন এবং চেল্‌ট্‌নাম কলেজে শিক্ষার্থীরূপে যোগ দেন। স্কুলের শিক্ষা শেষ হলে তিনি অস্ট্রেলিয়ায়

ফিরে যান এবং দুই বছর স্থানীয় নানা মেষপালন-ক্ষেত্রে কাজ করেন। এই সময়েই তিনি প্রথম উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। কিছু দিন পরে হোয়াইট আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান এবং কেম্‌ব্রিজের কিংস কলেজে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করেন। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রায় চোদ্দ বছর তিনি বিদেশে কাটান এবং ইওরোপ ও আমেরিকার নানা রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে তিনি সমর বাহিনীতে যোগ দেন এবং ইংল্যাণ্ডের রাজকীয় বিমান বহরের গ্রীসে এবং মধ্যপ্রাচ্যে অভিযানের সময় তিনি বিমান বাহিনীর গোয়েন্দা-সংস্থায় অফিসার হিসাবে পাঁচ বছর কাজ করেন। ইতিমধ্যে তাঁর প্রথম দুখানি উপন্যাস—'হ্যাপি ভ্যালি' (১৯৩৯) এবং 'দ্য লিভিং অ্যাণ্ড দ্য ডেড' (১৯৪১)—প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে হোয়াইট ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান এবং সিডনি থেকে পঁচিশ মাইল দূরবর্তী স্থানে একটি খামার কিনে সেখানেই বসবাস শুরু করেন। এখানে তিনি ফুল ও শাক-সবৃজীর চাষ আরম্ভ করেন এবং কুকুর ও ছাগল পালন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এই সময় কিছু দিন তিনি কোনো লেখাই লেখেন নি। তার পরেই এল বিপুল খ্যাতি। লর্ড বায়রনের মতো হঠাৎ একদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেলে হোয়াইট দেখলেন তিনি বিখ্যাত হয়ে গেছেন। 'দ্য ট্রী অফ্ ম্যান' (মার্কিন সংস্করণ ১৯৫৫, ব্রিটিশ সংস্করণ ১৯৫৬) তাঁকে এনে দিল আন্তর্জাতিক খ্যাতি। ইতিপূর্বে তাঁর 'দি আণ্ট্‌স্ স্টোরি' (১৯৪৮) ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। (তাঁর প্রথম দুটি উপন্যাসও ইংল্যাণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়।) এর পরে এক এক করে প্রকাশিত হতে থাকে পরবর্তী উপন্যাসগুলি, যেগুলি তাঁর খ্যাতিকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছে। এইগুলি হল 'ভস্' (১৯৫৭), 'রাইডার্স ইন্ দ্য চ্যারিঅট' (১৯৬১), 'দ্য সলিড ম্যাণ্ডালা (মণ্ডল)' (১৯৬৬), 'দ্য ভিভিসেক্টর' (১৯৭০) এবং 'দি আই অফ দ্য স্টর্ম'।

সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও হোয়াইট নিজের দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রথম যৌবনে প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'দ্য প্লাউম্যান অ্যাণ্ড আদার পোয়েম্‌স্' (১৯৩৫)। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের সময় তাঁর মনে যে-সমস্ত ভাব-ধারার সঞ্চার হয় সেইগুলির প্রকাশ এই কবিতাগুচ্ছে। প্রতিটি কবিতার নিচে দেশের নামের উল্লেখ আছে। নাট্যকার প্যাট্রিক হোয়াইটের পরিচয় পাওয়া যায় 'দ্য হ্যাম্ ফিউনর‍্যাল্' (১৯৬০), 'সীজন্ অ্যাট সার্স্যাপ্যারিল্যা' (১৯৬২) এবং 'নাইট অন বাল্ড মাউনটেন' (১৯৬৪) ইত্যাদি নাটকে। এই নাটকগুলি অ্যাডালেড বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যসংস্থা-কর্তৃক অভিনীত হয়। কমেডিতে-যে হোয়াইট সিদ্ধহস্ত তার প্রমাণ তাঁর নাটকগুলিতে পাওয়া যায়। একদিকে তিনি যেমন রৌদ্ররসের অবতারণা করতে পারেন অন্যদিকে আবার উৎকট আদিরসেরও অভাব নেই। তবে সব কিছুই গভীর নাট্যরসে সমৃদ্ধ, যেটা জীবনযন্ত্রণা ও ভাবাবেগের সংমিশ্রণ

ঘটিয়েছে। এগারোটি ছোটগল্পের সংকলনের নাম 'দ্য বার্ন্ট-আউট ওআন্স্'। (আমার মনে হয় নামকরণের সময় হোয়াইট গ্রেআম্ গ্রীনের উপন্যাস 'অ্যা বার্ন্ট-আউট্ কেস্'-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। গ্রীনের উপন্যাসটি হোয়াইটের গল্প-সংকলনের তিন বছর আগে প্রকাশিত হয় এবং যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে।) হোয়াইট-এর ছোটগল্পগুলির মধ্যে 'দ্য লেটার্স' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে 'কোয়াড্র্যান্ট্' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী উর্সুলা পল্‌কিংহন্ ও তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়স্ক পুত্র চার্ল্‌স্-এর এই কাহিনী যথেষ্ট মৌলিকতার দাবি রাখে।

প্যাট্রিক হোয়াইট বর্তমানে সিডনি শহরে বাস করেন এবং সেখানেই কাজ-কর্ম করেন। তাঁর শখের মধ্যে রয়েছে রান্না করা, বাগান করা, কুকুর পোষা ও গান শোনা। তাঁর ব্যবহারে খানিকটা গাম্ভীর্য থাকলেও আসলে তিনি অমায়িক, স্নেহশীল এবং রসিক প্রকৃতির লোক, এবং সমাজের নিঃসঙ্গ ও অবাঞ্ছিত মানুষের প্রতি তাঁর অসীম সহানুভূতি। তাঁর উপন্যাসগুলি পাঠ করলেও তাঁর সম্পর্কে আমাদের এই রকমেরই একটা ধারণা হয়। নোবেল কমিটি ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দের সাহিত্য পুরস্কার তাঁকে প্রদান করে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন, কারণ তাঁর যোগ্যতা সংশয়াতীত। তাঁরা যথার্থই বলেছেন, হোয়াইট উপন্যাস-জগতে নতুন মহাদেশের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্যাট্রিক হোয়াইটের সাফল্যের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে অস্ট্রেলীয় সমাজের সাংস্কৃতিক পটভূমিকা মনে রাখা দরকার। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সমন্বয় ঘটানোর জন্য তাঁর দেশবাসীর যে-প্রচেষ্টা তিন-চার পুরুষ আগে হয়েছিল সেটার পূর্ণতার দিকে পরিণতি এই শতাব্দীর ষাটের দশকে দেখা গেল। (আর. এম্. ইয়ঙ্গার তাঁর সাম্প্রতিক 'অস্ট্রেলিয়া অ্যাণ্ড দি অস্ট্রেলিয়ান্স্' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।) 'দিগন্তের বিস্তৃতি' এই পরিণতির অন্যতম লক্ষণ। এই 'বিস্তৃতি'র মূলে যে-সব কারণ রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে— প্রবাসী অস্ট্রেলীয়েরা স্বদেশকে নতুন আলোকে দেখতে শিখেছে। জনপ্রিয় সাহিত্যিক নেভিল্ শূট্ (এঁর আসল নাম এস্. এস্. নরওয়ে), যিনি পরে অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়িভাবে বসবাস আরম্ভ করেন, তাঁর 'অ্যা টাউন্ লাইক্ অ্যালিস্' (১৯৫০) ও 'দ্য ব্রেকিং ওয়েভ' (১৯৫৫) প্রভৃতি উপন্যাসে অস্ট্রেলীয় পটভূমি ব্যবহার করেন বটে কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলি প্রধানত ইংরাজ ও মার্কিন পাঠকদের কথা ভেবে লেখা। প্যাট্রিক হোয়াইটই প্রথম অস্ট্রেলীয় উপন্যাসে আধুনিক মননের সূচনা করলেন এবং উপন্যাস লিখলেন প্রধানত অস্ট্রেলীয় পাঠকদের কথা মনে রেখে।

হোয়াইট-এর প্রথম উপন্যাস 'হ্যাপি ভ্যালি'কে পরবর্তী প্রখ্যাত অনেকগুলি উপন্যাসের সার্থক পূর্বসূরী বলা যেতে পারে। এই উপন্যাসটির পটভূমিকায় আছে

নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌-এর বরফে ঢাকা একটি অঞ্চল। এর নায়ক একজন স্থানীয় চিকিৎসক—অলিভার হ্যালিডে। তার বৈচিত্র্যহীন জীবন ও সে-কারণে অসন্তুষ্টি, এই নিয়ে এ কাহিনী। বিবাহিত জীবনে হতাশার ফলে হ্যালিডে অ্যালিস ব্রাউন নাম্নী একটি সঙ্গীত-শিক্ষিকার প্রতি আকৃষ্ট হয় ও তাদের মধ্যে প্রণয়ের বন্ধন গড়ে ওঠে। ব্যক্তিগত কারণে অ্যালিস্‌কে নিয়ে হ্যালিডের গোপনে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না, সুতরাং সে তার স্ত্রী হিল্‌ডাকে নিয়ে চলে উত্তরের এক জেলার প্রান্তসীমায় আর একবার নতুনভাবে জীবন শুরু করার জন্য। তার সমর্পিত প্রেম কিন্তু তার জীবনে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থেকে গেল—'এক নিবিড় সম্পর্ক যেটা বাইরের কোনো আঘাতই ছিন্ন করতে পারবে না।' জীবনের অনিবার্য দুঃখ-যন্ত্রণাকে মেনে নেওয়ার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা, এই সত্যই 'হ্যাপি ভ্যালি' উপন্যাসের উপজীব্য, যদিও কাহিনীটি শ্লেষ-মুক্ত নয়। মার্গারেট কুয়োঙ-এর মতো চরিত্র, যাদের সহজাত উপলব্ধি আছে, তারাই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে পারে। উপন্যাসটির কাহিনীতে অনেক চরিত্রের ভিড়, অনেক ঘটনা, স্থানীয় পরিবেশের উজ্জ্বল চিত্র—সবকিছুকে মিলিত করেছে কথাশিল্পীর মননশীলতা। গল্পাংশ অবশ্য স্বচ্ছন্দগতিতে এগোয় নি, কারণ হোয়াইট-এর ভঙ্গিতে 'স্ট্রীম্‌ অফ কন্‌শাস্‌নেস্‌'-শৈলীর প্রভাব রয়েছে।

এই শৈলীর প্রভাব 'দ্য লিভিং অ্যাণ্ড দ্য ডেড' উপন্যাসেও দেখা যায়। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ব্লুম্‌স্‌বেরি এই গ্রন্থের পটভূমি। বহির্জগতের পরিবেশ ও অন্তর্জগতের অনুভূতি কাহিনীতে মিলিয়ে দেওয়ার যে-প্রচেষ্টা হোয়াইট এই উপন্যাসে করেছেন তা সর্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। কাহিনীর নায়ক এলিয়ট স্ট্যাণ্ডিশকে আমরা দেখি অতীত জীবনের স্মৃতিচারণা করতে। তখন তার উপলব্ধি হয় যে, তার নিজের কোনো স্বতন্ত্র জীবনই ছিল না, যেটা ছিল সেটা অন্যদের সার্থকতর জীবনেরই খানিকটা সম্প্রসারণ। সে শুধু গড়তে চেষ্টা করেছে 'a cocoon of experience away from the noises in the street'। উপন্যাসটির উপসংহার আমাকে ডি. এচ্‌. লরেন্সের 'সান্স অ্যাণ্ড লাভার্স'-এর পরিণতির কথা মনে করিয়ে দেয়—এলিয়ট বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে, তারপর লণ্ডনগামী একটা বাসে উঠল, যেন মৃতদের থেকে সে সরে এল জীবিতদের দিকে যাওয়ার জন্য। (উপন্যাসটির নাম স্মরণীয়—'জীবিত ও মৃত'।) অধ্যাপক জি. এ. উইল্‌কেস্‌ মনে করেন, 'দ্য হ্যাম্‌ ফিউন্‌রল' নাটকে একই রাগিণী ঝংকৃত হয়েছে।

'দি আন্ট্‌স্‌ স্টোরি'-কে অনেকে হোয়াইটের প্রথম দিকের উপন্যাসগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এর কুমারী নায়িকার নাম থিওডোরা গুড্‌ম্যান। তার মা সব সময় তার উপর কর্তৃত্ব করেন। অস্ট্রেলিয়ার একটি ছোট শহরে থিওডোরা বড় হয়েছে কিন্তু তার পিতার মৃত্যুর পর তাকে সিডনি-নগরীতে চলে আসতে হয়। মার প্রভুত্ব তার মন ও ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে দিলেও তার অন্তর্জীবনে সেই সব বিরল

মুহূর্তের আবির্ভাব বন্ধ করতে পারে নি যখন এক লহমার জন্য সমস্ত ধরণী স্বপ্ন ও অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে ওঠে—যখন 'the opaque world will become transparent'। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি থিওডোরা তার মানসিক সমতা হারিয়েছে।

হোয়াইটের প্রথম মহৎ উপন্যাস 'দ্য ট্রী অফ ম্যান'। গোপালক স্টান পার্কার-কে নিয়ে কাহিনী। তার স্ত্রী এমির সঙ্গে সে যেভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করছে তার মধ্যে একটা সারল্য ও বিশ্বজনীনতা আছে যার কথা টমাস্ হার্ডি তাঁর বিখ্যাত 'ইন্ দ্য টাইম্ অফ দ্য ব্রেকিং অফ্ নেশান্স্' কবিতায় আমাদের শুনিয়েছেন। 'ভস্' উপন্যাসের মতো এখানেও পটভূমি অস্ট্রেলীয়, কিন্তু বিষয়বস্তু বিশ্বজনীন—নীরস, সাধারণ জীবনে যে-গোপন কাব্যরস উচ্ছল হয়ে ওঠে। স্ট্যান্ ও এমি নিজেরা সেই দলে যারা 'কথা খুঁজে খুঁজে' ফিরছে, 'প্রকাশের ব্যথা'য় যারা বিহ্বল, কিন্তু পরম কোনো উপলব্ধির জন্য তারা ব্যাকুল—যে-উপলব্ধি তাদের নাগালের বাইরে, যে-ধরনের উপলব্ধি থিওডোরা গুডম্যানের খানিকটা হয়েছিল কিন্তু সেজন্য তাকে নিজের প্রকৃতিস্থতা বিসর্জন দিতে হয়।

এমির ব্যাকুল প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া তার স্বভাবের উপর পড়ে ও তার মধ্যে আমরা দেখি সদাবিরক্ত ও কর্তৃত্বের ভাব। তার স্বামী কিন্তু কোনো কোনো বিরল মুহূর্তে, যখন সে বহির্জগতের বিস্ময়ের উপর মনঃসংযোগ করতে পারে, অসংখ্য বন্ধনমাঝে মুক্তির পূর্ণ আস্বাদন লাভ করে—'This table is love...if you can get to know it'। ঝড়ের দৃশ্যে কি ভাবে ধীরে ধীরে স্ট্যান তার ব্যক্তিগত অহং-বোধ হারিয়ে ফেলছে সেটা প্যাট্রিক হোয়াইট বর্ণনা করেছেন মর্মস্পর্শী ভাষায় (একাদশ পরিচ্ছেদ)—

The rain buffeted and ran off the limbs of the man seated on the edge of the veranda. In his new humility, weakness and acceptance had become virtues...The darkness was full of wonder. Standing there somewhat meekly, the man could have loved something, someone, if he could have penetrated beyond the wood, beyond the moving darkness. But he could not, and in his confusion he prayed to God, not in specific petition, wordlessly almost, for the sake of company. Till he began to know every corner of the darkness, as if it were daylight, and he were in love with the heaving world, down to the last blade of wet grass.

দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনের মধ্যে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দেওয়ার কথা এ উপন্যাসে বারংবার বলা হলেও এটা অনুমান করা বোধ হয় ভুল নয় যে, অন্য একটি কথা গভীরতর স্বরে উচ্চারিত—পারিপার্শ্বিকের নিগড় থেকে মুক্তিতেই মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা, সার্থকতা সংক্রমণে ততটা নয় যতটা অতিক্রমণে।

এই অতিক্রমণের পদ্ধতিই পরীক্ষা করা হয়েছে হোয়াইটের পরবর্তী 'ভস্' উপন্যাসে। এক বিক্ষিপ্তচিত্ত অভিযাত্রী প্রমাণ করতে চায় যে, মানুষের পক্ষে দেবতায় রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব এবং সেটা প্রমাণের জন্য সে স্বেচ্ছায় দুঃখের আগুনে জ্বলে খাঁটি হতে চায়। অদম্য তার মনোবল, অটুট তার সাহস। 'ভস্'-এর মধ্যে তার ট্র্যাজেডিই হোয়াইট বিবৃত করেছেন।

চরিত্রগুলিকে 'মিস্টিক্যাল' ভাবধারার প্রতিমূর্তিরূপে অঙ্কন করার প্রয়াস 'রাইডার্স ইন্ দ্য চ্যারিয়ট'-এ আরও পরিস্ফুট। নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতা-বোধের গভীর বিশ্লেষণ বিভিন্ন ধরনের চরিত্রকে মিলিয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছে বিবর্ণ পিতৃগৃহে বাসকারী এক মহিলা, নাৎসী জার্মানী থেকে পলাতক এক ইহুদী, এক রজকিনী যার স্বামী মাতাল এবং আদিবাসী এক শিল্পী।

'দ্য সলিড ম্যাণ্ডালা' উপন্যাসটি ভারতীয় পাঠকের কৌতূহল বিশেষভাবে উদ্রিক্ত করে। দুই জন যমজ ভাইয়ের জটিল সম্পর্ক এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে। এদের মধ্যে একজন জড়বুদ্ধি (আর্থার ব্রাউন) ও অন্যজন মোহমুক্ত বুদ্ধিবাদী (ওআল্ডো ব্রাউন)। গ্রন্থটির নামে যে 'ম্যাণ্ডালা' শব্দটি রয়েছে সেটি সংস্কৃত 'মণ্ডল' শব্দ, যার অসংখ্য অর্থ। প্রাচ্য শিল্পকলায় এটি একটি পারিভাষিক শব্দ যার তাৎপর্য বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রূপদ্যোতনা। জ্যামিতিক এককেন্দ্র-বিশিষ্ট বৃত্তাকারে সাধারণত এটা প্রকাশ পায় যার প্রতিটি বৃত্তে কোনো দেবদেবীর মূর্তি বা বিশেষত্ব। প্যাট্রিক হোয়াইট-এর কাহিনীতে দেখা যায়, বিশ্বকোষ পড়তে পড়তে আর্থার ব্রাউনের এই 'মণ্ডল' শব্দটি চোখে পড়ে ও সেখানে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'সমগ্রতার প্রতীক'। শেষ পর্যন্ত আর্থারের উপলব্ধি হবে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড আর্তি রয়েছে কোনো একজনকে খুঁজে পাওয়ার জন্য, যার পূজারী সে নিজে হতে পারবে। তবে এই আর্তি প্রশমিত না হওয়ার কারণ মানুষ ভালোবাসতে ভয় পায়।

প্যাট্রিক হোয়াইট আধুনিক অস্ট্রেলিয়ার মহত্তম কথাশিল্পী এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই কিন্তু কয়েকজন তবু মনে করেন এ সম্মান মার্টিন বয়েড-এর প্রাপ্য। এইসব সমালোচক মনে করেন, মানুষের চরিত্রে অন্তর্দৃষ্টির তুলনায় হোয়াইটের সমাজ-সম্পর্কে ধারণা অগভীর ও প্রাতিভাসিক। তাঁদের আরও অভিযোগ, প্যাট্রিক হোয়াইট অনেক সময় শৈলীর চাতুর্য দেখানোর চেষ্টা করেন। এই অভিযোগগুলি যদি সত্য বলে ধরেও নেওয়া হয়, তবু সেগুলির উপর অকারণ গুরুত্ব আরোপ অর্থহীন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উল্টো দিকটা যেন আমরা ব্যবহার না করি। একজন সাহিত্যশিল্পী কি করতে পেরেছেন সেটাই আমাদের প্রথম ও প্রধান বিচার্য, তিনি কি করতে পারেন নি (হয়তো সেটা তিনি করতে চান নি তাও বটে) সেটা নয়। সাংসারিক দুঃখ সহ্য করার মধ্যে যে-মহিমা, এবং নিঃসঙ্গতার মধ্যে যে-শক্তি নিহিত আছে, তার দিকে প্যাট্রিক হোয়াইট আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

চারজন ফরাসী কবি

প্রতীকের প্রতীতি

একটা সাধারণ ধারণা আছে, 'পদ্যে ইংল্যাণ্ড, গদ্যে ফ্রান্স'। অর্থাৎ কাব্যসাহিত্যে ইংল্যাণ্ড শ্রেষ্ঠ, গদ্যসাহিত্যে ফ্রান্স। এটা হয়তো কথার কথা। তবে এই ধরনের কোনো তুলনামূলক আলোচনায় না গিয়েও বলা চলে, ফরাসী সাহিত্যে কাব্যের উৎকর্ষ সংশয়াতীত। বিশেষ একটি শতাব্দীর—উনবিংশ—কাব্যসাহিত্য বিচার করলেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এক দিকে রয়েছেন রোমান্টিক কবিরা যাঁদের কুলপতি হচ্ছেন ভিক্তর উগো, অন্যদিকে রয়েছেন লেকঁৎ দ্য লীল্-এর মতো 'পার্নাসীয়' কবিরা এবং মালার্মের মতো প্রতীকীবাদীরা। কাছাকাছি সময়ে এঁরা কবিতা লিখেছেন কিন্তু লিখেছেন বিভিন্ন ধরনের কবিতা, বিভিন্ন ধারার কবিতা। লোকে বলে, ফরাসী কবিদের মধ্যে আধুনিকতা এত প্রবল যে, তাঁরা পনের বছর অন্তর কবিতার ধারা বদল করেন। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী কবিদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে প্রভাবশালী তাঁরা হচ্ছেন প্রতীকীবাদী বা Symboliste এবং এঁদের প্রভাব যেমন শতাব্দী অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীতে এসেছে তেমনি দেশের সীমা অতিক্রম করে পাশ্চাত্ত্য জগতের সর্বত্র এবং তার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে।

ফরাসী সাহিত্যে প্রতীকীবাদী আন্দোলনের মোটামুটি সময়সীমা ১৮৭০-১৯০০ ধরা যেতে পারে। মোপাসাঁ ও ফ্লোবের ইত্যাদি লেখকেরা কথাসাহিত্যে যে নিখুঁত বাস্তববাদ নিয়ে এসেছিলেন এটা তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া। এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় লেখকদের হাতে প্রতীকের ব্যবহার শুধু অভিনবত্বে মণ্ডিত হয়েছে তাই নয়, গভীরতর তাৎপর্যও পেয়েছে। এইজন্যই নাম 'প্রতীকীবাদী'। এই লেখকেরা প্রতীকের ব্যবহার করেছেন রচনাকে বিশদ করার জন্য ততটা নয় যতটা যে-সব অস্পষ্ট ও রহস্যময় চিন্তা, অনুভূতি এবং সংবেদনকে সচরাচর অবর্ণনীয় মনে করা হয় তাদের প্রকাশ করার প্রয়াসে। এঁরা মনে করতেন, ইন্দ্রিয় কিংবা বুদ্ধির দ্বারা অনধিগম্য কোনো মহত্তর বাস্তবকে শিল্পের পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব যদি প্রতীকের উপযুক্ত ব্যবহার করা হয়। যেহেতু এই 'মহত্তর বাস্তব' শুধু শিল্পীর পক্ষে অধিগম্য, প্রতীকীবাদীরা পাঠকের মনে নিজের মনের ভাব সঞ্চারিত করার চেয়ে শিল্পীর স্বপ্নকল্পনা প্রকাশের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। এ কারণে অনেক সময় মনে হয় যে, তাঁরা যেন খানিকটা ইচ্ছাপূর্বক তাঁদের কবিতাকে দুর্বোধ্য করেছেন। মালার্মে বলেছেন, 'স্বপ্ন যে

আছে এটার আভাস দেওয়ার জন্য ; প্রতীক হচ্ছে এই রহস্যের পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ'। কবিতাতে 'কোনো বিষয়কে ধীরভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে যাতে একটি বিশেষ মানসিক অবস্থা উন্মোচিত হয়'। প্রতীকীবাদীদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কাব্যকে মূলত সংগীতধর্মী করা এবং আত্মিক স্তরে উন্নীত করা, যাতে যথেষ্ট ব্যঞ্জনা আনা যায়। লিটন স্ট্রেচি তাঁর 'ল্যাণ্ডমার্ক্স্ ইন ফ্রেঞ্চ লিটারেচার' গ্রন্থে লিখেছেন, **'Verlaine and his fellow-workers in verse attempted to make poetry more truly poetical than it had ever been before, to introduce into it the vagueness and dreaminess of individual moods and spiritual fluctuations, to turn it away from definite fact and bring it near to music.'** এডমণ্ড উইল্সন তাঁর 'আকসেল্স কাস্ল্' গ্রন্থে প্রতীকীবাদের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, **'And Symbolism may be defined as an attempt by carefully studied means—a complicated association of ideas represented by a medley of metaphors—to communicate unique personal feelings.'** ব্যঞ্জনা, স্বচ্ছন্দচারিতা, আত্মবাদিতা, ব্যাকরণের বিধিনিষেধ লঙ্ঘন, এবং শব্দের ধ্বনিময়তার উপর নির্ভর—এইগুলিকে প্রতীকীবাদী কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য করা যেতে পারে। পার্নাসীয় কবিরা কাব্যের সঙ্গে চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ করেছিলেন ; প্রতীকীবাদীরা ভেবেছিলেন, কাব্যের সঙ্গে অন্য সব শিল্পের তুলনায় সংগীতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।

শ্রেষ্ঠ প্রতীকীবাদী কবিদের মধ্যে ভের্লেন, র‍্যাঁবো ও মালার্মেকে গণ্য করা হয়। এঁরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিলেন ; ভের্লেন ও মালার্মে প্রায় সমবয়সী ছিলেন ; র‍্যাঁবো এঁদের চেয়ে দশ-বারো বছরের ছোট ছিলেন বটে কিন্তু বালপ্রৌঢ়ত্বের জন্য মানসিক পরিণতি এবং কবিপ্রতিভার দিক থেকে মোটামুটি এঁদের সমকক্ষ ছিলেন। এঁদের সকলের কবিতার কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ আছে। একটি মুখ্য রূপকের চারধারে কয়েকটি চিত্রকল্প ও ব্যঞ্জনা গ্রথিত করে কবিতা লেখার দিকে এঁদের প্রবণতা লক্ষণীয়। আরও আধুনিক যুগের হলেও ভালেরি প্রথম জীবনে মালার্মের সংস্পর্শে এসেছিলেন ও তাঁকে গুরুর মতন দেখতেন। তাঁর এই সময়ের রচনায় মালার্মের প্রভাব স্পষ্ট। তাই তাঁকেও প্রতীকীবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অপেক্ষাকৃত অল্পকালের ব্যবধানে এই চারজন প্রতিভাবান্ কবি প্রথম শ্রেণীর কবিতা লিখে ফরাসী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। ভালেরির কাছে যেমন, অন্য তিনজনের কাছেও কবিতা, মুক্তছন্দে বা গদ্যছন্দে লেখা যেতে পারে, কারণ কবিতা হচ্ছে 'ধ্বনি ও অর্থের মধ্যে সেই দীর্ঘায়িত দ্বিধা'। এঁরা সকলেই 'অবিমিশ্র কাব্যে'র জয়ধ্বনি করেছেন। এঁদের প্রত্যেকটি শব্দ সুনির্বাচিত এবং

একটি শব্দেরও এঁরা অপচয় করেন না। এঁরা চারজনই অল্পবিস্তর রোম্যান্টিক ; ভালেরির মধ্যে অবশ্য এক ধরনের নব্য-ক্ল্যাসিসিজ্‌মও দেখতে পাই, যেমন রাসীনের নাটকে পাওয়া যায়, কারণ ভালেরি 'তরুণী নিয়তি' প্রভৃতি তাঁর প্রধান কবিতাগুলিতে বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির সমন্বয়সাধন করতে পেরেছেন। বোদ্‌লেয়ার, প্রাক্‌-র‍্যাফেলীয় কবিগণ এবং পো—এঁদের সকলের কাছে আমাদের চারজন কবিই ঋণী। আর, এক অর্থে বোদ্‌লেয়ার থেকেই প্রতীকী কবিতা শুরু হয়ে গেছে। তিনি মনে করতেন, কবিতার মধ্য দিয়ে মানবাত্মার 'সেই সব আলোর অনুভূতি হয় যা মৃত্যুর অন্তরালে রয়েছে' (**'les splendeurs situees derriere le tombeau'**)। এঁরা চারজনই এজ্‌রা পাউণ্ড, টি. এস্‌. এলিঅট প্রমুখ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিশিষ্ট ইংরাজ ও মার্কিন কবিদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি ফরাসী সাহিত্য ও শিল্পে যে **surrealism** আন্দোলন আরম্ভ হয় তার পশ্চাতেও এই চারজন কবির অনুপ্রেরণা কাজ করেছে। এই নতুন আন্দোলনে ফ্রএডের অনুসরণে অবচেতন মনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কাফ্‌কা ও জয়েসের মতো ভিন্নদেশীয় সাহিত্যিকদেরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সমস্ত একাধিক কারণে চারজন প্রতীকীবাদী ফরাসী কবির একত্রে আলোচনা করা সঙ্গত।

১

স্তেফান মালার্মে

প্রতীকীবাদীদের শীর্ষস্থানীয় ফরাসী কবি স্তেফান মালার্মে। তাঁর জন্ম ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই মার্চ। তিনি বিভিন্ন ফরাসী নগরীতে ইংরাজীর শিক্ষকতা করেন। তাঁর অন্যতম রচনা এড্‌গার অ্যালান পোর কবিতার অনুবাদ। কিছু দিন ইংল্যাণ্ডে থাকার সময় প্রাক্‌-র‍্যাফেলীয় কবিদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় হয়। প্রথম দিকে তিনি পার্নাসীয় কবি ও বোদ্‌লেয়ারের শিষ্যরূপে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই এই প্রভাব কাটিয়ে উঠে নিজের মৌলিকতার পরিচয় দেন।

মালার্মে ছিলেন অমায়িক ও সদালাপী এবং স্বভাবতই অনেক তরুণ প্রতীকীবাদী তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁর রোমক সরণী-স্থিত বাসভবনে বিশিষ্ট সহৃদয় ব্যক্তি ও সাহিত্যিকদের আসর বসত। মালার্মে স্বল্পই লিখেছিলেন এবং এর অধিকাংশই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। এইগুলি ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে 'পদ্য ও গদ্য' (**'Vers et Prose'**) এই নামে সংকলিত হয়। মালার্মের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রচনা 'বনদেবতার অপরাহ্ণ' (**'L'Apres-Midi d'un Faune'**) ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এক কিন্নরের ব্যাকুল প্রেমের বাণীরূপ এ কবিতা

—কামনার দিবাস্বপ্ন এখানে বিস্তারিতভাবে বিবৃত। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ 'ফনের দিবাস্বপ্ন' তাঁর 'প্রতিধ্বনি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। সংগীতকার ক্লোদ্ দ্বুবুসি এটি অবলম্বন করে একটি গীতি-আলেখ্য রচনা করেন। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর মালার্মের মৃত্যু হয়। আধুনিক যুগের ফরাসী, ইংরাজী ও অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে মালার্মের প্রভাব অপরিসীম। এই প্রভাব এখনও ক্রিয়াশীল।

মালার্মের ধারণা, কাব্যে তুরীয়ের প্রকাশ থাকবে এবং কাব্য হবে সংগীতের প্রতিরূপ। বাক্য গঠনের ব্যাকরণ-সম্মত নিয়ম তিনি মানতেন না। রচনাশৈলীতে তাঁর স্বকীয়তা স্পষ্ট, কারণ তিনি মনে করতেন শব্দের প্রচলিত অর্থের চেয়ে তার 'সংগীত' (ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা) অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। মালার্মের মতে, স্থির অপেক্ষা চঞ্চল এবং উক্তির চেয়ে আভাস স্পৃহণীয়। ভের্লেন অনুভূতি ও আবেগ পাঠকমনে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন ; মালার্মে চেয়েছেন, অনুভূতির ধারণাকে বোধগম্য করে তুলতে। ভের্লেন সহজবোধ্য, মালার্মে জটিলতায় আচ্ছন্ন। মালার্মের লেখায় চিত্রকল্পের ছড়াছড়ি, একটার সঙ্গে আর একটা জড়িয়ে মিশিয়ে একাকার হয়ে গেছে। যারা তাঁর কবিতা বুঝতে শেখে নি তাদের কাছে তিনি দুর্বোধ্য। তাই মার্লামের অনুরাগীদের কাছে তিনি কবিসার্বভৌম হলেও অন্য অনেকের কাছে তাঁর কবিতা 'ছন্দোবদ্ধ ধ্বনি' মাত্র। মালার্মে নিজের আত্মার গভীর গহনে প্রবেশ করেছেন ও তাঁর আত্মপরিক্রমা তাঁর কাব্যে রূপায়িত হয়েছে। সংহত, গীতিধর্মী ও ব্যঞ্জনাময় রীতিতেই এই কবিতা লেখা যেতে পারে। তাই এই কবিতাকেই মালার্মে 'অবিমিশ্র কাব্য' বলেছেন।

বাস্তব সব কিছুর অন্তরালে জিনিসের আদিম একটা রূপ আছে, এ কথা প্লেটোর মতো মার্লামেও মনে করতেন, অবশ্য তাঁর নিজস্ব স্বতন্ত্র ধারায়। কবির দিব্য কর্তব্য হচ্ছে জিনিসের আসল রূপটা প্রকাশ করা, এটা মালার্মে তাঁর **'Quand l'ombre menaca de la fatale loi'** ('যখন সর্বনাশা বিধি দিয়ে ছায়া ভয় দেখালো') সনেটে বলেছেন। বিশেষ একটি ফুলকে কবি বর্ণনা করবেন না, তাঁর বর্ণনার বিষয় হবে আদর্শ, আদিম ফুল (**'l'absente de tous bouquets'**)। আসলে 'নীরবতা' এবং 'অনুপাস্থিতি'র মতো ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ আর কি হতে পারে? 'নীরবতা'র অর্থ সংগীতের সামর্থ্য, সংগীতের প্রবেশদ্বার। 'অনুপস্থিতি' সেইভাবে কোনো আদর্শস্বরূপের উপস্থিতির ইঙ্গিত করে। যা-কিছু দ্রুত ধাবমান সবই অনুপস্থিত, যেমন যে-পাখির গান আমরা জীবনে দ্বিতীয়বার শুনি না, কিন্তু 'অবর্ণনীয়' বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না। 'অবর্ণনীয়' (*indicible*) ফরাসী শব্দই নয়, যেমন কবির অভিধান থেকে 'মতো' তুলে দিতে হবে। কবির প্রচেষ্টা সব সময় সাফল্যমণ্ডিত হবে না ; 'রাজহংস' কবিতায় মালার্মে বন্ধ্যা কবির বিখ্যাত ছবিটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। একটি শ্বেতশুভ্র মরাল সাদা বরফের তলায় চাপা পড়ে গেছে। তার অতীত মহিমা আজ কোথায়? তার

যে-দিন গেছে সে একেবারেই গেছে। প্রেরণার অভাব কিংবা উদ্যমের অভাব অথবা যে-কোনো কারণের জন্যই হোক কবির কাব্যসৃষ্টির স্রোত রুদ্ধ হয়ে গেছে। (অবশ্য মালার্মের অধিকাংশ প্রতীকী কবিতার মতো এ কবিতারও অনেক ধরনের ব্যাখ্যা করা যায়।) তবে কবি সৃষ্টি করতে পারছেন না বলেই কি তিনি নিন্দনীয় হবেন ? সৃষ্টিহীন হলেও কবি তো কবিই। এমন-কি, মৃত্যুও কবির কোনো ক্ষতি করতে পারছে না, বরং কবির রচনাকে একটা সুস্পষ্ট পরিণতি দিচ্ছে। মালার্মের একাধিক বিখ্যাত কবিতা অন্য কবি বা শিল্পীদের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন পো, বোদ্‌লেয়ার, ভের্লেন এবং ভাগ্‌নার। 'এড্‌গার পো-র সমাধি' নানা দিক্‌ থেকে মালার্মের প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতা—

অবশেষে শাশ্বতিক দেয় তাকে আপন স্বরূপ,
কবি নিয়ে নগ্ন অসি জাগাইয়া তোলে নিজ যুগে,
সন্ত্রস্ত শঙ্কিত যেহেতু সময়ে খবর রাখে নি
মৃত্যু বিজয়ে গর্বিত সেই অত্যদ্ভুত কণ্ঠস্বরে !

বহুকাল আগে দেবদূত যবে জাতির ভাষাকে
দিয়েছিল আরো পবিত্রতা, সেই শুনে চমকিত
ভুজঙ্গের মতো, তারা বলেছিল উচ্চে মন্ত্রশক্তি
কৃষ্ণবর্ণ পানীয়ের অখ্যাত স্রোতেতে অভিস্নাত।

মৃত্তিকা-মেঘেতে সঙ্ঘাতের অবসানে, হে বেদনা,
পো-র উজ্জ্বল সমাধি সুশোভিত করিবার লাগি
আমাদের চিন্তা যদি নাহি দেয় ভাস্কর্যের সাজ,

কোনো নামহীন বিপর্যয় থেকে হেথা খসে পড়া
শান্ত প্রস্তরের খণ্ড এ-কঠিন শিলা চিরসাক্ষী
কুখ্যাতির কালো ছায়া ভাবীকালে মিলাইয়া যাবে।

মালার্মের কাব্য সম্বন্ধে আমরা তাঁর নিজের ভাষা ব্যবহার করে বলতে পারি **'magnifique, total et solitaire'**, অর্থাৎ 'মহৎ, সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র'। তাঁর গুরু-স্থানীয় মার্কিন কবি পো-র মতো তিনিও নিজের জাতির শব্দাবলীকে বিশুদ্ধতর তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছেন (**'un sens plus pur aux mots de la tribu'**)। প্রচলিত খ্রীস্টধর্মে আস্থা হারিয়ে ফেলার পর মালার্মের কাছে জীবনের অসারত্ব বড় হয়ে উঠেছিল। ক্রমশ তিনি উপলব্ধি করেন, শুধু সাহিত্যের মধ্য দিয়েই মানুষের মুক্তি আসতে পারে, কল্পনার স্তরে ঘটতে পারে জীবনের রূপান্তর। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকে তিনি যে কিছু পান নি এমন নয়। মারী গের্‌হার্ড্‌ নাম্নী যে জার্মান

প্রণয়িনীকে মালার্মে বিবাহ করেন তিনি কবির জীবনের সন্ধিক্ষণে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা উপলব্ধি করতে পারেন নি বটে কিন্তু তাঁর কাছে কবির ঋণ অনস্বীকার্য। এঁকে উদ্দেশ করেই তিনি প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর কাব্যধর্মী গদ্যে—'এই সূর্যকিরণ হয়তো তোমার হৃদয়ে রহস্যময় নীল ফুল ফুটিয়ে তুলবে, আর এই ফুল ফুটে ওঠায় যে-সৌরভ জন্ম নেবে সেটা আশা করি অমনোরম হবে না। আমি সেটা নিঃশ্বাসের মধ্যে গ্রহণ করব। সেই সৌরভের নাম প্রেম।' বিবাহের বছর কুড়ি পরে চিত্রশিল্পী বন্ধু মানে-র স্টুডিওতে মালার্মের সঙ্গে বিখ্যাত মডেল মেরি লরেঁ-র পরিচয় (হয়তো অন্তরঙ্গতাও) হয় এবং 'এই সৌরভে' কবির হৃদয় আর একবার সুরভিত হয়। সাধারণভাবে অবশ্য মালার্মে ভাবাবেগের পক্ষপাতী ছিলেন না ; তিনি মনে করতেন, জীবনে এবং সাহিত্যে বুদ্ধিবৃত্তিকেই আমাদের আশ্রয় করা উচিত। তাঁর নায়ক 'ফন' ভাবাবেগের কাছে আত্মবিসর্জন দিচ্ছে না; মোহময়ী উদ্ভিন্নযৌবনাদের সে নিজের বাহুর নাগপাশে বাঁধার সুযোগ পেয়েও শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিচ্ছে। অবশ্য বলা যেতে পারে, সে খানিকটা শেক্‌স্‌পিয়রের হ্যামলেট কিংবা এলিঅটের প্রুফ্রকের মতো। এই প্রসঙ্গে মালার্মের নাট্যকাব্য ***Herodiade***-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। যে-রাজকুমারী এর একাকিনী নায়িকা তার প্রকৃতিতেও ভাবাবেগের উত্তাপ নেই।

ঐহিক জীবন ও সাংসারিক সুখ নিয়ে কোনো বড় কবিই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, মালার্মেও পারেন নি। আর মৃত্যু যে-জগতে প্রবল প্রতাপে ধ্বংসের কাজ চালিয়ে যায় সেখানে সুখের সন্ধান করার মতো নির্বুদ্ধিতা আর কি হতে পারে ? শৈশবে মালার্মেকে মাতৃবিয়োগের বেদনা সহ্য করতে হয়। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে আট বছরের পুত্র আনাতোলকে হারানোর বেদনা তাঁর পক্ষে মর্মন্তুদ হয়। এ শোক তিনি কোনো দিনই ভুলতে পারেন নি, যেমন ভুলতে পারেন নি এর বাইশ বছর আগে একমাত্র সহোদরা মারিয়াকে হারানোর ব্যথা। এক অর্থে মৃত্যু নবজন্মের সূচক, কিন্তু ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সৃষ্টি-উন্মাদনা বর্তমানের বিয়োগ-যন্ত্রণার লাঘব ঘটাতে পারে না। তবু মালার্মের কবিতায় জন্ম-মৃত্যু-পুনরভ্যুত্থানের একটি চক্র ঘুরে চলেছে। বহু দিক্ থেকে তিনি মনে-প্রাণে রোম্যান্টিক। অন্যান্য অনেক কবির মতো মৃত্যু নিয়ে তিনি অনেক ভাবনা-চিন্তা করেছেন। শেলির 'ওড্ টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড' যেন মালার্মের সমগ্র কাব্যের প্রতিরূপ, কিন্তু ফরাসী কবির কবিতায় আশার সুর অত উদাত্তভাবে ধ্বনিত হয় নি। কবিতা শুধু কল্পনালতা নয়, কবিতাকে তিনি মানুষের সঞ্জীবনী মন্ত্ররূপে উচ্চারণ করেছেন। প্রুস্ত্ যেমন উপন্যাস-রচনার মাধ্যমে কালের নাগপাশ থেকে মুক্তি খুঁজে পেয়েছেন, মালার্মে যেন কবিতা রচনা করে বাঁচতে চেয়েছেন সেই আতঙ্ক থেকে যার উৎস, পাস্কালের ভাষায়, 'অনন্ত মহাশূন্যের শাশ্বত নীরবতা'র বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। কাব্য সম্পর্কে মালার্মে বলেছেন, 'মানুষের ভাষাকে অপরিহার্য মৌলিক ছন্দে ফিরিয়ে আনার মধ্য দিয়ে

কাব্য অস্তিত্বের রহস্যময় তাৎপর্যকে প্রকাশ করে: এইভাবে কাব্য আমাদের [জাগতিক] স্থিতিকে সত্যের মর্যাদা দেয় এবং এটাই আধ্যাত্মিক দিক থেকে একমাত্র করণীয় কাজ।' সাহিত্য এখানে মালার্মের কাছে মোক্ষের দ্বারস্বরূপ হয়ে উঠেছে।

২

পোল ভের্লেন

পোল্ ভের্লেন্‌কে অনেক সময় বলা হয় প্রথম প্রতীকীবাদী কবি। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে মার্চ তাঁর জন্ম হয়। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে বিবাহের কিছুদিন পরেই তিনি পত্নীকে পরিত্যাগ করে বন্ধু র‍্যাঁবোর সঙ্গে বেলজিয়াম ও ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে যান। পরে র‍্যাঁবোকে হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারামুক্তির পরে ভের্লেন কিছুদিন ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি সুরা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় ব্যয় করেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর হাসপাতালে কাটাবার পর ৮ই জানুয়ারি, ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে নিঃস্ব অবস্থায় 'অভিশপ্ত' ('maudit') কবির মৃত্যু হয়।

ভের্লেন-এর প্রথম যুগের কবিতা বোদ্‌লেয়ার-প্রভাবিত ও পার্নাসীয় ধাঁচে লেখা। পরে তিনি নিজস্ব কাব্যরীতি উদ্ভাবন করেন ও প্রতীকীবাদী ধরনের কবিতা লেখেন। (১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত **'Art Poetique'** দ্রষ্টব্য।) সারা জীবনের কামনা-বাসনা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও আত্মগ্লানি ভের্লেনের কবিতার প্রতি ছত্রে প্রতিফলিত। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে **'Romances sans paroles'** ('শব্দহীন রোমান্স', ১৮৭৪), আধ্যাত্মিক কবিতার সংকলন **'Sagesse'** ('প্রজ্ঞা', ১৮৮১) এবং **'Jadis et Naguere'** ('একদা ও বেশিদিন আগে নয়', ১৮৮৪) উল্লেখযোগ্য। সুরের ঝংকার, সূক্ষ্ম কারুকার্য, আবেগের উত্তাপ, বিষাদের উচ্ছ্বাস, কখনও অশালীনতা, কখনও আধ্যাত্মিকতা, ভের্লেনের কবিতাকে অপরূপ রহস্যে মণ্ডিত করে তুলেছে। অনুভূতির সঙ্গে সংগীতের যে অঙ্গাঙ্গী মিশ্রণ ভের্লেনের **'Clair de lune'** ('চাঁদের আলো'), **'Il pleure dans mon coeur'** ('আমার হৃদয়ে অশ্রু ঝরে') প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য তা ফরাসী কাব্যে দুর্লভ।

ভের্লেনের জীবনী পড়লে মনে হবে, তিনি সেই কবি যাঁর সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা তিনি ভবঘুরে ও ছন্নছাড়া। অবশ্য অধিকাংশ কবিদের সম্বন্ধে এ ধারণা ভ্রান্ত হলেও ভের্লেনের সম্বন্ধে এটা খাটে। মদ্যপান, উচ্ছৃঙ্খলতা, অনাচার, কারাগৃহ, হাসপাতাল এবং প্রতিভার অপচয়—এই হল তাঁর জীবন-

কাহিনী। শুধু তাঁর কবিতাই নয়, তাঁর জীবনও মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ফরাসী কবি ফ্রাঁসোয়া ভীইয়োঁর কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। ষোড়শী মাটিল্‌ডে মোতে-কে ভের্লেন সত্যই ভালোবেসে বিবাহ করেন এবং বিবাহের পরেও ভালোবাসতেন। তাঁর প্রণয় ও পরিণয় তিনি 'La Bonne Chanson' (১৮৭০) কাব্যে স্মরণীয়ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। অথচ র‍্যাঁবোর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে তিনি অনুরক্তা স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে ছেড়ে তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যান ও অস্বাভাবিক জীবন যাপন করেন। র‍্যাঁবোর সঙ্গেও তাঁর প্রায়ই মনোমালিন্য ঘটত। অর্থাৎ একটা মানসিক অস্থিরতা ভের্লেনকে সব সময় বিব্রত করত। কারাবাসের সময় তিনি হঠাৎ রোমান ক্যাথলিক হয়ে যান। আধ্যাত্মিক জীবন তাঁকে আকৃষ্ট করে এবং এই সময়ের অনেক কবিতায় তাঁর ধর্মচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। *Sagesse* সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বিশ্বসাহিত্যে ধর্মমূলক কবিতার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। অবশ্য 'বোহীমীয়' জীবনের জন্য অনুতাপ এবং আধ্যাত্মিক প্রবণতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কিছুদিন পরেই ভের্লেন আবার ছন্নছাড়া জীবনে ফিরে গেছেন ও জীবনের শেষ দিনগুলি সেইভাবেই কাটিয়েছেন। তাঁর কবিতায় তিনি নিজের জীবনের কোনো দিক গোপন করার চেষ্টা করেন নি ; রুসোর মতো তিনিও যেন আমাদের জন্য নিজের 'স্বীকারোক্তি' রেখে গেছেন। এই স্বীকারোক্তি থেকে তাঁকে 'পছন্দ' করা কঠিন, রুসোকেও যেমন ; কিন্তু একটা মমতার অনুভূতি বোধ হয় সব কিছু ছাপিয়ে পাঠকের মনে জেগে ওঠে এই 'অভিশপ্ত' কবির জন্য।

রুসোর মতো ভের্লেনও বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক। রুসো ও বোদ্‌লেয়ারের মতো ভের্লেনও নিজের লেখায় নিজের হৃদয়কে অনাবৃতভাবে মেলে ধরেছেন। শব্দের উচ্ছ্বাস কিংবা অলঙ্কারের বাহুল্য কবিতার পক্ষে ক্ষতিকর বলে তিনি মনে করতেন। স্বভাবকবির মতো তিনি স্বতঃস্ফূর্ত কবিতায় বিশ্বাস করতেন এবং সেই ধরনের কবিতা লিখতেন। গীতিকাব্য যে কত স্বাভাবিক ও মর্মস্পর্শী হতে পারে, কত স্বতঃ-উৎসারিত, তা তাঁর কবিতা না পড়লে অনুভব করা যাবে না। এ দিক থেকে তিনি হাইনে, ব্লেক ও শেলির সমগোত্রীয়। অবশ্য তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার উৎকর্ষ তাঁর অন্যান্য কবিতায়, বিশেষত শেষ জীবনের কবিতায়, পাওয়া যায় না। এগুলি, তাঁর নিজের ভাষায়, 'সাহিত্য মাত্র' ('Et tout le reste est literature')। ভের্লেনের এই ফরাসী ছত্রটি তাঁর 'Art poetique' কবিতা থেকে উদ্ধৃত। এই কবিতাতেই তিনি 'বাক্‌পটুতা'র কণ্ঠ রুদ্ধ করার কথা বলেছেন, 'Prends l'eloquence et tords-lui son cou !' কবিতাটির প্রথম ছত্রেই ভের্লেন লিখেছেন, 'সব কিছুর আগে সংগীত'। প্রতীকীবাদীদের মূলমন্ত্র এই ছত্রে উচ্চারিত। প্রতীকী কবিতায় সুরের সূক্ষ্ম তারতম্য প্রধান, উজ্জ্বল বর্ণবিন্যাস নয়। ভের্লেন যখন তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করেন, 'শব্দহীন

রোম্যান্স', তখন সুরের সূক্ষ্ম কম্পনই-যে তাঁর কবিতার প্রাণ, এ-কথা বলতে চেয়েছিলেন। এই কম্পনই অনুভব করা যায় যখন তাঁর 'বেচারা কিশোর রাখাল' বলে, **'J'ai peur d'un baiser'** ('একটি চুম্বন আমি ভয় করি')। কিংবা প্রণয়ীর প্রেমমুগ্ধ হৃদয়ের অনুভূতিতে, **'Ah ! les premieres fleurs, qu'elles sont parfumees !'** ('হায়, প্রথম ফুলগুলি কত না সুরভিত হয় !')। একটি বিশ্ববিশ্রুত কবিতায় ভের্লেন চন্দ্রালোককে বর্ণনা করেছেন 'শান্ত, সুন্দর, বিষণ্ণ'। তাঁর কবিতা সম্পর্কেও এই কি শেষ কথা নয় ?

আর্তুর র‍্যাঁবো

আর্তুর র‍্যাঁবো (জন্ম ২০. ১০. ১৮৫৪। মৃত্যু ১০. ১১. ১৮৯১) প্রতীকীবাদীদের অগ্রদূত। তিনি পোল ভের্লেন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন কিন্তু উনিশ বছর বয়সের পর কাব্য রচনা থেকে বিরত হন। পারিবারিক অশান্তির জন্য কৈশোরেই তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন। এই সময় তিনি যে-সব কবিতা লিখেছেন তাতে পরিণত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক কবিতার মধ্যে তাঁর বিদ্রোহী মনের প্রকাশ রয়েছে—এই বিদ্রোহ কখনও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, কখনও তৃতীয় নাপোলিঅঁর বিরুদ্ধে, কখনও বা নিজের নিয়মানুবর্তিনী জননীর বিরুদ্ধে। **'Le Bateau ivre'** বা 'মদোন্মত্ত তরণী' এই জাতীয় কবিতার অন্যতম। যে-লক্ষ্যহীন নৌকা কোনো দড়িদড়ার বাঁধন না মেনে ও মাঝিদের উপেক্ষা করে উদাসীন, যত নদী একের পর এক উদ্দাম গতিতে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, কবি নিজেই সেই নৌকা।

র‍্যাঁবোর কবিতা ও গদ্য কবিতার সংগ্রহ 'Les Illuminations' ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে ভের্লেন প্রকাশ করেন। বিখ্যাত 'Sonnet des Voyelles' ('স্বরবর্ণের চতুর্দশপদী') এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। কবির দৃষ্টিতে প্রতিটি স্বরবর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট—A কালো, E সাদা, I লাল, U সবুজ এবং O নীল। র‍্যাঁবো স্বয়ং ইতিপূর্বে গদ্যকবিতায় লেখা মনস্তত্ত্বমূলক আত্মজীবনী 'Une Saison en Enfer' বা 'নরকে এক ঋতু' প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন (১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দ)। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে লেখা একটি চিঠিতে র‍্যাঁবো কবির ধর্ম সম্বন্ধে বলেন, কবিকে তাঁর সমগ্র ইন্দ্রিয়জগতে অরাজকতা আনতে হবে : **'dereglement de tous les sens'**। তবেই কবি **'voyant'** বা 'দ্রষ্টা' হ'তে পারবেন ও বিশ্বের সম্পূর্ণ নতুন নতুন রূপ তিনি নিরীক্ষণ করতে পারবেন। র‍্যাঁবোর ধারণা, কবিকে তাঁর অনুভূতি আদিম ও অবিমিশ্র অবস্থায় প্রকাশ করতে হবে ; চেতন-মনের কোনো শাসন

আনলে চলবে না। স্বাভাবিকভাবেই আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে র‍্যাঁবো অসাধারণ খ্যাতি ও প্রভাবের অধিকারী।

র‍্যাঁবোর প্রকৃতি ও রচনাতে এমন কিছু আছে যার 'আধুনিক' আবেদন বিংশ শতাব্দীতে গভীর। এক দিকে তিনি বুদ্ধিজীবীর প্রতিনিধি, অন্য দিকে তিনি বিদ্রোহী দুর্বৃত্ত। সব-কিছুর বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন—শুধু তাঁর জীবনধারাতে নয়, তাঁর কাব্যধারাতেও। তিনি 'দ্রষ্টা' হতে চেয়েছেন, কারণ তাঁর মতে দ্রষ্টা না হলে কবি হওয়া যায় না। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই মে Paul Demeny-কে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লেখেন, 'আমি হচ্ছে অন্য একজন' ('JE est un autre')। অর্থাৎ, তিনি একাধারে কবি এবং 'স্রষ্টা'। ঋষিদের 'মন্ত্রদ্রষ্টা' বলা হয়েছে। র‍্যাঁবো যেন নবযুগের ঋষি, 'দ্রষ্টা'র নতুন ভূমিকা তাঁর। তিনি যে-নতুন ভুবন সৃষ্টি করেছেন, সেখানে তিনি সৃষ্টিকর্তা। চিঠিটিতে র‍্যাঁবো আরও লেখেন—

'ইন্দ্রিয়জগতে দীর্ঘস্থায়ী, বিশাল ও যুক্তিগ্রাহ্য বিশৃঙ্খলার দ্বারা কবি নিজেকে 'স্রষ্টা' করে তোলে। সব রকমের প্রেম, যন্ত্রণাভোগ, উন্মত্ততা ; সে নিজেকে পরীক্ষা করে, নিজের ভিতরের সব বিষ নিঃশেষ করে, শুধু তাদের বিশুদ্ধ সারাংশটুকু রাখে। এ এক অবর্ণনীয় নিপীড়ন ; এ-সময় তার সবটুকু বিশ্বাস ও অমানুষিক শক্তির প্রয়োজন, আর এ-সময় সে লোকসমাজে বড় রোগী, বড় অপরাধী ও বড় অভিযুক্ত হয়ে ওঠে—এবং মহাপণ্ডিত!—কারণ সে 'অজ্ঞাত'তে উপনীত হয়! যেহেতু সে অন্য সকলের চেয়ে বেশি মাত্রায় নিজের অন্তঃকরণের চর্চা করেছে—যেটা গোড়া থেকেই সমৃদ্ধ ছিল! সে অজ্ঞাততে পৌঁছে যায় ; আর যদিও বিকৃতমস্তিষ্ক অবস্থায় শেষ পর্যন্ত সে তার সব স্বপ্নদর্শনের উপলব্ধি হারিয়ে ফেলে, অন্তত দর্শনটা তার হয়েছে! ওই সব অকথনীয়, অবর্ণনীয় জিনিসের মধ্য দিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসতে গিয়ে তার মৃত্যু হোক ; অন্যান্য ভয়ঙ্কর কর্মীরা আসবে ; দিগন্তের যে-অংশে তার পতন হয়েছে সেখান থেকেই তারা আরম্ভ করবে!'

সতের বছর বয়সে এই চিঠি লেখা হয়েছে, যে-সময় তিনি অনেক সুন্দর কবিতা লিখেছেন যার উৎকর্ষ সংশয়াতীত এবং যা আজও আমাদের সপ্রশংস বিস্ময়ের উদ্রেক করে। চ্যাটার্টনের ক্ষেত্রেও কিছুটা এই ধরনের বালপ্রৌঢ়-ভাব দেখা গেছে কিন্তু তিনি অপ্রধান কবি। র‍্যাঁবোর লোকোত্তর প্রতিভা তাঁর ছিল না। ফরাসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে র‍্যাঁবো নিজের স্থান করে নিয়েছেন।

উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে র‍্যাঁবো নিজের জীবন ও কবিতা এই দুই বিষয়েই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। নতুন নীতিহীন সমাজ-সংসার গঠনের এবং অভিনব অপ্রচলিত ধরনের কবিতা লেখার যে-সব আশাভরসা তাঁর এত দিন ছিল তা অন্তর্হিত হয়েছে। 'নরকে এক ঋতু' এই মোহভঙ্গের ইতিবৃত্ত। সাংসারিক অশান্তি তো ছিলই (র‍্যাঁবোর শৈশবেই তাঁর বাবা পরিবার পরিত্যাগ করে যান),

সেই সঙ্গে ছিল ভের্লেনের অস্বাভাবিক জীবনের গ্লানি। এই গ্লানির দিকেই র‍্যাঁবো তাঁর 'Le Cœur vole' ('প্রবঞ্চিত হৃদয়') কবিতায় ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর ও ভের্লেনের সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁরা প্রথমে ভেবেছিলেন, একজন 'দেবোপম স্বামী' এবং অন্যজন 'জ্ঞানবতী কন্যা'। পরে দেখা গেল, আসলে একজন 'নারকীয় স্বামী' এবং অন্যজন 'বুদ্ধিহীনা কন্যা'। আর শব্দ নিয়ে যে-অপরসায়নের খেলা তিনি একদিন খেলেছিলেন সেটা চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এর পর জীবনের বাকী সতের-আঠার বছর তিনি শুধু সাহিত্য-চর্চাই বর্জন করেন নি, এক অর্থে জীবনকে, অন্তত সমাজকে, বর্জন করেছেন। নিঃসঙ্গ ভবঘুরে অবস্থায় তিনি ইউরোপ ও অ্যাফ্রিকার পথে পথে দিন কাটান। মোট এগার বছর অ্যাফ্রিকায় ছিলেন। কিছু দিন চাকুরী নিয়ে সাইপ্রাসে থাকার পরে এডেনে চাকুরী নেন এবং অ্যাবিসিনিয়ায় বদলি হন। এখানে বন্দুকের চোরা-চালানী কারবার করার চেষ্টা করেন এবং সেইজন্য যে 'দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী' স্থানীয় মেয়ের সঙ্গে সংসার পেতেছিলেন তাকে ছেড়ে দেন। ব্যবসায়-বুদ্ধি খুব ভালো না থাকায় এবং নিগ্রোদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করায় র‍্যাঁবো বিশেষ অর্থসঞ্চয় করতে পারেন নি। ডান হাঁটুতে টিউমারের চিকিৎসার জন্য তিনি যখন ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ফ্রান্সে আসেন তখন তাঁর ডান পা কেটে বাদ দিতে হয়। আগস্ট মাসে তিনি রোশ্-এ তাঁর নিজের বাড়িতে আসেন ও মাস দুই থাকেন। তার পর তাঁর অবস্থা আবার খারাপের দিকে যাওয়ায় তিনি মার্শেইতে ফিরে যান। এখানে সাঁইত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

৪

পোল্ ভালেরি

পোল ভালেরি (জন্ম ৩০. ৯. ১৮৭১। মৃত্যু ২০. ৭. ১৯৪৫) সময়সীমার দিক্ থেকে আরও আধুনিক। তাঁর পিতা ছিলেন ফরাসী, মাতা ইতালীয়। প্রথম জীবনে তিনি মালার্মে ও অন্যান্য প্রতীকীবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিন্তু পরে আঁদ্রে জীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে নতুনভাবে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। মাঝে বছর কুড়ি তিনি কবিতা-বিশেষ কিছু লেখেন নি বা প্রকাশ করেন নি। ইতিমধ্যে তিনি অঙ্কশাস্ত্রে, বিজ্ঞানে, অর্থনীতিতে ও দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন। তাঁর নতুন কাব্যের অন্যতম উৎস গাণিতিক দর্শন। তাঁর বিশ্বাস, অবিমিশ্র কাব্য জীবনকে বর্জন করে তার পরিবর্তে বুদ্ধিগ্রাহ্য ও বুদ্ধিদীপ্ত কোনো ধারণাকে উপস্থাপিত করবে। ভালেরি মনে করেন, সাধারণত আমরা সাহিত্য বলতে যা বুঝি কাব্যের সঙ্গে তার

সম্পর্ক নেই, কাব্য প্রধানত সংগীতধর্মী। তাঁর কাব্যের মধ্যে 'La Jeune Parque' ('তরুণী নিয়তি', ১৯১৭) ও 'Le Cimetiere Marin' ('সাগরতীরে সমাধিভূমি', ১৯২০) বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। এগুলি যেমন গভীর, তেমনি জটিল। তবু সমকালীন পাশ্চাত্ত্য কবিতা তাঁর কাছে সমধিক ঋণী। ভালেরির প্রজ্ঞার প্রকাশ তাঁর গদ্যগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়, যেগুলির মধ্যে রয়েছে 'Introduction a la Methode Leonard de Vinci' (১৮৯৫), 'La Soiree avec Monsieur Teste' (১৮৯৬) এবং 'Poesie et pensee abstraite' (১৯৩৯)। সৃষ্টিশীল কবিমানসের চমৎকার বিবরণ ও বিশ্লেষণ শেষোক্ত গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ।

ভালেরির অপরিণত বয়সের রচনা-সংগ্রহ 'Album de Vers Anciens' ('পুরাতন কবিতার অ্যাল্‌বাম') ১৯২০-তে, এবং তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'Charmes' ('মন্ত্রাবলী') ১৯২২-এ, প্রকাশিত হয়। প্রথমটিতে 'Narcisse parle' ('নার্সিসাস্ বলছে') একটি রসোত্তীর্ণ কবিতা। জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে যে-সুন্দর তরুণ নিজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তার বিখ্যাত গ্রীক অতিকথা থেকে ভালেরি বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন: 'আর আমি, আমার সমস্ত হৃদয় নিয়ে এই সব শরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে, হে নীলকান্ত মণি, আমার বিষণ্ণ সৌন্দর্যের জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে মরছি! শুধু ওই মোহসলিল, যাতে আমি হাসি ও পুরানো গোলাপ ভুলে গেছি, ছাড়া অন্য কিছু আমি আর ভালোবাসতে পারছি না।' গীতি-ঝংকারে মধুর 'Helene', গভীরভাবে সংহত 'Cesar' এবং কঠিন কিন্তু জাদুস্পর্শে অপরূপ 'Air de Semiramis' প্রথম পর্বের অন্যান্য উল্লেখ্য কবিতা। 'La Fileuse' ('যে রমণী সূতা কাটছে') কবিতায় এক যুবতীর কথা বলা হয়েছে যে, সূতা কাটতে কাটতে গোধূলিতে জানালার ধারে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছন্দ, মিল ও অনুপ্রাসের সুনিপুণ প্রয়োগ বিশেষ মাধুর্যের সৃষ্টি করেছে এবং মালার্মের প্রভাব লক্ষণীয়। 'Naissance de Venus' ('ভীনাসের জন্ম') ও 'Le Bois Amical' ('মিত্রভাবাপন্ন অরণ্য') প্রতীকী ছাঁচে লেখা। ভালেরির প্রথম দিকের লেখায় নারীর স্থান গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী কালে তিনি তাঁর গদ্যরচনায় লেখেন—'ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করার পর যখন দেখলেন সে যথেষ্ট নিঃসঙ্গ নয়, তখন তাকে এক সঙ্গিনী দিলেন যাতে তার নিঃসঙ্গতার বোধ তীব্রতর হয়।' ('Moralites', *Tel Quel I*) অন্যত্র ভালেরি বলেছেন, 'মনের শত্রু নারী, তা সে প্রেম দিক কিংবা দিতে অস্বীকার করুক।' অবশ্য তিনি এও বিশ্বাস করেন, প্রতি পুরুষের ভিতর একজন সুপ্ত নারী আছে ('Instants', *Melange*)।

'তরুণী নিয়তি' লিখে ভালেরি প্রায় রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান। গীতিকবিরূপে তাঁর খ্যাতি দেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। পাঁচশত বারো ছত্রের এই কাব্য রচনা করতে তাঁর সময় লাগে চার বছর (১৯১৩-১৭)। এর একশতটি

খসড়া যদি ছাপা হয় তা হলে ছয়শত পাতার মতো দাঁড়াবে। জটিল ও দুর্বোধ্য এই কাব্যে 'এক রাত্রির মধ্যে একটি বিবেকের পরিবর্তন' বিবৃত। তিনজন নিয়তির মধ্যে যে সর্বকনিষ্ঠা, রাত্রিতে জেগে ওঠার পরে তার স্বগতোক্তিরূপে এটিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বয়ঃসন্ধিকালের সংকট এর বিষয়বস্তু—সত্যস্বরূপের প্রতি আকৃষ্ট যে-চিত্ত তার জাগরণ এবং ইন্দ্রিয়ের জগতের আদিম আকর্ষণ কাটাবার জন্য তার সংগ্রাম। স্বপ্ন আর জাগরণের মধ্যে সে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত বাইরের জগৎকে প্রত্যাখ্যান করা হল ('প্রতিটি চুম্বন নূতন যন্ত্রণার পূর্বাভাস') এবং নিয়তি তার নিরঞ্জন দিব্যধামে ফিরে গেল। 'একটি কবিতার স্মৃতিকথা'য় ভালেরি কবিতার বর্ণনা করেছেন, 'একতাল নীল মাটির মধ্য থেকে হীরকের যে-আভাস ফুটে বেরোয়।' 'তরুণী নিয়তি' কবিতায় নক্ষত্রেরা হীরার টুকরা, ঠিক যেমন তরুণী নিয়তি যে-চোখের জল ফেলছে সেই রকম অশ্রুর মধ্য দিয়ে দেখলে পৃথিবীটাকেই হীরকখচিত মনে হবে। সূক্ষ্ম ও ব্যঞ্জনাময় চিত্রকল্প এবং স্বপ্নময় পরিবেশ কাব্যটিতে অভিনব লাবণ্য এনে দিয়েছে।

সুন্দর ও সাধু ভাষায় লেখা দার্শনিক কাব্য 'তরুণী নিয়তি' ফরাসী সাহিত্যের ঐশ্বর্য বাড়িয়েছে। এ কথা 'সাগরতীরে সমাধিভূমি' সম্পর্কেও বলা যায়। পিণ্ডারের যে-উক্তিকে ভালেরি কবিতায় মর্মবাণীরূপে ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে কবিতাটির মূল বক্তব্য নিহিত রয়েছে—'হে চিত্ত আমার, অমর জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষা রেখো না, বরং সম্ভাব্যের ক্ষেত্র নিঃশেষ করো।' এই কবিতার বিষয়বস্তু এবং ছন্দ এ দুই-ই আমাদের গ্রে-রচিত 'এলিজি'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যদিও ভালেরি নিজে এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি বলেছেন, তাঁর আবেগপ্রবণ ও বুদ্ধিগত এই উভয় জীবনে সরলতম যে-বিষয়গুলি বারংবার এসেছে এবং সমুদ্র ও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী কোনো অঞ্চলের আলো সহযোগে তাঁর কৈশোরের উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করেছে, সেগুলিকে তিনি একত্রে এই কবিতায় নিয়ে এসেছেন। এখানেই সমুদ্রের বিখ্যাত বর্ণনা আছে, **'La mer, la mer toujours recommence !'** ('সমুদ্র, নিত্য-নবীন সমুদ্র !')। কবিতাটি শোকগাথার মতো ; সমাধিভূমির সান্নিধ্যে এসে কবির চিন্তা গভীর ও বিষণ্ণ বিষয়ের দিকে যাচ্ছে। যে-সব মৃতেরা ভূগর্ভে রয়েছে কবি তাদের জ্বালাময়ী বর্ণনা দিয়েছেন—

> **Les cris aigus des filles chatouillees,**
> **Les yeux, les dents, les paupieres mouillees,**
> **Le sein charmant qui joue avec le feu,**
> **Le sang qui brille aux levres qui se rendent,**
> **Les derniers dons, les doigts qui les defendent,**
> **Tout va sous terre et rentre dans le jeu !**

'রোমাঞ্চ-শিহরিত মেয়েদের শীৎকার, চোখ, দাঁত, আর্দ্র চোখের পাতা, আগুন নিয়ে খেলছে এমন মনোহর বক্ষঃস্থল, সমর্পিত অধরে শোণিতের দীপ্তি, চরম দান, যে-অঙ্গুলি তাকে প্রতিরোধ করছে—সব কিছু মাটির নীচে চলে যাচ্ছে এবং আবার খেলায় ফিরে আসছে!'

এর পর ভালেরি মৃত্যুর তাৎপর্য নিরীক্ষণ করেছেন। অমরত্ব তিনি স্বীকার করেন নি; মৃত্যু সকলকে সমমর্যাদায় এনে দেয় গ্রে-উল্লিখিত এই সাধারণ সত্যকে তিনি এড়িয়ে গেছেন। শেষকালে এই বিষয় নিয়ে জল্পনা কৃত্রিম ও নিষ্প্রয়োজন বলে তিনি পরিত্যাগ করেছেন। জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করে যাওয়ার জন্য এবং পরিপূর্ণভাবে বাঁচবার জন্য তিনি কৃতসংকল্প: **'Le vent se leve...il faut tenter de vivre'** ('হাওয়া বেড়ে উঠছে···আমাদের বাঁচবার জন্য চেষ্টা করতে হবে')। কবিতাটির প্রথমার্ধ কিছুটা বোদ্‌লেয়ারের রচনার মতো, কিন্তু এর সুরে গভীরতর প্রশান্তি ও আশ্বাস রয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে আজ পর্যন্ত যত কবিতা লেখা হয়েছে তার মধ্যে হয়তো অনবদ্য 'সাগরতীরে সমাধি-ভূমি'র স্থান সর্বোচ্চে। চিত্রকল্পের সৌন্দর্য, মৃত্যু সম্বন্ধে গভীর চিন্তন, জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও বীরের মতো জীবনকে বরণ, এই সবকিছু কবিতাটিকে অবিস্মরণীয় ঐশ্বর্য দিয়েছে।

তাঁর সমকালীন কবি ক্লোদেলের সঙ্গে ভালেরির প্রধান পার্থক্য এই যে, তিনি তীব্র ভাবাবেগে বিশ্বাস করেন না। বুদ্ধির পথ ধরে তিনি এগোতে চান, যে-পথে মানুষের প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। 'আজকের জগৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'আমাদের অদৃষ্ট ও সাহিত্য' নিবন্ধে ভালেরি লেখেন, 'মন পৃথিবীর রূপান্তর ঘটিয়েছে, আর পৃথিবী সুদশুদ্ধ ঋণ পরিশোধ করছে। এ মানুষকে এমন স্থানে নিয়ে এসেছে যেখানে যাওয়ার কোনো পথ মানুষের জানা ছিল না।'

এ. আর. চিস্‌হল্‌ম যথার্থই বলেছেন, ভালেরি মনের দিক থেকে অভিজাত ছিলেন কিন্তু তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। যারা তাঁর রচনা বুঝতে শেখে নি তাদের কাছে এটা কঠিন হলেও বুঝে নেওয়া সুকঠিন নয়। প্রধানত ভাব ও চিত্রকল্পের সংহতির জন্যই তাঁর কবিতা দুর্বোধ্য মনে হয়, বিশেষ করে তাদের কাছে যারা প্রয়োজনীয় প্রয়াসটুকু এড়াতে চায়। মালার্মের মতো তিনিও অপ্রয়োজনে একটি শব্দও ব্যবহার করেন না। তাঁর নায়িকা সেমিরামি যখন বলছে **'Je ne prends qu'une rose et fuis...la belle fleche Au flanc'**, চিত্রকল্পটি বীজগণিতের সূত্রের মতো ঘনসম্বদ্ধ হলেও একেবারেই অস্পষ্ট নয়: তার নগ্ন শুভ্র দেহের উপর লাল গোলাপ শরক্ষতের রক্তের মতো। এই ধরনের মিতভাষণের ফলে কবিতায় ব্যঞ্জনার এক অপরূপ আভা ছড়িয়ে পড়ে। শিল্পী ভালেরির কৃতিত্বের এটা অন্যতম পরিচয়। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিশীল মনের কি ছবি

আমরা পাই? এর উত্তর ইলিজাবেথ সিউএল্ তাঁর 'পোল ভালেরি' গ্রন্থে দিয়েছেন যেটা এই প্রবন্ধের উপসংহাররূপে আমরা ব্যবহার করতে পারি—

'He was continually trying to discover that himself, not because it was his own mind but because he was fascinated by the ways of thought in general, of which, as he says, we know so little. He was a poet and a precise and rigorous thinker, but at the same time he was always watching himself making poetry, watching his mind thinking and making a form and structure out of its thoughts. Valery's mind watches itself in the mirror.'

আধুনিক ইতালীয় কবিতা

আধুনিক ইতালীয় নাট্যসাহিত্য ও কথাসাহিত্যের সঙ্গে আমাদের কিছু পরিচয় থাকলেও, আধুনিক ইতালীয় কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকের ধারণা একেবারেই অস্পষ্ট। এমন কি, তাসোর পর যাঁর মতো বড় কবি ইতালীতে জন্মগ্রহণ করেন নি, যাঁকে প্রখ্যাত ফরাসী সমালোচক স্যাঁৎ-ব্যুভ কবিদের মধ্যে 'উদারতম, শান্ততম, কঠোরতম' বলে অভিহিত করেছেন, সেই জাকোমো লেওপার্দী (১৭৯৮-১৮৩৭) পর্যন্ত আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত।[১] অবশ্য পরবর্তী কালের জোজুএ কার্দুচ্চি (১৮৩৫-১৯০৭) সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। সাম্প্রতিক ইতালীয় কাব্য লেওপার্দী ও কার্দুচ্চির যুগ ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়েছে, কিন্তু পুরাতন ঐতিহ্যকে একেবারে অস্বীকার করতে পারে নি।

গাব্রিয়েলে দান্নুন্‌ৎসিও-কে (১৮৬৩-১৯৩৮) বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইতালীয় লেখকদের মধ্যে গণ্য করা হয়, কিন্তু তাঁর গীতিকবিতা রোম্যান্টিক ধরনের এবং এই শতাব্দীর প্রথমে যে-তরুণ ইতালীয় কবিরা কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন তাঁরা দান্নুন্‌ৎসিওর কবিতায় অবক্ষয় ছাড়া আর বিশেষ কিছু খুঁজে পান নি। তাঁর অলঙ্কারবহুল শৈলীও নতুন কবিদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, দান্নুন্‌ৎসিওর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দুটি কাব্যগ্রন্থই ('Primo vere' Canto novo') উনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার বেশ কিছু বছর আগে প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিতার সুললিত রোম্যান্সের উদাহরণ স্বরূপ এই স্তবকটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

> **Cresce il sole per la piazza**
> **dilagando in copia d'or.**
> **E passata la mia bella**
> **e con ella va il mio cuor.**

('সূর্যের তেজ বাড়ছে, প্রান্তরে অজস্র সোনার প্লাবন। আমার প্রিয়তমা চলে গেছে, আর তার সঙ্গ নিয়েছে আমার হৃদয়!')

স্বাভাবিকভাবেই, নৈরাশ্যগ্রস্ত তরুণ কবিদের এসব ভালো লাগে নি। তাঁরা জীবনে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন, আঁকড়ে ধরার মতো কোনো অবলম্বন খুঁজে পান নি। কার্দুচ্চির উদ্দীপনা, দান্নুন্‌ৎসিওর বর্ণালী বা পাস্‌কোলির আদর্শনিষ্ঠা তাঁদের মনে রেখাপাত করতে পারে নি, কিন্তু তাঁরা পাস্‌কোলির নম্রতার অনুসরণ

---

১ বর্তমান লেখকের 'রোমান্টিক কবি ও কাব্য' গ্রন্থের 'জাকোমো লেওপার্দী' প্রবন্ধে নবীন ইতালীর এই মহত্তম কবির ও তাঁর রচনার পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

করেছিলেন। সামান্য বিষয়বস্তু ও সাধারণ অথচ গীতিমুখর ছন্দের নির্বাচনে এই নম্রতার প্রকাশ। পূর্ববর্তী কবিদের সঙ্গে এঁদের বৈষম্য দেখিয়ে সমালোচক Borgese এঁদের নামকরণ করেন 'i crepuscolari' অর্থাৎ 'গোধূলির কবি'।

এই সন্ধ্যালোকের সুর সবচেয়ে গভীরভাবে ধ্বনিত হয়েছে গ্যীদো গৎসানোর (১৮৩৩-১৯১৬) কবিতায়। পরিসরে সীমাবদ্ধ হলেও গৎসানোর' কাব্য স্বচ্ছ, গীতিমুখর ও শিল্পসুষামণ্ডিত। গৎসানো খানিকটা বিমূঢ় বোধ করেছেন, কিন্তু তাঁর বিমূঢ়ভাব তাঁকে অভিভূত করে নি। তিনি জানেন তিনি ভাগ্যাবিড়ম্বিত, কিন্তু ভাগ্যের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নি। মানুষের দুঃখ তাঁর অন্তর স্পর্শ করলেও তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাকে ভালোভাবে অনুভব করতে চেয়েছেন। চোখের সামনে তিনি পুরানো সমাজ ও সংস্কৃতিকে ভেঙে যেতে দেখেছেন। শ্লেষ ও বিষাদ, এ দুই-ই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে ফুটে উঠেছে। পুরানো বাড়ি, পুরানো বাগান, হাসপাতালের ঘর, রবিবারের একঘেয়েমি, শুকনো ফুল, বিবর্ণ ছবি, এইসব সহজ, সাধারণ জিনিস তাঁর কবিতায় বেশি করে স্থান পেয়েছে। আর স্থান পেয়েছে শিশুরা ও সরল সাধারণ মানুষেরা। তাঁর একটি কবিতায় তিনি নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন—লবঙ্গের ক্ষেতে শুয়ে থাকতে থাকতে শিশুদের গানে তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, তারপর জেগে ওঠেন :

> Ma dunque esisto ! O strano !
> vive tra il Tutto e il Niente
> questa eosa vivente
> detta guidogozzano !

('তা হলে আমি বেঁচে আছি ! কি আশ্চর্য ! সমগ্র ও শূন্যের মাঝখানে 'গ্যীদোগৎসানো' নামে প্রাণবান্ বস্তু বেঁচে আছে !')

গৎসানোর দীর্ঘতম ও স্মরণীয়তম কবিতা, 'La signorina Felicita', ব্যাকুলতা-বিধুর অথচ সম্পূর্ণভাবে আধুনিক।

'গোধূলি'-কবিদের মধ্যে আর একজন শীর্ষস্থানীয় হলেন সের্জিও কোরাৎসিনি (১৮৮৫-১৯০৭)। গৎসানোর মতো তাঁর কবিতাতেও বক্রোক্তি ও বিষণ্ণতার মিশ্রসুর শোনা যায়। ফরাসী কবি ভের্লেন ও লাফর্গ তাঁর আদর্শস্থানীয় ছিলেন।

যে-অসন্তোষ গৎসানো, কোরাৎসিনি প্রভৃতি কবিদের মধ্যে 'গোধূলি'-মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল সেই অসন্তোষই বিদ্রোহী কবি ফিলিপ্পো টোম্মাজো মারীনেত্তীর মনে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ভাবের সৃষ্টি করে। যদিও তাঁর জন্ম মিশর দেশে ও তিনি নিজেকে প্যারী-শহরে প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ইতালীয় মনে করতেন। ১৯০২ থেকে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ফরাসী ভাষায় প্রচণ্ড ধরনের কবিতা ও অন্যান্য রচনা লেখেন। এখানেই, ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে, তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা 'ভবিষ্যবাদ' ('Futurisme')-এর ঘোষণা-পত্র রচনা করেন।

এই ইস্তাহারে জীবন ও শিল্পকর্ম সম্পর্কে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে এবং দ্রুততা, যন্ত্র ও যুদ্ধের প্রশস্তি স্থান পেয়েছে। কাব্য সম্পর্কে এতে বলা হয়েছে—

'সাহস, স্পর্ধা, বিদ্রোহ হবে আমাদের কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ।

এতদিন পর্যন্ত সাহিত্যে চিন্তাচ্ছন্ন জড়তা, হর্ষাতিশয্য ও সুষুপ্তি কীর্তিত হয়েছে : আমাদের কাছে কীর্তিত হবে আক্রমণাত্মক গতি, ক্ষয়কারী নিদ্রাহীনতা, দ্রুত পদক্ষেপ, ডিগবাজী, চড়, আঘাত...'

পরে চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, স্থাপত্যবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের উপর বিভিন্ন ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত সাহিত্য-সম্পর্কিত বিশেষ ঘোষণাপত্রে শব্দের স্বাতন্ত্র্য ('Parole in liberta') স্বীকৃত হয় এবং বাক্যে শব্দবিন্যাসের ব্যাকরণ-সম্মত রীতি অস্বীকার করা হয়। এই ধরনের আরও 'মুক্তি' একই সঙ্গে ঘোষণা করা হয়। মারীনেত্তীর একটি দীর্ঘ কবিতার নাম দেওয়া হয় 'Zang-tumb-tuum', এবং সফ্‌ফিচির একটি কবিতা-সংকলনের নামকরণ করা হয় 'Bif § 2f+18'। 'ভবিষ্যবাদ' লেখকের স্বাধীনতার পথ খানিকটা প্রশস্ত করতে সাহায্য করে (চূড়ান্ত খামখেয়ালিও সাহিত্যে আমদানি করে), কিন্তু এর প্রভাব প্রধানত দেখা যায় শিল্প ও সঙ্গীতে, এবং ক্ষতিকর জাতীয়তাবাদের জাগরণে। মারীনেত্তীকে ফ্যাসীবাদের অন্যতম প্রবক্তাদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

মারীনেত্তীর আদর্শ অনুসরণ করে তাঁকে অতিক্রম করে গেছেন জোভান্নী পাপীনী (১৮৮১-১৯৫৬)। তিনি নিজেকে মারীনেত্তীর অনুগামী মনে করেন নি, নিজেকে 'ভবিষ্যবাদ' আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় মনে করেছেন। তাঁর আত্মজীবনী 'একজন পরিণত মানুষ' ('Un Uomo Finito', ১৯১২) গ্রন্থে তিনি নিজেকে 'শৈশব থেকেই ভীষণভাবে নিঃসঙ্গ ও পৃথক্' রূপে বর্ণনা করেছেন। নিজের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল খুব উচ্চ এবং তাঁর উচ্চাভিলাষ ছিল সীমাহীন। তাঁর নিজের ভাষায়—'আমি সত্যিকারের বড় হতে চেয়েছিলাম, মহান্, বিরাট ; আমি এমন কিছু করতে চেয়েছিলাম যেটা হবে অতিকায়, অশ্রুতপূর্ব, যা মানব-হৃদয়ের ও সংসারের রূপ বদলে দিতে পারবে। হয় তাই, না হয় কিছুই নয়।' অতীতের সঙ্গে সবকিছু যোগসূত্র তিনি ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন, প্রাচীনতার শ্রী-মণ্ডিত ফ্লরেন্স-নগরীকে চেয়েছিলেন ঢেলে সাজাতে। টি. এস্. এলিঅটের মতে অতীত প্রাণবন্ত এবং অতীতই বর্তমানে প্রাণরস সঞ্চারিত করে। পাপীনীর মতে, অতীত মৃত তো বটেই, বর্তমানকেও সে মরণরোগে সংক্রামিত করে গেছে। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে পাপীনী রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হন। এরপর থেকে তাঁর রচনায় ক্যাথলিক মতবাদের গভীর প্রভাব দেখা যায়।

পরবর্তী যুগের ইতালীয় কাব্যে অন্যান্য কিছু 'বাদ'-এর প্রচলন হলেও এ সময়ের প্রধান প্রচেষ্টা হল 'Poesia pura' বা 'বিশুদ্ধ কাব্য' রচনা। বিদেশী বাক্যাংশটি ফরাসী ভাষা থেকে নেওয়া ; আসলে এই ধরনের কবিতার আদর্শ

দৃষ্টান্ত খুঁজতে গেলে ফরাসী কবি মালার্মে ও ভালেরির রচনা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যে-কবি 'বিশুদ্ধ কাব্য' লিখতে চান তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ অভিজ্ঞতার গণ্ডির বাইরের কোনো অনুভূতিকে এমন রূপ দেওয়া যাতে সেটি অনায়াসে পাঠকের মনে সঞ্চারিত হতে পারে। কবি শব্দশিল্পী, তিনি যে-সব শব্দ ব্যবহার করবেন সেগুলির একটা আবেগের দিক থাকায় সেগুলি কবির অনুভূতির স্বরূপ সহজে উদ্ঘাটিত করতে পারবে। যে-সব জিনিসের প্রয়োজন শুধু অলংকরণের বা ব্যাখ্যানের জন্য সে-সব শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, অমার্জনীয়ও। তাঁর প্রকাশের সৌকর্যের জন্য যে-যে শব্দের প্রয়োজন কবি শুধু সেইসব শব্দকেই গ্রহণ করবেন। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, 'বিশুদ্ধ কবিতা' অনেক সময় কঠোর, সজীব ও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে; এ কবিতা বিশেষ ধরনের পাঠকের জন্য বিশেষ ধরনের কবির রচনা। যাঁরা এই ধরনের কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলেন জোসেপ্‌পে উন্‌গারেত্তি (জ. ১৮৮৮), ইউজেনিও মন্‌তালে (জ. ১৮৯৬) এবং সাল্‌ভাতোরো কোয়াসিমোদো (জ. ১৯০১)।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে-ইতালীয় কবি সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন তিনি হলেন জোসেপ্‌পে উন্‌গারেত্তি। ইতালীয় কবিতায় বিশুদ্ধি ও তীব্রতার এক নতুন পথের তিনি সন্ধান দিয়েছেন। প্যারীতে অধ্যয়নকালে কবি আপোলিনেয়ারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয় এবং মালার্মে ও ভালেরির প্রভাবে তিনি কাব্যের বহিরঙ্গ ও ভাষার উপর মনঃসংযোগ করেন। উন্‌গারেত্তি বিশ্বাস করতেন, কবিতা থেকে অলংকার ও ভাবপ্রবণতা বর্জন করতে পারলে তবেই শব্দের আদি ও অকৃত্রিম জাগরণী-শক্তির উদ্বোধন সম্ভব; এক দিক থেকে তিনিও শব্দকে 'ব্রহ্ম' মনে করেন। তিনি স্বেচ্ছায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেন ও যুদ্ধ তাঁর বিদ্রোহী চিন্তাধারাকে গভীরতর করে। এর আগেই তাঁর কবিজীবনের সূত্রপাত হয়েছে কিন্তু সৈনিকের জীবন তাঁর কাব্যকে পরিণতি দান করে। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে মানুষ যে-আত্মজ্ঞান লাভ করে উন্‌গারেত্তি সেটার নতুন মূল্যায়ন করেছেন; কিন্তু সবকিছুই 'আরম্ভ হবে শব্দের প্রয়োগ থেকে'। তাঁর যুদ্ধ-সংক্রান্ত কাব্যসঞ্চয়নের তিনি নাম দেন 'আনন্দ' ('L'allegria', ১৯১৯)। এই কবিতাগুলি পড়লে মনে হবে শব্দ 'ছন্দের প্রতিটি লয়ে, হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে, থেমে গেছে, প্রতি মুহূর্তে নিজের সত্যের মাঝে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে'।

যুদ্ধের পর ইতালীয় কাব্যসাহিত্যে যে 'ermetismo' ('hermetic') বা 'অবরুদ্ধ' আন্দোলন আরম্ভ হয় তাতে তরুণ কবিরা উন্‌গারেত্তিকে নেতৃত্বে বরণ করেন। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে **'Sentimento del tempo'** ('যুগের বাণী') প্রকাশিত হয় ও উন্‌গারেত্তি তাতে লেখেন, 'নতুন ইতালীয় কাব্যের জন্য আমি সব কিছু করেছি।' অনেক সময় কান্তিবাদ ও দুর্বোধ্যতার জন্য উন্‌গারেত্তিকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার ভাষার একটা নিজস্ব

মহিমা আছে—

'আমার এই নীরবতার মাঝে যখন খুঁজে পাই
একটি শব্দ,
আমার জীবনে তা খোদিত হয়ে যায়
অতলস্পর্শী গহ্বরের মতো।'

উন্‌গারেত্তির মতে ভাষাই সভ্যতার প্রকৃত কাঠামো ; 'উন্মত্তের মতো শব্দ ভাঙাভাঙি'তে সেই কাঠামোর অস্তিত্ব এখন বিপন্ন।

'অবরুদ্ধ' আন্দোলনের অন্যতম কবি ইউজেনিয়ো মন্তালের কাব্যের ইতিবৃত্তকে জীবনের আখ্যায়িকা বলা চলে। কীট্‌স্ একবার লিখেছিলেন, কবিতা আসবে স্বাভাবিকভাবে, গাছের পাতার মতো স্বতঃস্ফূর্ত। মন্তালের কবিতা স্বতঃ-উৎসারিত, যদিও অনেক সময় তাঁর প্রতীক ও চিত্রকল্পের ব্যবহার আমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁকে দুঃখবাদী করে তোলে ; টি. এস. এলিঅটের মতো তিনিও 'waste land'-এর অনুভূতিতে অভিভূত হন। (এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মন্তালে এলিঅটের কবিতার অনুবাদ করেন ও তাঁর নিজের কাব্যশৈলীতে এলিঅটের প্রভাব সুস্পষ্ট।) মন্তালে আধুনিক মানুষের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করেছেন :

'আজ শুধু তোমাদের এইটুকু বলতে পারি—
আমরা কি নই, কি আমরা চাই না।'

মানুষের জীবনে আছে শুধু প্রস্তর-কঠিন যন্ত্রণা, যে-বেদনা নামহীন।

স্যালভাতোরো কোয়াসিমোদো মানবতাবাদী কবি। তাঁর প্রথম দিকের গীতিকবিতাগুলি তিন-চার পঙ্‌ক্তির মধ্যে লেখা। এগুলির সুর একান্তভাবে ব্যক্তিগত ও এগুলির চিত্রকল্পের সঙ্গে তাঁর অতি-পরিচিত সিসিলির যোগ রয়েছে। তাঁর একটি সম্পূর্ণ কবিতা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

Ognuno sta solo sul cuor della terra
traffitto da un raggio di sole :
ed e subito sera.

('পৃথিবীর মাঝখানে প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে আছে একটি সূর্যরশ্মির দ্বারা বিদ্ধ হয়ে : আর দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে আসে।')

এই কবিতাটিকে আমরা 'অবরুদ্ধ' সুরে লেখা বলতে পারি। এই সব কবিতার মধ্যে অনেক সময় আমরা একটা কাঠিন্য অনুভব করি, মাঝে মাঝে মনে হয় মানুষের জন্য দরদের কিছুটা অভাব আছে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা কোয়াসিমোদোকে পরিপূর্ণভাবে মানব-দরদী করে তুলেছে। সমাজ-জীবনের বৈষম্য তাঁকে বিরক্ত করেছে। মানুষের দুঃখে তিনি বিচলিত হয়েছেন, জলন্ত প্রতিবাদ জানিয়েছেন ; তাকে সাহস অবলম্বন করতে শিখিয়েছেন।

সাম্প্রতিক কালে যে-সব ইতালীয় কবি খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথমে উল্লেখ্য তিনি হলেন পিয়েরপাওলো পাসোলিনি (জ. ১৯২২)। তরুণ বয়সে পরিণত কবিতা লিখে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর কাব্য-সংকলন 'Le ceneri di Gramsci' ('গ্রাম্স্কির চিতাভস্ম') ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের সাহিত্য-পুরস্কার লাভ করে। তাঁর কবিজীবনে যে-সব ইতালীয় কবির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কার্দুচ্চি, পাস্কোলি এবং সাবা। পুরাতন ও নতুন ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ তাঁর শৈলীতে লক্ষ্য করা যায়। ভাষাকে তিনি গদ্যের কাছাকাছি নিয়ে আসতে চেয়েছেন, যার ফলে তাতে লৌকিক জীবনের স্বর ধ্বনিত হতে পারে। কবিতায় ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা গ্রাম্স্কির নামের উল্লেখ গভীরভাবে অর্থবহ। ইতালীয় সাংস্কৃতিক জীবনে গ্রাম্স্কির প্রভাব অসামান্য। যে-কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তাঁর মৃত্যু হয় সেখান থেকে গ্রাম্স্কি নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য তাঁর দেশবাসীকে ডাক দিয়ে গেছেন; এই সংস্কৃতিকে যদি প্রকৃত 'লোকায়ত' হতে হয় তা হলে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাতে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। এই সংস্কৃতি সৃষ্টি করার জন্য পাসোলিনির প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। মানুষ যাতে বাস্তবকে ভালোভাবে বুঝতে পারে তার জন্য তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গী তিনি 'গ্রাম্স্কির চিতাভস্ম' কবিতায় বর্ণনা করেছেন—

> **Vivo nel non volere**
> **del tramontato dopoguerra : amando**
> **il mondo per odio—nella sua miseria**
> **sprezzante e perso...**
> 'আমি বেঁচে আছি সেই অনীহাতে
> যুদ্ধের পরের যুগের গোধূলিতে যার উৎপত্তি : ভালোবেসে
> সেই পৃথিবীকে যাকে আমি ঘৃণা করি—যার দুর্দশার মাঝে
> আমি বিদ্বেষ জমিয়ে তুলেছি ও হারিয়ে গেছি...'

অবহেলিত জনগণের জন্য পাসোলিনির অনুকম্পা তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা 'Terra di lavoro' ('কর্মস্থল')-তে প্রকাশ পেয়েছে। রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে তাঁর সহযাত্রীদের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে গেছেন ও তাদের দুঃখ-দুর্দশা তাদের মতো করেই অনুভব করেছেন।

অন্য কোনো কোনো কবিদের মধ্যে পাসোলিনির মতো 'লৌকিক' ভাষা খোঁজার প্রয়াস দেখা গেলেও সাম্প্রতিক কালের অধিকাংশ কবিই 'অবরুদ্ধ' আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেতে পারেন নি। এঁরা বুদ্ধিজীবী ও শিল্পকর্মে নিপুণ এবং এঁদের গোষ্ঠী এখন বেশ সোচ্চার। এঁদের মধ্যে রয়েছেন লিবেরো দে লিবেরো (জ. ১৯০৬) এবং সান্দ্রো পেন্না (জ. ১৯০৬)। এই প্রবীণ কবিরা

যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন এবং এঁদের কবিতা আজ বহুপঠিত। দে লিবেরো প্রথমে গ্রামাঞ্চল থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করলেও তাঁর কবিতায় একটা কেতাবী ভাব দেখা যায় ; মাঝে মাঝে বেশ কৃত্রিমও মনে হয়।

পেন্না কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রাধান্য দেন নি। অন্যান্য অনেক সমসাময়িক কবির মতো দার্শনিক তত্ত্ব দ্বারাও তিনি আকৃষ্ট হন নি। তাঁর কবিতা সরল শৈলীতে লেখা ও সাধারণত আত্মজীবনমূলক। উম্‌বের্তো সাবা (১৮৮৩-১৯৫৭) রোম্যান্টিক সুরে একবার লিখেছিলেন যে, তাঁর আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে :

> 'সকলের যে-জীবন সেই জীবন নিয়ে বাঁচা,
> প্রতিদিনের যে-সব লোকজন তাদের সকলের মতো হওয়া।'

সাবার এই অভিলাষ পেন্নার মধ্যেও দেখা যায়। অনেক দিক থেকে পেন্না সাবার সমগোত্রীয়। সাবার কবিতাতে যেমন কোনো বড় রকমের পরিবর্তন দেখা যায় নি, পেন্নার কবিতাতেও মূল সুর একই থেকে গেছে। তাঁর নিজের সাধারণ সুখ-দুঃখের কাহিনী নিয়ে পেন্না আগে যেমন লিখেছেন, পরেও তেমনি লিখেছেন :

> **Sandro Penna eintriso di una strana**
> **gioia di vivere anche nel dolore.**
> 'সান্দ্রো পেন্না বেঁচে থাকার অদ্ভুত আনন্দে
> আপ্লুত—দুঃখের মধ্যেও।'

পেন্নার রচনার মোহিনী মায়ায় আবিষ্ট হন নি এমন পাঠক বিরল। ভাষার লালিত্য, ছন্দের জাদু, স্বপ্নের আমেজ তাঁর কবিতাকে অপরূপ করে তুলেছে।

(ইদানীং ইতালীয় কবিরা একদিকে তাঁদের ভাষায় সারল্য আনবার যেমন চেষ্টা করছেন, অন্য দিকে চেষ্টা করছেন সমকালীন সমস্যাকে কাব্যে রূপ দেওয়ার। তাঁদের সাফল্যের উপর তাঁদের জনপ্রিয়তা নির্ভর করবে।)

নীড় ও আকাশ

নর-নারীর প্রেম এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি—এই দুই মনোভাবের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থাকলেও, অনেক সময় এ দুইটির সংমিশ্রণ দেখা যায়। এটা যেমন আমাদের জীবনে ঘটতে দেখি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যেও দেখি প্রতিফলিত। 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'—এ মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। তাই প্রেম ও ভক্তি যে-কবির রচনায় শ্রেষ্ঠ ও সর্বাঙ্গীণ বাণীরূপ পেয়েছে সেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক গান 'প্রেম' পর্যায় থেকে 'পূজা' পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, আবার 'পূজা' পর্যায় থেকে 'প্রেম' পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। আমাদের 'না-বলা বাণীর ঘন-যামিনীর মাঝে' যার ভাবনা তারার মতো বিরাজ করে তিনি জীবনদেবতা হতে পারেন, আবার সে মানসসুন্দরীও হতে পারে। যে-ঐহিক প্রেম ও আধ্যাত্মিক প্রেম দৈনন্দিন জীবনে একাকার হয়ে যাচ্ছে 'গীতিবিতান'-এর পাতায় তা পৃথক্ করে রাখা যাচ্ছে না। রাখার চেষ্টাও রবীন্দ্রনাথ করেন নি এবং সেটা তাঁর সত্যকে স্বীকার করার শক্তির পরিচায়ক। নর-নারীর প্রেম শুধু দৈহিক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকলে এ বিচিত্র জিনিস কিছুতেই ঘটত না। যেহেতু এ প্রেমের অন্য একটি দেহাতীত দিক রয়েছে সেজন্যই এটা সম্ভব।

'মাটিতে থাকবে প্রেমের মূল,
আকাশে ফুটবে প্রেমের ফুল',

ব্রাউনিঙের এই ধরনের উক্তিতে মানবপ্রেমের মধ্যে এই দেহ-দেহাতীতের সমন্বয়কেই স্বীকার করা হয়েছে। সি. এস্. লিউইস্ এই কথা মনে রেখে বলেছেন, গাছপালার শিকড় যেমন মাটির নীচে থাকা দরকার, তেমনি দরকার উপরের সূর্যালোক।

পরিপূর্ণ ঐহিক প্রেম দেহকে বাদ দিয়ে সম্ভব কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে. যে-কারণে ভেরিয়ার এল্উইন্ বলেছেন, **'No love is pure if it is not passionate.'** মানুষ শুধু জীববিশেষ যেমন নয়, আবার তেমন এটাও ঠিক যে, জীবরূপে সে কতকগুলি বিশেষ প্রবৃত্তির উত্তরাধিকারী। সে-প্রবৃত্তিগুলিকে অস্বীকার করে সেগুলি জয় করা কঠিন। বরং সে-প্রবৃত্তিগুলিকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে পারলে তাদের উপর আমরা কিছুটা কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারি। এইজন্য প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে বিবাহের সামাজিক বিধান রয়েছে এবং সেই বিধান ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা বিধৃত। রামকৃষ্ণদেব ও সারদা দেবী বিবাহিত হয়েও গার্হস্থ্য জীবন-যাপন করেন নি—তাঁরা নিয়মের ব্যতিক্রম। যদি তাঁরা গার্হস্থ্য জীবন যাপন করতেন তা হলে সেটা তাঁদের গৌরবের পক্ষে হানিকর কিংবা তাঁদের সাধনার পথে অন্তরায় না-ও হতে পারত। গান্ধীজী গার্হস্থ্য-জীবনের বিরোধিতা

করেছেন, কিন্তু এর মূলে একান্ত ব্যক্তিগত কারণ লুকিয়ে আছে। তাঁর পিতা যখন মৃত্যুশয্যায় গান্ধীজী তখন তাঁর স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে ছিলেন, নিয়তির এই মর্মান্তিক পরিহাস জীবন-সম্পর্কে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গীতে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে এই অভিজ্ঞতার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

প্রাচীন ভারতীয় ধর্মগ্রন্থে বা দর্শনে বা সাহিত্যে ব্রহ্মচর্যকে সাধারণ মানুষের সারা জীবনের আদর্শরূপে কোথাও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয় নি। উপনিষদের কোথাও কোথাও বরং আমরা দেখি, নর-নারীর প্রেমকে দিব্য মিলনের প্রতীক-রূপে ধরা হয়েছে। 'প্রিয়ার বাহুপাশে মানুষ বিশ্বসংসার—অন্তরে বাইরে সব কিছু—বিস্মৃত হয়; সেই ভাবেই যে-মানুষ আত্মাকে আলিঙ্গন করে তার অন্তরের বাইরের জ্ঞান থাকে না।' আমাদের সাহিত্যে, শিল্পকর্মে, ভাস্কর্যে ও সঙ্গীতে যে-ঐতিহ্য রয়েছে এই কথাই তার মর্মবাণী। এই বাণী উপলব্ধি যাঁরা করতে পারেন না তাঁদের কাছে 'অমরুশতক'-এর শ্লোক কিংবা খাজুরাহোর মূর্তি অশ্লীলতা-ব্যঞ্জক মনে হতে পারে। 'কুমারসম্ভব' কাব্যের অষ্টম সর্গকে অনেকে বর্জন করেন কালিদাস-রচিত নয় মনে করে; তাঁদের মতে হরপার্বতীর প্রণয়দৃশ্যের অবতারণা করা কালিদাসের মতো মহান্ কবির পক্ষে সম্ভব নয়। কালিদাস তাঁর কাব্যের কি নামকরণ করেছেন তাঁরা ভুলে যান। আর লেখার উৎকর্ষের মধ্যেও কালিদাসের ছাপ স্পষ্ট। যে-কোনো একটা শ্লোক ধরা যেতে পারে—

কৈতবেন শয়িতে কুতূহলাৎ পার্বতী প্রতিমুখং নিপাতিতম্।
চক্ষুরুন্মিষতি সস্মিতং প্রিয়ে বিদ্যুতাহতমিব ন্যমীলয়ৎ॥

'ছল করে শঙ্কর চোখ বুজেছিলেন। তাঁর ঘুম কতটা গভীর পরখ করার জন্য পার্বতী এসে সন্তর্পণে তাঁর দিকে চাইলেন। শঙ্কর তখনই চোখ খুলে স্মিতহাসি হাসলেন। পার্বতীর চোখে যেন বিদ্যুতের ঝলক লাগল, তিনি চোখ খুলে রাখতে পারলেন না।' রূঢ় বিদ্যুতের আলোকের একটি ছোট্ট উপমা—'বিদ্যুতাহতমিব'—কালিদাসকে চেনার পক্ষে যথেষ্ট। উপমা কালিদাসস্য।

নর-নারীর প্রেম সম্পর্কে মিল্টনের ধারণা প্রাচ্য ধারণা থেকে দূরবর্তী নয়। তাই 'প্যারাডাইস্ লস্ট্' কাব্যে আদি-দম্পতি অ্যাডাম্ ও ঈভ্-এর প্রণয় বর্ণনা করার সময় কোনো সংকোচ তাঁকে আচ্ছন্ন করে নি। বর্ণনা স্বাভাবিকভাবেই অন্তরঙ্গ, শৃঙ্গাররসাত্মক, কিন্তু কোথাও উৎকট নয়, কোথাও কুরুচিতে কলুষিত নয়—

...into their inmost bower
Handed they went; and eas'd the putting-off
These troublesome disguises which we wear,
Straight side by side were laid; nor turned, I ween,
Adam from his fair spouse, nor Eve the rites
Mysterious of connubial love refus'd.

এখানে যারা অশালীনতা আবিষ্কার করে তাদের আত্মপরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। মিল্‌টন নিজেই এদের 'ভণ্ড' অভিহিত করেছেন। যে-দাম্পত্য প্রেম ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পবিত্র, ঈশ্বর যেটা কারোর জন্য নিষিদ্ধ করেন নি বরং অনেকের জন্য কর্তব্য নির্দিষ্ট করেছেন, সেই প্রেমকে তারা অপবিত্র আখ্যা দেয়, যদিও মুখে তারা সব সময় শুচিতা ও পবিত্রতার বুলি আওড়ায়।

মিল্‌টন অ্যাডাম্‌ ও ঈভ্‌কে নিরাবরণরূপে উপস্থাপিত করেছেন, কিন্তু এই গম্ভীর নিরাবরণের মধ্যে কোনো কলুষ নেই। আংশিক নিরাবরণ অনেক সময় লালসার উদ্দীপক এবং সে-কারণে বর্জনীয়। সম্ভ্রমের আবরণ কিন্তু পূর্ণ নিরাবরণকে মহিমান্বিত করে তুলতে পারে, যেমন অ্যাডাম্‌ ও ঈভ্‌-এর ক্ষেত্রে ঘটেছে—

> **Two of far nobler shape, erect and tall,**
> **God-like erect, with native honour clad**
> **In naked majesty, seemed lords of all.**

এই অনাবরণের মধ্যে একটা বিশালতা আছে, কারণ সেটাতে প্রকৃতির আবরণহীন, স্বাভাবিক রূপের প্রকাশ রয়েছে। এক মুহূর্তে মানুষ ও প্রকৃতি একই বাঁধনে বাঁধা পড়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একটি চিঠিতে লিখেছেন— 'এইরূপ সুবৃহৎ অনাবরণের মধ্যে অশ্লীলতা নেই। এইজন্য শেক্‌স্‌পিয়র অশ্লীল নয়, রামায়ণ মহাভারত অশ্লীল নয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র অশ্লীল, জোলা অশ্লীল, কেন না তা কেবল আংশিক অনাবরণ।'

প্রেমের দেহগত দিক অস্বীকার করা যেমন চলে না, তেমনি একে জীবনের চরম লক্ষ্য করে তোলা মানুষের ধর্ম নয়। কালিদাসের প্রসঙ্গে আবার ফিরে এসে বলা যায়, যে-কালিদাস ঐহিক প্রেমের প্রশস্তি বারংবার রচনা করেছেন, সেই কালিদাসই বহুবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অন্ধ ও সংকীর্ণ ঐহিক প্রেম কিংবা উদ্দাম যদৃচ্ছ সম্ভোগের কি পরিণতি হয়। 'মেঘদূত' খণ্ডকাব্যের যক্ষ এই অসম্পূর্ণ প্রেমের বলি, তাই স্বাধিকার-প্রমত্ত তাকে প্রভুর অভিশাপে নির্বাসিত হতে হয়। অনন্যমানসা দুষ্মন্তের ধ্যানরতা এবং কর্তব্যভ্রষ্টা শকুন্তলাকে অভিশাপ দেন দুর্বাসা যাতে সেই দুষ্মন্তই তাকে ভুলে যায়। আর কামিনী-সহচর অগ্নিবর্ণের উচ্ছৃঙ্খলতা তার নিজের অভিশাপ ডেকে আনল—দুরারোগ্য ব্যাধির যন্ত্রণায় সে জর্জর। রঘুবংশের শেষ রাজার কামুকতা চিরকালের জন্য 'সূর্যপ্রভব'-বংশের দুরপনেয় কলঙ্ক হয়ে রইল।

দেহগত অনুরাগ যেন দেহসর্বস্ব না হয়, এই মর্মে প্রাচীন ভারতে আমাদের অনেকবার সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তি যেমন সহজাত, তেমনি সহজাত তার বিচার-বুদ্ধি, তার নৈতিক শক্তি। নির্বিচার যথেচ্ছ সম্ভোগ তার পক্ষে কিছুতেই মঙ্গলকর হতে পারে না। বিধি-নিষেধ বাইরে থাকুক না থাকুক,

তার অন্তরে রয়েছে। সেই বিধি-নিষেধ যদি সে না মানে তা হলে ক্ষতি তার। সুইডেন দেশের অনেক মানুষ এসব বিধি-নিষেধের পরোয়া করে না, কিন্তু মানসিক ব্যাধিতে তারাই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়, এবং বিশ্বে আত্মহত্যার সংখ্যা সে দেশে সর্বাধিক। প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করা মানুষের দেহ-মনের স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর এ কথা ঠিক, এবং এ দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মনস্তত্ত্ববিদ্ ফ্রয়েড কিংবা সাহিত্যিক ডি. এচ্. লরেন্স ভুল করেন নি। ফ্রয়েড্-এর ভুল অন্য জায়গায়। তাঁর মনোবিজ্ঞানে তিনি প্রেমকে কোন স্থান দেন নি।

প্রেম দেহকে নিয়ে, কিন্তু শুধু দেহ নিয়ে নয়। শুধু দেহ নিয়ে যেটা সেটা কাম এবং মানবেতর জীবজগতের মধ্যে শুধু কামই দেখা যায়। মানুষ কামকে প্রেমে রূপান্তরিত করতে পেরেছে, সমন্বয় করতে পেরেছে ঐহিক ঈরস্ এবং অতীন্দ্রিয় ঈরসের। তার প্রিয়া মানুষী ও মানসী একাধারে, ওয়র্ডসোয়র্থ মেরি ওয়র্ডসোয়র্থ সম্বন্ধে যেমন বলেছেন 'a spirit, yet a woman too'। এই প্রসঙ্গে আমরা দান্তে-সম্পর্কিত টি. এস. এলিঅটের প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করতে পারি—'A great deal of sentiment has been spilt, especially in the eighteenth and nineteenth centuries, upon idealizing the reciprocal feelings of man and woman towards each other, which various realists have been irritated to denounce : this sentiment ignoring the fact that the love of man and woman (or for that matter of man and man) is only explained and made reasonable by the higher love, or else is simply the coupling of animals.'

নর-নারীর মিলনকে যদি কেবল প্রাণিজগতের মৈথুনের পর্যায়ভুক্ত করা হয়, তা হলে মানুষ ও মনুষ্যত্বের এর চেয়ে বড় অবমাননা আর কিছু হতে পারে না। আধুনিক সাহিত্যে বা শিল্পে মানুষের এই চরম অবমাননা মূর্ত। অনেক স্বামী বা স্ত্রী-ই যে তাদের স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনে সর্বাংশে সুখী হতে পারে, এ সুখের অনেকটাই তাদের পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও সহনশীলতার উপর নির্ভর করে, এই সহজ সত্য অনেক আধুনিক সাহিত্যিকের কাছে অচিন্তনীয়। তাই এ যুগের শত শত নাটকে উপন্যাসে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ককে চড়া রঙে আঁকা হচ্ছে। কোনো পাশ্চাত্ত্য কথাশিল্পী যে-মুহূর্তে তাঁর কাহিনীতে দেখালেন দম্পতিরা পরস্পরের সঙ্গী বদলে নিয়ে নতুন দেহসুখ খুঁজছে, এখানকার লেখক সঙ্গে সঙ্গে তাই নিয়ে শারদীয়া সংখ্যায় উপন্যাস ফেঁদে বসলেন। কামের বেসাতি এ যুগের বহু লেখকের উপজীব্য। সাধারণ আধুনিক সাহিত্যে প্রেমের অন্বেষণ করা আর 'Kinsey Report'-এর নির্দেশিকায় 'love'-এর উল্লেখ সন্ধান করা সমভাবে নিষ্ফল!

আশার কথা, প্রতিনিধি-স্থানীয় কয়েকজন আধুনিক শিল্পীর মানসিকতা মানুষের

স্বাভাবিক প্রকৃতির পরিচয় নয়। মানুষ স্বভাবতঃ আদর্শবাদী ও কল্পনাবিলাসী। তার ভালোবাসার মধ্যেও এর প্রভাব রয়েছে, যে-প্রভাব সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুট রোমান্টিক প্রেমে। রোম্যান্টিক প্রেমিকের কাছে তাই প্লেটোর শ্রেষ্ঠ রচনা 'সিম্পোজিয়ম্'-এ প্রেমের যে-ইতিবৃত্ত অ্যারিস্টফ্যানীজ্ বিবৃত করেছেন তার আবেদন এত হৃদয়গ্রাহী। অ্যারিস্টফানীজের মতো হাস্যরসপ্রধান নাট্যকারের মুখ দিয়ে যে-গভীর কথা প্লেটো বলিয়েছেন তার একটা লঘুতর দিক থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের যেটা প্রধানতঃ আকৃষ্ট করে সেটা কল্পনাশক্তির উৎকর্ষ।

এরিক্সিমেকোস্ চিকিৎসকের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেমের আলোচনা করার পর অ্যারিস্টফ্যানীজ মন্তব্য করেন যে, প্রেমের স্বরূপ জানতে হলে মানুষের স্বাভাবিক রূপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা দরকার। প্রথম অবস্থায় মানুষ ছিল দ্বিরূপ, দেহ এক কিন্তু দুই মুখ, চার হাত ইত্যাদি। এই আদিম মানুষের এক অংশ ছিল সম্পূর্ণভাবে পুরুষ, এক অংশ ছিল সম্পূর্ণভাবে নারী, এবং আর এক অংশ ছিল একাধারে পুরুষ ও নারী। আদিম মানুষেরা যখন দেবতাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য অস্বীকার করল তখন ক্রুদ্ধ দেবরাজ জিউস তাদের ভেঙে আলাদা করে দিলেন। ফলে এই ভগ্ন মানুষেরা যখন নিজেদের আগের মতো জোড়া দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠল তখন দেবতার করুণা উদ্রিক্ত হল। তিনি ব্যবস্থা করলেন যাতে মানুষের পক্ষে দৈহিক মিলন ও সন্তানের জন্মদান সম্ভব হয়। সুতরাং এই সবের জন্য মানুষের ব্যাকুলতার মূলে রয়েছে মানুষের আদিম স্বকীয় ঐক্য ফিরে পাওয়ার প্রচেষ্টা। পুরুষ, নারী ইত্যাদি প্রাথমিক তিনটি জাতির কোন্‌টিতে কে প্রথমে ছিল তার উপর নির্ভর করছে তার বর্তমান আকর্ষণ কোন্ দিকে যাবে, সেই জাতির কারও প্রতি না অন্য জাতির কারও দিকে। নিজের হারানো সেই বিশেষ বাকী অর্ধাংশকে যদি কোনো ভাগ্যবান্ বা ভাগ্যবতী আবার খুঁজে পায় তা হলে হবে তার প্রেমের পরাকাষ্ঠা। অনেকের অদৃষ্টেই অবশ্য সারা জীবনে সে-খোঁজার কোনো বিরাম ঘটে না। যাই হোক, এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, নিজের কোনো অভাব বা শূন্যতা পূরণ করার প্রচেষ্টাই প্রেম এবং সে-প্রেমের লক্ষ্য স্বয়ংসিদ্ধ পূর্ণতা।

এই প্রচেষ্টার অন্য এক প্রকাশ দেখা যায় প্রেমিকাকে পূজা করার প্রবণতার মধ্যে। পাশ্চাত্ত্য জগতে Courtly Love-এর যে-ঐতিহ্য আছে তার মধ্যে এটা দেখা যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের প্রোভাঁস্-এ Chretien de Troyes প্রভৃতি ত্রুব্যাদুর কবিদের রচনায় এর সূত্রপাত। সামন্ততান্ত্রিক প্রথার এবং কুমারী মেরী-কে পূজা করার খ্রীস্টীয় রীতির প্রভাব এতে রয়েছে। নারীত্বের মহান্ আদর্শে প্রেমিকের অবিচল বিশ্বাস, দাসসুলভ নম্রতা, প্রগাঢ় একনিষ্ঠতা এবং প্রেমিকার প্রতি ভক্তি—এই সব বৈশিষ্ট্য এঁদের কবিতায় দেখা যায়। লান্স্‌লট ও গুইনি-ভিয়ারের প্রণয়কাহিনী এবং চসার-এর 'ট্রইলাস্ অ্যাণ্ড ক্রাইসাইড'-এর উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকবে অথচ তারা

বিবাহিত হবে না, এবং এই কারণে তাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে। 'কোর্ট্‌লি লভ' স্পষ্টত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, অবৈধ সম্পর্ক ও ব্যভিচারের ব্যাপার, কিন্তু তবু এই প্রেম প্রেমিককে নিঃস্বার্থ মহান্‌ কাজে উদ্বুদ্ধ করত যেগুলি করার জন্য যথেষ্ট সাহস ও শক্তির প্রয়োজন। ত্রুব্যাদুরদের প্রভাবে জার্মানীতে কয়েকজন কবি এই ধরনের কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন যাঁরা Minnesinger ('প্রেমের চারণ') নামে পরিচিত। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনামা হচ্ছেন *Parzival*-এর রচয়িতা **Wolfram von Eschenbach** এবং **Walther von der Vogelweide,** যিনি প্রাক্‌-গোটে জার্মান সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। জার্মান কবিদের প্রেমের কবিতায় কিন্তু অনেক সময় আধ্যাত্মিক বা মরমিয়া সুরের সংযোজন দেখা যায়। ইতালীয় কবিদের রচনায় এই সুর গভীরতর হল এবং অবৈধ প্রেম তাঁরা বর্জন করলেন। দান্তে ও তাঁর অনুগামীদের রচনায় প্লেটোর প্রভাবও দেখা গেল। তাঁদের 'শৈলী অভিনব মাধুর্যে মণ্ডিত'। পেত্রার্কার রচনার মধ্য দিয়ে স্পেন্সার প্রমুখ ইলিজাবেথীয় ইংরাজ লেখকেরা এবং রঁসার প্রভৃতি ফরাসী প্লীয়াদ্‌-গোষ্ঠীর লেখকেরা প্রভাবিত হলেন। প্রেমের মহান্‌ কাব্যিক প্রকাশরূপে এই ভাবধারা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। এ. জে. ডেন্‌মি তাঁর 'হেরেসি অফ কোর্ট্‌লি লভ' গ্রন্থে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এই আদর্শের অনেক কিছু অভিড্‌ প্রভৃতি পূর্ববর্তী লেখকদের লেখায় পাওয়া যায় ; যে-তিনটি ধারণা একেবারে নতুন তা হল —মানবিক প্রেম চারিত্রিক উন্নতির সহায়ক, প্রণয়াস্পদের আসন প্রণয়ীর চেয়ে অনেক উঁচুতে এবং প্রেমের উদ্দাম কামনা তৃপ্তিহীন ও ক্রমবর্ধমান।

আদর্শনিষ্ঠ প্রেমের প্রতি মানুষের চিরায়ত আকর্ষণের কারণেও প্রেম এবং ভক্তিকে পৃথক্‌ রাখা কঠিন হয়েছে, কঠিন হয়েছে ঐহিক ও আধ্যাত্মিককে জীবনের ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র করে রাখা এবং দেখা। 'মেঘদূত'-এর শ্লোকের পর শ্লোকে আমরা দেখেছি, শৃঙ্গারের ব্যঞ্জনা ও ভক্তির দ্যোতনা পাশাপাশি রয়েছে। মেঘের বর্ণ প্রভু শিবের কণ্ঠের তুল্য, এজন্য প্রমথগণ তাকে সসম্মানে নিরীক্ষণ করবে —একথা যে-শ্লোকে বলা হয়েছে, সেখানেই আবার জলকেলিরত যুবতীদের কথা বলা হয়েছে যাদের স্নানে গন্ধবতী নদীর বায়ু সুবাসিত। মহাকাল-মন্দিরের মাঝে সন্ধ্যারতির উল্লেখ যে-শ্লোকে করা হল তার পরের শ্লোকেই দেবদাসীদের চরণক্ষেপে মেখলার ধ্বনি এবং তাদের অঙ্গের নখক্ষতের কথা বলা হয়েছে। 'মেটাফিজিক্যাল্‌' কবি ডান্‌-এর ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি তাঁর লৌকিক প্রেমের কবিতায় আধ্যাত্মিক চিত্রকল্প এবং আধ্যাত্মিক কবিতায় শৃঙ্গারব্যঞ্জক চিত্রকল্প। শেলির 'অ্যাডোনেইস্‌' আধ্যাত্মিক দিকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ, সেখানে কবি মৃত্যুর ব্যর্থতা দেখিয়েছেন ও আত্মার অমরতার উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন। চিরস্থায়ী বিকারবিহীন সর্বব্যাপী ঐশী-শক্তির মহিমা তিনি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। অথচ এই বিখ্যাত শোকগাথায় প্লেটোর ধ্যান-ধারণা এবং বাইবল্‌ ও শেক্‌স্‌পিয়রের স্মৃতিসঞ্জাত বাক্য

ও বাক্যাংশের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এমন সব শব্দ বা চিত্র যেখানে শৃঙ্গার-দ্যোতনা স্পষ্ট।

ইসলাম ধর্মের যে-নির্জনতাপ্রিয় ফকিরদের সুফী আখ্যা দেওয়া হয় তাঁদের অধ্যাত্ম-সাধনার লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ এবং তাঁরা এই উপলব্ধিকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন আখ্যা দেন। এঁদের ধর্মের মূলতত্ত্ব প্রেম। এই প্রেম সম্পর্কে তাঁরা যখন ভেবেছেন, বলেছেন বা লিখেছেন, তখন ঐহিক প্রেমকে ভুলে থাকতে পারেন নি। আর একবার আমরা দেখেছি, ঐহিক ও আধ্যাত্মিক কি ভাবে একাকার হয়ে গেছে, কি ভাবে ভক্তি ও শৃঙ্গার রসের সংমিশ্রণ ঘটেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পারস্যের শ্রেষ্ঠ মরমিয়া কবি জালালুদ্দীন রূমীর 'মঠনাবী'র প্রথম কবিতা 'শরের গানে' কবি ঈশ্বর-বিরহে জর্জরিত মানুষের দুর্দশার কথা ভাবতে গিয়ে শরবন থেকে ছিঁড়ে আনা শরের মর্মবেদনার কথা মনে করেছেন। প্রেমাস্পদ 'দূরসংস্থ' হলে প্রেমিকের বিরহ-ব্যথার কথা কবিরা যেভাবে লিখে থাকেন রূমী এ কবিতা সেইভাবে লিখেছেন—

'রক্তাক্ত পথের এনেছে নিশানা শর,
লেখা মজনুর বেদনার ইতিকথা।'

এর এক শতাব্দী পরে পারস্যের শ্রেষ্ঠ গীতিকবি হাফিজ (যিনি প্রিয়ার মন পেলে তার সুন্দর মুখের কালো তিলটির জন্য সমস্ত সমরখন্দ্ ও বুখারা দিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন) পার্থিব প্রেমের কবিতায় বহুবার অপার্থিবকে এনেছেন—

স্বর্গদূতীর পাখার আওয়াজ শুনছি আজি যেন,
গুল্-বাগিচার গন্ধ আজি ঘিরছে আমায় কেন?
নিঃশ্বাসে ওই আসছে ভেসে কল্পলোকের কথা,
স্পর্শে তোমার কাঁপছে দেহ—কী সে পুলক-ব্যথা!
('রোবাইয়াৎ-ই-হাফিজ', ১৮ : কান্তিচন্দ্র ঘোষ)

মানুষ জীবদেহের অভিজ্ঞতার সঙ্গে উচ্চতর মনের অনুভূতি মেশাতে পারছে বলেই সে-অভিজ্ঞতা তার কাছে ইন্দ্রিয়জ হয়েও ইন্দ্রিয়াতীত। উচ্চতর অনুভূতির সংমিশ্রণ আছে বলেই ঐহিক প্রেম তার কাছে পবিত্র এবং সে-কারণেই ভক্তি ও শৃঙ্গারভাবকে পৃথক্ রাখা তার পক্ষে কঠিন। দৈহিক মিলনে যে-উৎকণ্ঠা ও তীব্রতা, মিলনান্তে যে-প্রশান্তি, তা মানুষের মর্ত্যজীবনের অনন্য অভিজ্ঞতা। দিব্যজীবনের কথা সে যখন ভাবে কিংবা দেবতাদের জীবন কল্পনা করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে আদিরস আসে ; ভক্তির উৎকণ্ঠা ও তীব্রতা কিংবা আধ্যাত্মিক প্রশান্তি যদি আমাদের বিবেচ্য হয় তখন একটা তুলনাই অনিবার্যভাবে আমাদের কাছে আসে, কখনও প্রকাশ্যে, কখনও সঙ্গোপনে।

ঈশ্বর যেমন তাঁর নিজের রূপ অনুসারে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষের প্রবণতাও তার নিজের রূপ অনুসারে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করা। তাই অতি সহজে

দেবতাকে আমরা আপন করে নিই, আত্মীয়রূপে জানি। কখনও তিনি আমাদের কাছে শিশু ভোলানাথ, কখনও আদরের দুলাল যশোদানন্দন-রূপে ননী চুরি করে খাচ্ছেন কিংবা নাড়ুগোপাল সাজছেন। আবার কখনও তিনি ঘরের মেয়ে দুর্গা, আমাদের চোখের সামনে দিনে দিনে পরিবর্ধমানা হয়ে উঠেছেন। দনুজদলনীকে আমরা তনুজাতে রূপান্তরিত করেছি। তাঁকে ঘিরে আমাদের যত আগমনী গান ও বিজয়ার গাথা। কিন্তু দেবতাকে প্রণয়ীরূপে সাজানোতেই আমাদের আনন্দ সবচেয়ে বেশি, আমাদের কল্পনা সবচেয়ে অবাধ। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলা অধ্যায়ের প্রভাবে অনেক ভারতীয় কবি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার বর্ণনায় বৈষ্ণব কবিকুল উচ্ছ্বাসমুখর এবং জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'তে ভক্তির প্রাবল্য, পদের লালিত্য ও ছন্দের নৈপুণ্যের সঙ্গে বাৎস্যায়নের সূত্রও এসে মিশেছে। তবে নরত্বারোপের সবচেয়ে সুন্দর ও উল্লেখযোগ্য উদাহরণ পাওয়া যায় হাল-রচিত 'গাথাসপ্তশতী'র অন্তিম শ্লোকে। সান্ধ্য বন্দনার জন্য প্রস্তুত শঙ্কর যখন অঞ্জলি ভরে জল নিয়েছেন তখন সেই জলে ফুটে উঠেছে পার্বতীর অনিন্দ্য মুখচ্ছবি।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে অনুরূপ চিত্র পাই ওল্ড টেস্টামেন্টের অন্তর্গত 'দ্য সং অফ সংস্'-এ। পরমাত্মার সৌন্দর্যে জীবাত্মার রূপমুগ্ধতা ও পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য উৎকণ্ঠা এখানে মিলন-পিয়াসী প্রণয়ী-প্রণয়িনীর রূপকের মধ্য দিয়ে অনবদ্য সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অতীন্দ্রিয় প্রেমের এ এক দুর্লভ ইন্দ্রিয়জ রূপায়ণ :

> **Let him kiss me with the kisses of his mouth ;**
> **For thy love is better than wine.**
> **Thine ointments have a goodly fragrance ;**
> **Thy name is as ointment poured forth :**
> **Therefore do the virgins love thee.**

এটি নারীর উক্তি। পুরুষের উক্তি থেকেও একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে :

> **Thou hast ravished my heart, my sister, my bride ;**
> **Thou hast ravished my heart with one of thine eyes...**
> **Thy lips, my bride, drop as the honeycomb :**
> **Honey and milk are under thy tongue ;**
> **And the smell of thy garments is like the smell of Lebanon.**

মরমিয়া সাধক রিচার্ড রোল্ জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন বর্ণনা করতে গিয়ে পার্থিব প্রেমের চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন এবং ঈশ্বরের অধরস্পর্শের জন্য ব্যাকুলতা জানিয়েছেন। সাধিকাদের রচনাতেও এটা দেখা যায়। জেনোয়ার ক্যাথারীন্ বলেছেন, কি ভাবে ঈশ্বর তাঁর হৃদয়ে প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত করেছেন এবং তিনি প্রেমের ক্ষতে বিক্ষত হয়েছেন। আত্মা ও ঈশ্বরের মধুর প্রেমলীলাতে সাধ্বী টেরেসা-ও

অভিভূত হয়েছেন। ভারতের মীরাবাঈ গিরিধারী-নাগরের বাহুপাশের জন্য আকুল হয়ে উঠেছেন এবং তাই তাঁর ভজনগুলি নারীর প্রেমবিহ্বল হৃদয়ের আর্তি।

মানুষ যখন নীড় বাঁধে তখন আকাশের আলোকে সেটি উজ্জ্বল করে তুলতে চায়, আবার আকাশ-পরিক্রমার সময় সেই বিশাল শূন্যে তার নিজের ঘর বাঁধার ইচ্ছা হয়। আকাশে গিয়েও ছোটো ঘরখানি তার মনে পড়ে, আবার মৃত্তিকায় শুয়ে সে আকাশের স্বপ্ন দেখে। যে-প্রেম তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন, সে-প্রেমের বাঁধনে সে মানুষ ও দেবতাকে একইভাবে বাঁধতে চায়। এই বিচিত্র প্রেমের স্বরূপ—যে-প্রেমে একই মাল্য-বাঁধনে স্রষ্টা ও সৃষ্টি বাঁধা পড়ছে—ভাষার সাহায্যে কি প্রকাশ সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তা হলে একজনের পক্ষেই বোধ করি সম্ভব হয়েছে এবং তিনি প্রাচীন গ্রীসের বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক প্লেটো, যিনি দর্শনশাস্ত্রকে সংগীতের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ আখ্যা দিয়েছেন। 'সিম্‌পোজিয়ম্‌'-এর ডায়োটিমা-র উক্তির অংশটি পড়লে অন্তত মনে হবে প্লেটো অত্যুক্তি করেন নি। ডায়োটিমার গীতিঝংকৃত উক্তিতে (যেটি সক্রেটিসের মুখ দিয়ে আমাদের শোনানো হয়েছে) প্রেমের রহস্য ও তাৎপর্য অংশত উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। প্রেমিক কোনো প্রেমাস্পদকে কিংবা তার হারানো অর্ধাংশকে (যেটার কথা অ্যারিস্টফ্যানীজ বলেছেন) ভালোবাসছে না, সে ভালোবাসছে তার প্রেমাস্পদের সৌন্দর্যকে, যে-সৌন্দর্য মঙ্গল থেকে অভিন্ন। সৌন্দর্য এবং এই সৌন্দর্য যে-প্রেমকে জাগিয়ে তুলছে, সে-পথেই প্রকৃত সত্যকে পাওয়া যায়। 'দেবতা ও মানুষের মাঝে মধ্যস্থতা করা' এই প্রেমের অন্যতম কাজ। প্রেম মানবাত্মার জাগ্রত প্রাণশক্তি, 'অর্ধেক নর, অর্ধেক নারায়ণ'; তার জননী দরিদ্রতার কাছ থেকে সে পেয়েছে তার অবিমিশ্র মানবিক বৃত্তিগুলি, কিন্তু তার জনক বুদ্ধি-তনয় উদ্যমের কাছ থেকে সে এক মহত্তর প্রকৃতি পেয়েছে যার উদ্দেশ্য 'শিবম্‌-এর শাশ্বত অধিকার' অর্জন করা। মানুষের প্রথম প্রেমের বিকাশ মানবিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে, তার পরে এর থেকে অন্যান্য প্রেমে উত্তরণের পালা—চারিত্রিক সৌন্দর্য, কর্মতৎপরতার সৌন্দর্য, বিধিনিয়মের সৌন্দর্য, মহৎ সমাজ-ব্যবস্থাদির সৌন্দর্য এবং সর্বশেষে প্রকৃত সৌন্দর্যের সৌন্দর্য বা পরম সৌন্দর্য। প্রেমিকের চরম লক্ষ্য প্রেমাস্পদকে পাওয়া নয়, সত্য-শিব-সুন্দরকে চিরকালের জন্য লাভ করা। এইজন্যই তার অমরত্বের কামনা। প্রেমের সঙ্গে সৃষ্টি-শক্তির যোগ রয়েছে, সৌন্দর্যের সংসর্গে যার উৎপত্তি। এই সৃষ্টি-শক্তির প্রকাশ দুই প্রকারের সৌন্দর্য-সৃজনের মাধ্যমে—দৈহিক স্তরের সন্তান-সন্ততি এবং মানসিক স্তরের সন্তান-সন্ততি। অর্থাৎ একটিতে নীড়ের দিকে ফেরা, আর একটিতে আকাশের দিকে ওড়া।

নির্ঘণ্ট